প্রকাশক ঃ
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭-বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ কলিকাতা, ১৯৬০

মুদ্রাকর ঃ
শক্তি রঞ্জন মিশ্র
ইউনাইটেড প্রিন্টার্স
৩০২/২/এইচ/৫ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

ভূমিকা

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ ('হুজুর দর্পণ') এবং তার রচনাকর্ত্রী সম্বন্ধে কিছু লিখবার জন্য আহূত হয়ে আনন্দ বোধ করছি। নতুন কোন লেখক-লেখিকাকে পাঠক সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া একটি বিশিষ্ট আনন্দময় অভিজ্ঞতা। শ্রীমতী প্রতিভা বিশ্বাস অনেক দিন ধরে লণ্ডনে বাস করছেন এবং কর্মসূত্রে তিনি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির সঙ্গে সংযুক্ত থেকে ঐ গ্রন্থাগারের বাংলা পুস্তক পুস্তিকা, সাময়িক পত্র এবং বহু সরকারী ও বেসরকারী নথিপত্রের সন্ধান পেয়েছেন যেগুলি বাংলা সাহিত্য ও বাঙালিজীবনের ঐতিহাসিক দলিল বলে স্বীকৃত হবে। এ-সমস্ত গ্রন্থের অনেকগুলি এ-দেশ থেকে লোপাট হয়ে গেছে, কোনটির নাম শোনা আছে, অনেকগুলির কোন কপি চাক্ষুষ করার উপায় নেই। সেদিক থেকে শ্রীযুক্তা বিশ্বাস লণ্ডনপ্রবাসী হয়ে এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তক-পুস্তিকা পড়াশুনা ও তথ্যানুসন্ধানের প্রচুর সুযোগ পেয়েছেন এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারও করেছেন। সেই পরিশ্রমের ফল এই 'হুজুর দর্পণ'।

বৎসর খানেক আগে আমি যখন অল্প কিছু দিন লণ্ডনে ছিলাম তখন তাঁর প্রস্তাবিত বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁর সংগৃহীত তথ্যাদি দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম এবং তাঁকে গ্রন্থটি সমাপ্ত করতে অনুরোধ করেছিলাম। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে বসে সেই সমস্ত কথা মনে পড়ছে।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁরা যৎকিঞ্চিৎ খোঁজ খবর রাখেন তাঁরা জানেন যে, এই যুগের গোড়ার দিকে শিক্ষিত বাঙালিসমাজ দেশে ইংরাজ শাসনের যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছিল, এবং একটা মধ্যযুগীয় জাতিকে আধুনিক যুগ ও ঐতিহ্যের রাজপথে উপস্থাপিত করার জন্য তারা এই উপনিবেশ-শিকারীদের প্রতি কিছু কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ ইংরেজিভাষার মাধ্যমে য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শনের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি সমাজ অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে নতুন প্রত্যয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিল—যাকে আমরা বলি উনিশ শতকের বাঙালিচেতনার নবজাগরণ। এই উনিশ শতকী নবজাগরণকে আমরা হয়তো য়ুরোপীয় রেনেসাঁস, রিফর্মেশন ও আধুনিক ভাবধারার পাশে সমমূল্য ও গুরুত্বের সঙ্গে স্থাপিত করতে পারব না, কিন্তু আধুনিক যুগের

বাংলাদেশ যে ঔপনিবেশিক শাসননীতির ফলে আধুনিকতার বাণী জীবনে ও সাহিত্যে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছিল তাতে মতভেদের অবকাশ অল্প। অবশ্য এ পরিবর্তন ও নবায়মান ঐতিহ্য অনেকটা কাকতালীয়বৎ ঘটে গেছে। য়ুরোপীয় বণিক এসেছিল পূর্ববিশ্ব শোষণ করতে; ক্রমে তারা শোষণযন্ত্রকে শাসনের যন্ত্রে পরিণত করে একটা প্রাণৈশ্বর্যপূর্ণ ও অতীত গরিমাময় জাতিকে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে আনল। কিন্তু সাপের মাথায়ও মণি থাকে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাহিত্য সেই দুর্লভ মণি। বাঙালিজাতি সর্বাগ্রে সেই মণিরত্ন সংগ্রহ করতে গিয়ে বিষ-ভুজঙ্গের দংশন লাভ করেছে, কিন্তু নীলকণ্ঠের মতো সমস্ত বিষ একা জীর্ণ করে তার থেকে অমৃত-রসায়ন সৃষ্টি করেছে। সে অমৃত হচ্ছে বাঙালির সাহিত্য ও সাধনা।

সিপাহি বিদ্রোহকে একালের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতার পটভূমিকায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সোপান বলে মনে হলেও সেকালের ইংরেজি-শিক্ষিত অধিকাংশ ভারতবাসী এই সংঘর্ষকে জাতীয়তাবোধের উজ্জীবনমন্ত্র বলে মনে করেননি। ইংরেজের শাসন যতই চণ্ডনীতির পরিপোষক হোক, তাদের ক্রিয়াকর্ম যতই মানবতাবর্জিত পাশব অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী হোক, তবু তাদের ঘোরতর অনিচ্ছা সত্ত্বেও, পরাধীন ভারতবর্ষ তাদেরই শিক্ষাদীক্ষার আয়ুধে নববল সংগ্রহ করে তাদের অস্ত্রেই তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে। ফলে প্রচণ্ড সংঘর্ষের সৃষ্টি। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের চার দশক পর্যন্ত সেই ঐতিহাসিক অসম যুদ্ধের কাহিনী মহাকাব্যের আকার লাভ করেছে। ব্রিটিশ শাসনের বর্বর রূপ উদ্‌ঘাটিত করার জন্য মধ্যবিত্ত সমাজ এগিয়ে এল, অচিরে ভারতবাসীর ইংরেজভক্তির স্বপ্নভঙ্গ হল। সহায়ক হল সাময়িক পত্র ও বাংলা সাহিত্য। ইংরেজ শাসকের অত্যাচার, বিচারের নামে নির্জলা অবিচার, ভারতীয়দের পশুর অধম করে বেঁধে মারা,—নিদ্রিত প্রাচ্যভূমি আর কতকাল সহ্য করবে? Sleepy East-এর নিদ্রাভঙ্গ হল, বিশালকায় 'Leviathan' নিদ্রাজড়িমা ত্যাগ করে, স্থাণুত্ব বিসর্জন দিয়ে আঘাতের জন্য প্রস্তুত হল। তারই ছোটবড়ো বুদ্বুদ দেখা দিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত বাংলা নাটকে, প্রহসনে, কথা ও কাহিনীতে। অস্ত্রের চেয়ে লেখনী অনেক বলশালী, এই যুগের বাংলা সাহিত্য নতুন ইতিহাস রচনা করল। সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে এই সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা বিশেষ কোন মূল্য বহন না করলেও একযুগের সমাজ ও রাষ্ট্রচেতনার উপাদানরূপে এ-গুলির বিশ্লেষণ হওয়া উচিত। শ্রীমতী বিশ্বাস অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সে কাজটি সমাধা করেছেন বলে পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ লাভ করবেন।

[সাত]

'সংবাদ প্রভাকর' থেকে 'সোমপ্রকাশ', সাপ্তাহিক ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় ইংরেজ শাসনের সমালোচনা ও বাদপ্রতিবাদ প্রকাশিত হলেও দীনবন্ধুর ছদ্মনামে প্রকাশিত 'নীলদর্পণ'-ই ইংরেজবিরোধিতার প্রথম উদ্ধত কেতন উড়িয়েছিল। নীলকর সাহেবদের লোভ-লালসার শিকার হয়ে যখন নিম্নবঙ্গের মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও কৃষক সমাজ 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়ছিল, তখন কৃষক ও আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়, জমিদার ও রায়ত, দেশনেতা ও সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক—সকলে মিলে অকুতোভয়ে ক্ষুদ্রচেতা পাশবপ্রকৃতির নীলকরদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রতিরোধ রচনা করলেন। সিপাহি বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতির সঙ্গে শিক্ষাভিমানী নাগরিক বাঙালির বিশেষ যোগ ছিল না। 'নীলদর্পণ'-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে লঙ সাহেব রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং শাস্তিও পেয়েছিলেন। এই ব্যাপার নিয়ে কত গান ছড়া লেখা হয়েছে। বস্তুতঃ 'নীলদর্পণ'-কে কেন্দ্র করে বাঙালির আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রথম আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। রামগোপাল ঘোষ, জর্জ টমসনের উৎসাহে কলকাতার শিক্ষিতসমাজে যে আন্দোলনমূলক রাজনীতির প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, তা বায়বীয় আকারেই রয়ে যেত যদি 'নীলদর্পণ' রচিত না হত। তাই বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম মাইলস্টোন হিসেবে, সিপাহী-বিদ্রোহ বা সাঁওতাল বিদ্রোহকে নয়, নীলদর্পণকে গণ্য করা উচিত। নীলদর্পণের আদর্শে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষতঃ শেষ তিন দশকে ইংরেজ শাসক ও বণিক এবং অত্যাচারী ভূস্বামীদের আক্রমণ করে কয়েকখানি নাটক-প্রহসন এবং গল্প-আখ্যান লেখা হয়েছিল। এগুলির অধিকাংশই সাহিত্য-রসোত্তীর্ণ হয়নি, সাহিত্য সৃষ্টির অভিপ্রায়ে রচনাকারদের কেউ-ই কলম ধরেননি, সে সাধ্যও তাঁদের ছিল না। উত্তেজনার উত্তাপ সৃষ্টির পর সে অগ্নি নির্বাপিত হয়ে গেছে, সন্ধ্যার পতঙ্গের মতো সেসব রচনা লোকস্মৃতি থেকে কবে মুছে গেছে। তাদের সংকুচিত স্থান বড়ো জোর সাহিত্যের ইতিহাসের পাদটীকায়। শ্রীমতী বিশ্বাস সেগুলিকে সংগ্রহ করে, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এবং সে সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য জোগাড় করে গবেষণার নতুন পথ নির্মাণ করেছেন। পুস্তকগুলির কোন কোনটি এদেশে পাওয়া যায় না, সেদিক থেকে তাঁর আলোচনার আরো মূল্য আছে।

কলকাতার নিউ মার্কেট (হগ সাহেবের বাজার) নিয়ে লোভী সাহেবের অন্যায় আচরণ, দারোগাদের লোভ ও অত্যাচার, জেলের কয়েদীদের প্রতি জেল-কর্মচারীদের অমানুষিক ব্যবহার—এগুলিতে অনেক সময়ে দেশীয় লোকদেরও

অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'ই 'জেলদর্পণ', 'চা-কর দর্পণ', 'জমীদার দর্পণ' রচনার উৎসাহ জুগিয়েছে। আড়কাঠির সাহায্যে গ্রাম্য লোকজনকে প্রলুব্ধ করে চা-বাগানে নিয়ে গিয়ে তাদের প্রতি পশুবৎ ব্যবহার—এই বর্ণনায় সাধারণ দরিদ্র নিরন্ন মানুষের দুরবস্থা বর্ণিত হয়েছে। সেকালে আসামের চা-বাগানে এবং মরিশাস দ্বীপে ('মরিচদ্বীপ') সাধারণ কুলিকামিনদের নিয়ে গিয়ে কীভাবে তাদের জন্তু ও যন্ত্রে পরিণত করা হত, এবং এই 'মহৎ' কর্মের সহায়ক ছিল দেশীয় ব্যক্তিরাই, এই সময়ের বাংলা সাময়িক পত্র থেকেই তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। মীর মশাররফ হোসেনের 'জমীদার-দর্পণে' মুসলমান রায়তের প্রতি মুসলমান জমিদারের যে নির্মম অত্যাচারের বর্ণনা আছে, তার তীব্র বাস্তবতা কখনো কখনো দীনবন্ধুকেও অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে তীব্রতম ঘৃণা সঞ্চারিত হয়েছে মলহর রাও হোলকারের সিংহাসন থেকে বিচ্যুতির ষড়যন্ত্রে। 'হীরকচূর্ণ', 'গুইকোয়ার নাটক' প্রভৃতি নাটকে ইংরেজ রেসিডেন্টের গায়কোয়াড়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং বিচারের নামে প্রহসনের চিত্র একদা বাংলা নাটমঞ্চে প্রচণ্ড উত্তেজনা সঞ্চার করেছিল। নীলদর্পণের পরে এই নাটক তিনখানি নাটমঞ্চের সাহায্যে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে বাঙালির মনকে বিষিয়ে তুলেছিল। এই সমস্ত উত্তেজক নাটকের মুদ্রণ ও অভিনয় বন্ধ করার জন্য গভর্ণমেণ্ট নাটকাভিনয় নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারি করেন। কিন্তু জনচিত্তে এই নাটক ও প্রহসন যে বিরূপতা সৃষ্টি করেছিল তাতে ইংরেজের প্রতি বাঙালির মন আরো প্রতিকূল হয়ে পড়ে। আরো দু-একটি সমাজসংস্কারমূলক প্রহসনধর্মী রচনা এর মধ্যে গৃহীত হয়েছে, যেমন 'বাঙালির মুখে ছাই'। খেতাব লাভের জন্য দেশের ধনিগৃহের অকালকুষ্মাণ্ডেরা যে কী বিপুল অর্থ ব্যয় করত, শাসকদলের চাটুকারিতা করত, তার ব্যঙ্গমূলক পরিচয় এই প্রহসনে মিলবে। এই পুস্তক-পুস্তিকাগুলির বিশেষ কোন সাহিত্যগুণ না থাকলেও সেকালের সমাজ ও ইতিহাসের জন্যই এগুলির আলোচনা হওয়া দরকার। শ্রীমতী বিশ্বাস এই গ্রন্থে উক্ত রচনাগুলির সারসংক্ষেপ করেছেন এবং তার পশ্চাদ্বর্তী ঐতিহাসিক নথিপত্রও উল্লেখ করেছেন। এই সমস্ত তথ্য এদেশে পাওয়া সম্ভব ছিল না, সেদিক থেকে তিনি লণ্ডন প্রবাসের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন। সেকালে 'হুজুর' ও 'মজুরে'র মধ্যে যে অমানুষিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, সে 'হুজুরে'র মধ্যে অনেক বাঙালিও ছিল, সেই সমস্ত অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য শ্রীমতী বিশ্বাস ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করে বাঙালি পাঠকের এই-সম্পর্কে কৌতূহল নিবৃত্তির চেষ্টা করেছেন। আমরা আগেই বলেছি, সাহিত্যের দিক

থেকে নয়, সেকালের সমাজ ও আন্দোলনমূলক রাজনীতির জন্মেতিহাস জানতে গেলে এই বইগুলির সাহায্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে।

শ্রীমতী প্রতিভা বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যে নবাগত। ইতিপূর্বে তিনি যে বিশেষ কিছু লিখেছেন তাও মনে হয় না। কিন্তু তাঁর এই প্রথম রচনায় যে মুন্সিয়ানা ও পরিশ্রমের পরিচয় আছে তা অন্যত্র দুর্লভ। রচনাগুলির সংক্ষেপীকরণ এবং তার পটভূমিকা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যাবতীয় তথ্য পরিবেশন করে লেখিকা বাংলা সাহিত্যের একটি বিস্মৃত ইতিহাসের দিকে আমাদের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি ও-দেশ থেকে এই ধরনের আরো অনেক দুষ্প্রাপ্য ও অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য উদ্ধার করুন, তা হলে বাঙালি জাতির আধুনিক সমাজ, ইতিহাস ও রাষ্ট্রচেতনার অনেক গোপন অন্ধিসন্ধি জানা যাবে। বাঙালি পাঠক পাঠিকার পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দিত করি।

পূর্ব্বভাষ

নাটক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রশাসন ব্যবস্থার দিকে কেন হাত বাড়ালাম প্রথমেই এ প্রশ্ন অনেকের মনে আসতে পারে। আমার মনে হয় উপন্যাস ও নাটকের শুধু সাহিত্যিক মূল্যায়ন নয়, ইতিহাসের নিক্তিতে কতটা নির্ভর-যোগ্য তথ্য এরা পরিবেশন করে তার হিসাব নিকাশেরও দাম আছে। যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের আওতায় এসব সাহিত্যিক ফসল ঊনবিংশ শতাব্দী আমাদের দিয়েছিল, তার বিশ্লেষণও কম চাঞ্চল্যকর নয়। যারাই উনিশ শতকের বাংলায় কোন না কোন ভাবে হুজুর হয়েছেন, সরকারী, আধা-সরকারী, বেসরকারী সেইসব প্রভুদের কর্মকাণ্ডের ইতিবৃত্ত এই 'হুজুর-দর্পণ'।

এই গ্রন্থে কয়েকটি রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রহসন নিয়ে আলোচনা হয়েছে বাংলা সাহিত্যে যার সম্বন্ধে আলোকপাত বেশি হয়নি। এদের সাহিত্যিক মূল্য কতখানি তা নিয়ে তর্ক উঠলেও, আমাদের প্রপিতামহরা কি সমাজে বাস করতেন তার নির্দ্দেশিকা হিসাবে এদের মূল্য অসীম। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ লাইব্রেরী (পূর্ব্বতন ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী) হতে বেছে বেছে যে কটি নাটকের উপর কাজ করেছি তার প্রত্যেকটির সঙ্গে আমলারা কোন না কোন ভাবে যুক্ত। কাজেই নাট্যকাররা প্রশাসন ব্যবস্থাকে ঠুকে অনেক কথাই এসব বইতে লিখেছেন। এছাড়া বাঙ্গালীর জাতিগত দুর্ব্বলতার উপরেও কটাক্ষ করা হয়েছে।

বিদেশী শাসনের স্বরূপ বাংলার শিক্ষিত সমাজের কাছে প্রকট হতে বেশীদিন লাগেনি। অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে নানা ভাবে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় 'নীলদর্পণ' 'চা-কর দর্পণে'র মতো নাটক আত্মপ্রকাশ করে। দেশপ্রেমের স্মারক এই সব রাজনৈতিক প্রহসন সম্বন্ধে ইংরাজ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। মনুগত ধনিক শ্রেণীকে রাজা রায়বাহাদুর খেতাব দিয়েও সাধারণ মানুষকে পীড়ন করে সাম্রাজ্যের তক্ত-তাউস দীর্ঘদিন রক্ষা সম্ভব নয় বুঝে শাসকগোষ্ঠী আইনকে কঠোরতর ও বিধিবদ্ধ করতে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে Act No-XIX of 1876, passed by the Governor General of India in Council : The Dramatic Performance Act

পাশ হয়। এই ধারাগুলির বলে যে কোন সর্বসাধারণের ব্যবহৃত স্থানে বা টিকেট বিক্রি করে অভিনয় করা সরকার বন্ধ করে দিতে পারেন এবং এমন নাটকের বিষয়বস্তু নিন্দাসূচক বা উত্তেজনাসৃষ্টির মাধ্যম হতে পারে কিনা সে বিচারের ক্ষমতা কোন ম্যাজিস্ট্রেটের (পুলিশ বিভাগীয় বা জেলা অধিকর্তার) থাকবে। এর সোজা অর্থ হল এই যে, যে কোন নাটক বন্ধ করে দেয়া বা উদ্যোক্তাদের শাস্তি দেয়া আইনের দোহাই দিয়ে খুব সহজ করে দেওয়া হল। এই আইন মোতাবেক ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭৬, ১২৪ (ক) এবং ২৯৪ ধারা প্রয়োগের ব্যবস্থাও থাকল।

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রেকর্ড বিভাগে সযত্নে রাখা বেশ কিছু সরকারী নির্দেশনামা (Despatch), কার্যবিবরণী (Proceedings) ও দেশীয় সংবাদপত্রের ইংরাজী অনুবাদ (Report on Native Papers) আছে যা ঐসব প্রহসনে লেখা ঘটনা ও অবস্থাকে সমর্থন করে। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ লাইব্রেরীর অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই, নিঃখরচায় এ বইয়ের সমস্ত প্রতিলিপি নেবার অনুমতি দিয়ে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর ডিরেক্টর মিঃ বি. সি. ব্লুমফিল্ড ঋণপাশে বদ্ধ করেছেন। ধন্যবাদের সংগে যাঁদের সহযোগিতা স্মরণ করছি তাঁরা হলেন—ব্রিটিশ লাইব্রেরীর শ্রীমতী দীপালি ঘোষ, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর মিঃ সেলিম কুরেশী, মিঃ জন সিমস, মিঃ মার্টিন ময়ের ও বাংলাদেশের কবি নয়ীম গহর।

ন্যাশানাল লাইব্রেরীর মিঃ এম এন নাগরাজ ও ডাঃ বিজয় দেব এ গ্রন্থের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেছেন। এঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অগ্রজপ্রতিম শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য হাতে পাণ্ডুলিপি তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। তিনি লেখার ত্রুটি বিচ্যুতি শোধন ও প্রকাশকের সংগে যোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর সৌজন্য কৃতজ্ঞতার সংগে স্বীকার করছি। "হুজুর-দর্পণ" সংকলনে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফীর শ্রীমতী হরিমাধুরী বিশ্বাস দ্বৈত ভূমিকা নিয়েছেন। এই বইয়ের আদ্যন্ত প্রুফ সংশোধন, সূচীপত্র ও নির্ঘণ্ট সংযোজনা করে তিনি গ্রন্থের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। শ্রীমতী বিশ্বাসের কাছে আমি ঋণী। এতদূর থেকে প্রকাশকের সংগে অহরহ যোগাযোগ রাখা আমার পক্ষে একরকম অসম্ভব। ভগ্নীপতি শ্রীভবানী প্রসাদ দত্ত সে দায়িত্ব নিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করেছেন। তাঁর কথা উল্লেখে তাঁর প্রগাঢ় স্নেহের কথাই মনে পড়ে।

হুজুর-দর্পণ প্রকাশে ফার্মা কে এল এম আগ্রহ প্রকাশ করায় এ পাণ্ডুলিপি শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের হাতে ন্যস্ত হয়। দুঃখের বিষয় কাজ শেষ

হবার আগেই শ্রীমুখোপাধ্যায় দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর প্রয়াত আত্মার শান্তি কামনা করি। কানাইবাবুর উত্তরসূরী ও সুযোগ্য সন্তান শ্রীরথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পিতার কাজ সুসম্পন্ন করেছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

এ গ্রন্থে আমার অভিমত একান্তই আমার নিজস্ব। মন্তব্য করেছি একজন সাহিত্যসেবী হিসেবে, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর স্টাফ হিসেবে নয়। আর আমার মতামতের জন্য ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী কোনক্রমেই দায়ী নয়।

সবশেষে, লেখায় ত্রুটি বিচ্যুতি অসংগতি থাকলে সে দোষ আমার। এজন্য মার্জনা চেয়ে রাখছি।

প্রতিভা বিশ্বাস

সূচীপত্র

THE

BATTLE OF THE MARKETS!

—∞—

বাজারের লড়াই!

কলিকাতা।

স্মিথ কোম্পানির যন্ত্রে।

মাঘ, ১২৮০।

মূল্য ৶০ আনা।

দি ব্যাটল্ অব দি মারকেট স

বাজারের লড়াই

[তিন অঙ্কের এই নাটিকা ছোট্ট হলেও, সাহেবদের স্বার্থে ধর্মতলা বাজার তুলে দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির নতুন বাজার বসাবার দাবীর বিরুদ্ধে ধর্মতলা বাজারের অধিকর্তা হীরালাল শীল কি ভাবে আত্মমর্যাদার সঙ্গে যুঝেছিলেন—লেখক অল্প কথায় সুন্দরভাবে তা' দেখিয়েছেন। নাটকে রচয়িতার নাম খুঁজে না পাওয়া গেলেও, একথা কারও অজানা নয় যে স্বনামধন্য সাংবাদিক-সাহিত্যিক শিশিরকুমার ঘোষ এর লেখক। সমসাময়িক কোন কোন পত্রিকায় দুই বাজারের লড়াই নিয়ে লেখা হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রহসনের শেষে তা' যুক্ত হল।]

মিউনিসিপ্যালিটির দপ্তরে তিন ব্যক্তি হগ সাহেবের দর্শনার্থী হয়ে এসেছেন। এরা হলেন করদাতা। মিউনিসিপ্যালিটির কর কিছু কম করে ধরা হোক, এই আর্জি নিয়ে এদের আসা। কর কমাবার ব্যাপারে মিঃ হগ প্রথম থেকেই নারাজ। এদের সঙ্গে খানিক কথাবার্তার পরে হগ সাহেব বিরক্ত হয়ে ওঠেন, সুস্পষ্ট জানিয়ে দেন কর কমানো হবে না। করদাতারা স্থানত্যাগ করলে, মিঃ হগ কেরাণীর কাছে নতুন বাজারের হিসাব নিকাশ চান। কেরাণী জানান যে আরজান কসাই দু'মাস নতুন বাজারে মাংস বেচবে এই শর্ত্তে সাতশ' টাকা পেয়েছে, মানাউল্লা কসাই পেয়েছে তিনশ' টাকা কারণ সে ধর্মতলা বাজার হ'তে তিন জন কসাইকে ভাগিয়ে নিয়ে আসবে। তবে হাফেজ মুরগীওয়ালা দু'শ' টাকা আগাম নিয়েও এখন সেই ধর্মতলা বাজারেই কারবার করে। হগ সাহেব বিধান দেন জমাদারকে দিয়ে সেটাকা আদায় করতে, অথবা হগ সাহেবের কাছে তাকে ধরে আনতে, নয়তো পুলিশে চালান দিতে। কেরাণী এবার জানান যে আলুর ব্যাপারী ধর্মতলা বাজারে তার ব্যবসা বন্ধ করার খেসারত পেয়েছে পঞ্চাশ টাকা আর বেগুনওয়ালা দু' টাকা। বেগুনের নামে মিঃ হগ তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন। সাহেবরা নাকি বেগুন ছোঁয়! "বেগুন সাহেব লোকদের কিছু প্রয়োজন নাই।"

কেরাণীর ফর্দে আরও প্রকাশ পায় যে ধর্মতলা বাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়

সাহেব খন্দেরদের প্রলুব্ধ করতে, তাদের রাহা খরচ ও গাড়ীভাড়া বাবদ তিনশ' পঞ্চাশ আর মিষ্টান্ন বিতরণে চারশ তিরিশ টাকা মিউনিসিপ্যালিটির তহবিল হতে গিয়েছে। এরপর আছে অপচয়ের হিসাব। বাজারে অবিক্রিত মাল মিউনিসিপ্যালিটিকে মোটা খেসারতে কিনতে হয়েছে, যদিও এসব বাড়তি শাকসব্জি সাহেবদের ঘোড়াদের খাওয়ানো হয়েছে, আর মালপত্র চাকর বাকরে নিয়েছে। সবশেষে কেরাণী জানতে চান যে মিউনিসিপ্যালিটির বাজারের ভোজপর্ব্বে সেদিন যে মোটা টাকা খরচ হয়ে গেল সেটি কোন্ খাতে দেখানো হবে, কারণ বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলছিলেন যে ভোজের খরচ হগ সাহেবের নিজের খরচ। ও টাকা 'করদাতাদের' পকেট থেকে আসতে পারেনা : করদাতাদের ব্যাপার হলে শুধু সাহেবদের না খাইয়ে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতিদেরও খাওয়ানো কর্ত্তব্য ছিল।

[বাবু হীরালাল শীলের প্রবেশ]

তার আসার উদ্দেশ্য ছিল দুই বাজার নিয়ে ঝগড়া বিবাদের একটা মিটমাট করা।

হীরালাল—আমার বাজারে ৬০ হাজার টাকা লাভ, এর মূল্য ১২ লক্ষ টাকার অধিক, আপনি ৬ লক্ষ টাকা দিয়া কিনিয়া লউন, আমি এখনি বিক্রয় করিব।

হগ—ছ-লাক-টাকা! এত টাকা কোথায় পাব? পাইলেই বা কেমন করিয়া ব্যয় করি? রেট পেয়ারদের টাকা ব্যয়ের ধর্ম্মভার আমার উপর। এমনি বেচারিরা ট্যাক্সের ঘায়ে জ্বর ২, তার উপর আবার ট্যাক্স। রেট পেয়ারদের টাকা আমার গায়ের রক্ত। বিশেষতঃ ও সম্বন্ধে আইন হয়ে গিয়েছে। আর এক্ষণে ক্রয় করিবার যো নাই।

হীরা—আইন পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন আইন করিলেই পারেন? আপনি তো সর্ব্বময় কর্ত্তা?

হগ—হাঁ, লেফটেনেন্ট গবর্ণর আমার একটু কথা শোনেন বটে। কিন্তু বাজার কিনিয়া আমার দরিদ্র রেটপেয়ারদের করের বোঝা আর বাড়াইতে চাই না।

হীরা—তবে আর মেটে কিরূপে?

হগ—এক কর্ম আছে। তোমার বাজারটিও আমাদের দেও। এই দুই বাজারে যে লাভ হইবে তার অর্দ্ধাদ্ধি ভাগ করিয়া লইব।

হীরা—এখন সবই পাইতেছি, এ অর্দ্ধেক আপনাকে দেই কেন ?

হগ—আদপে কিছু না পাওয়ার চেয়ে অর্দ্ধেক পাওয়া ভাল।

হীরা—আদপে পাব না কেন ?

হগ—একস্থানে দুই বাজার চলে না।

হীরা—তবে আপনি নিশ্চিত বুঝিয়াছেন আমার বাজার ভাঙ্গিয়া যাইবে ?

হগ—তার প্রতি আবার সন্দেহ ?

হীরা—তবে আপনি ভাঙ্গুন। আপনার এ প্রস্তাবে আমি সম্মত হতে পারি না।

হগ—দেখলে বুঝি ভদ্রতা করে অর্দ্ধেক দিতে চাহিলাম, আর অমনি মাঙ্গা হয়ে বসলে ? না মিটাও ভাল, আমার কর্ম্ম আমি করে রাখলাম। তবে আমি বাজার বসাইলাম।

হীরা—আমি যথাসাধ্য চেষ্টা দেখিব যাহাতে আমার বাজার না ভাঙ্গে।

এরপরে দুই পক্ষে আরও কিছুক্ষণ তুমুল বাগযুদ্ধ চলে। একজন বলেন আমি কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, অন্য জন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন আমি মতিলাল শীলের ছেলে। হগ সাহেব চেয়ারের উপর উঠে টাকায় কিস্তিমাৎ করবেন বলে আস্ফালন করেন তো, হীরালাল শীল আরও উঁচু টেবিলের ওপর চড়ে দাঁড়ান। তুমুল হৈ হল্লার মধ্যে যবনিকা পতন হয়।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় ধর্মতলার বাজারের সামনে হগ সাহেবের পাহারাওয়ালা ফড়ে ভাঙ্গাবার চেষ্টায় ঘুরছে। এক কপিওয়ালাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবার সময়ে অন্য এক ফড়ে দ্রুত পাহারাওয়ালার সামনে দিয়ে যেতে থাকে। তাকে দেখে কপিওয়ালাকে ছেড়ে ফড়ের পিছনে যেতেই কপিওয়ালা মুহূর্তের সুযোগে দৌড়ে পালায়। ফড়েও হাতছাড়া হয়। এক মেছুনী সামনে পড়ে। পাহারাওয়ালা একেই ভাগিয়ে নিয়ে যাবার মতলবে এগিয়ে আসে। মেছুনী যত না না করে, পাহারাওয়ালা তত পেয়ে বসে। শেষে যখন ঝাঁকা থেকে বঁটি বার করে মেছুনী সেটি উঁচিয়ে ধরে পাহারাওয়ালা সেখান থেকে সরে পড়ে। এর পরে আর এক দোকানীকে পাহারাওয়ালা ধরে, নতুন বাজারে যেতে হবে। এসময় হীরালাল শীলের দারোয়ান এসে হাজির হয় ও দোকানীর অন্য হাত ধরে।

দা—ছোড় দেও পাহারাওয়ালা।

পা—তোম ছোড় দেও।



বাজারের লড়াই

দো—ওরে আমার হাত ছিঁড়ে গেল, ঝাঁকা পড়ে গেল।

ঠিক এই সময়ে ঘটনাস্থলে হগ সাহেব ও হীরালাল শীল প্রবেশ করেন। দু' পক্ষই অন্যদলের পাইককে হুকুম করেন দোকানীর হাত ছেড়ে দিতে। কে কার কথা শোনে? শেষে দেখা যায় হগ সাহেবকে দারোয়ানের আর হীরালালবাবুকে পাহারাওয়ালার হাত চেপে ধরতে। দোকানীকে মাঝখানে রেখে দুইদিকে চার জনে টানাটানি চলতে থাকে আর এই ক্লাইম্যাক্সের মধ্যে দ্বিতীয় দৃশ্যের যবনিকা পতন হয়।

তৃতীয় দৃশ্যে টাউন হলে জাষ্টিসদের সভায় হগ সাহেব, রবার্টস, জেমস, রাজেন্দ্রবাবু, কৃষ্ণদাসবাবু, উমেশবাবু, হীরালালবাবু ও আরও তিনজন জাষ্টিসকে উপস্থিত দেখা যায়। নতুন বাজারের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি যে টাকা আগে বরাদ্দ করেছিল, সেটাকা বাজারের স্বার্থে খরচ হয়ে গেছে। এখন হগ সাহেব নতুন দাবী তুলছেন যে আরও ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ হোক। বক্তব্যের সপক্ষে হগ সাহেব যে যুক্তি দেখালেন তা হোলো এই যে, এই ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর হলে ধর্মতলা বাজার ভেঙ্গে দেওয়া যায়। কারণ মিউনিসিপ্যালিটির সর্ব্বময় কর্তা হয়ে কতক দৃষ্টিকটু কাজ—যেমন ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স বাতিল, কসাইখানা বন্ধ রাখা, দোকানীদের হীরালালবাবুর বাজারে না যেতে বাধ্য করা ইত্যাদি তিনি করতে চান না। নতুন বাজার পত্তনে তার যে পরিশ্রম হচ্ছে তার পারিশ্রমিক সামান্য ওই কটি টাকা চাইছেন।

হগ সাহেবের সমস্ত যুক্তি রাজেন্দ্রবাবুর বাগ্মীতার তোড়ে কোথায় ভেসে যায়।

রাজেন্দ্রবাবু—হগ সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে আমি সম্মত হইতে পারিনা। হাটের নিমিত্ত বিস্তর ব্যয় হইয়াছে। আমরা আর টাকা উহাতে ব্যয় করিতে পারিনা। তিনি হাট করুন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই কিন্তু ইহা লইয়া মিছামিছি বিবাদ কি অন্যায় আচরণ করিতে অনর্থক ব্যয় করা আমার মত নহে। তিনি বিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, আপন ব্যয়ে লাঠিয়াল রাখিয়া হীরালাল শীলের সঙ্গে বিবাদ করুন, সাহেব সুবাকে খাওয়ান দাওয়ান, নিজে ব্যয় করুন। আমরা কখনই ইহার নিমিত্ত টাকা মঞ্জুর করিতে পারিব না…।

হগ সাহেবের শেষরক্ষা হলনা। রবার্টসও রাজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে সুর মেলান।

রবার্টস—আমার বিবেচনায় বাজারের নিমিত্ত আমরা আর টাকা ব্যয় করিতে পারিনা, তাহা করিলে বে-আইনী করা হইবে।

হগ—রবার্টস ! এই নিমিত্ত বুঝি সেদিন এত টাকা ব্যয় করিয়া তোমাদের কাটলেট, কোরমা, কাবাব, স্যামপেইন, সেরি খাওয়াইয়াছিলাম ? ও নেমকহারাম, আজ পর্য্যন্ত তা যে জীর্ণ হয় নাই !

রবার্টস—তুমি তোমার ঘরের টাকা আনিয়া আমাদিগকে খাওয়াইয়াছিলে, না ? সে টাকা তোমার কিসের ? আমি যাদের টাকা খাইয়াছিলাম তাদেরই হিত চেষ্টা পাইতেছি । ২০ হাজার টাকা কেন, আমরা এক কড়াও মঞ্জুর করিবনা ।

হগ—জাষ্টিসরা অবশ্য মঞ্জুর করিবেন ।

রবার্টস—আমি তো না ।

হগ—তুমি সকল জাষ্টিস না ।

কিন্তু হগ সাহেবের দুর্ভাগ্য, একে একে তিনজন জাষ্টিসই টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব না-মঞ্জুর করেন । স্তম্ভিত হগ সাহেব টাকার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে,—“থাকল তোমাদের বাজার । বাজার পুড়ে যাক্, চুলোয় যাক্, উচ্ছিন্ন যাক্—তোমরা উচ্ছন্ন যাও, তোমরা সকলই আমার বিরুদ্ধ, এত টাকা দিলে আর ২০ হাজার টাকা দিতে পাল্লে না, থাকলো তোমাদের বাজার, থাকলো তোমাদের মিউনিসিপ্যালিটি, থাকল তোমাদের কাগজপত্র”—এই বলতে বলতে স্থানত্যাগ করেন । যবনিকা নেমে আসে ।

গ্রেট মারকেট ওয়ার

অর্থাৎ

প্রধান বাজারের লড়াই।

শ্রীসুরেনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

এবং শ্রীযুক্ত বাবু নেপালচন্দ্র দাস মিত্র দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

সমাচার সুধাবর্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল।

মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

গ্রেট মারকেট ওয়ার

অর্থাৎ

প্রধান বাজারের লড়াই

[তিন অঙ্কের ছোট নাটিকা। বিষয়বস্তু : ফড়ে, যোগানদার, মালচালান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে ধর্মতলা বাজার ও নতুন বাজারের মধ্যে দ্বন্দ্ব।]

ধর্মতলা বাজারের অধিকর্তা বাবু হীরালাল শীলের কাছে ফড়েরা নালিশ করে যে তাদের পণ্য নিয়ে ধর্মতলা বাজারে আসতে বাধা দিচ্ছে নতুন বাজারের (মিউনিসিপ্যাল বাজারের) জমাদাররা, "বলে কিনা নতুন বাজারে চ', আরে মোলো যা মোরা নতুন বাজারে গেলে পরে মোদের কি হবে। একদিন না রোজগার কর্ত্তে পাল্লে মোদের জান বাচ্ছা না খাতি পেয়ে মারা পড়বে।"

অন্য একজন ফড়ে—"আরে মোশাই এ আবার নীলকরের বাড়া, বেটারা বলে কিনা আবার দাদন নাও!"

হীরালাল বাবুর জমাদার জানায়—"হাঁ খোদাবন্দ, অত্যন্ত পীড়ন আরম্ভ করেছে। এ বাজারে প্রায় আর ফড়েদের আসতে দেয় না, আমাদের বাজারের সম্মুখে এলেই অমনি ধরে নতুন বাজারে নিয়ে যায়। একি কম অরাজকতা মশাই।"

হীরালালবাবু ব্যবস্থা দেন যে তার জমাদার রোজ ফড়েদের সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। দেখা যাক কী করে ধরে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় নিজ কাছারিতে বসে হগ সাহেব স্বগত উক্তি করে যাচ্ছেন, "নিউ মিউনিসিপ্যাল বাজারে যদি অধিক লাভ হয় তাহলে আমার বড় খোন্‌নাম হবে। আমি একটা বড় টাইটেল পাব। আর এই বাজারটিতে যে সাহেবদিগের বিশেষ উপকার হবে তার সন্দেহ নাই, আমার নতুন বাজারে কেবল গোস্ত হলেই চলতে পারে। আমি তো শ্লাটার হাউস বন্ধ করেছি, কাজে কাজেই কসাইদের আমার হাতে আসিতে হইবে, আর মোদের নিমিত্ত যে সমুদয় বন্দোবস্ত

তা তো করেছি, আর কি চাই। যখন নূতন বাজারের নিমিত্ত টাকা চাওয়া যায় তখন নেটিভ বেঙ্গলী জাস্টিসরা কত কথা বলেছিলেন। একবার নূতন বাজারটা জেঁকে গেলে হয়, দেখা যাবে ; কিন্তু আমার এই নূতন বাজারে ইংরাজদের ভোজ দেওয়া অবধি আমাদের ইংলিস জেন্টেলম্যানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি দেখিতেছি। এবার রেট পেয়ারদের কিছু বাড়ান কর্ত্তব্য।"

কিন্তু হগসাহেবের বিপত্তি বাধে করদাতাদের নতুন আর্জিতে, মিউনিসি-প্যালিটির কর কিছু কম করে দিতে হবে। হগসাহেব নারাজ। করদাতারা ক্ষুন্ন হয়ে ফিরে যান। এবার হগ সাহেবের তলব হয় রাইটার বাবুকে। নতুন বাজারের জন্য যা খরচ হয়েছে তার হিসাব দিতে গিয়ে রাইটার বাবু জানান যে কসাইদের ৭০০, উমাচরণ দত্ত রং ওয়ালাকে ২, ধর্মতলা বাজার হইতে ভাগিয়ে আনা আলুওয়ালাকে ১০ আর রসিকলাল বইওয়ালাকে ১ দেওয়া হয়েছে। হগ সাহেব আপত্তি করেন বইওয়ালা সম্বন্ধে কারণ সে শিশুশিক্ষা, চারুপাঠ, বর্ণ পরিচয় বেচে। তিনি বলেন "সাহেবরা এই সকল বই দেখিলে অবসিনিটি বলে বাজারে আর কেউ আসতে চাইবে না।"

এবার রাইটার বাবু জানতে চান সাহেবদের সেদিন যে খানাপিনা ভোজ দেওয়া হয় তার খরচ কার নামে যাবে ?

হগ—মিউনিসিপ্যালিটির নামে।

রাই—কৃষ্ণদাস বাবু বলেন মিউনিসিপ্যালিটির খরচ নয়।

কিন্তু বাঙ্গালি জাস্টিসদের আপত্তি খাটে না। ভোজের বিল মিউনি-সিপ্যালিটির কাঁধে চাপে।

তৃতীয় দৃশ্যে অশথতলায় মদো আর হারু আসীন। মদো জানায় যে বাড়ীর পাটনায়ে ডালিম গাছে কটা ডালিম হয়েছিল, তা' নিয়ে ধর্মতলার বাজারে বেচতে যাবার ইচ্ছে ছিল, আর হয়ে উঠল না।

হারু—আরে মোদো চাচা, দুই বাজারে বড় ঝকড়া লেগে গেছে, চাঁসদের সব ধরে নতুন বাজারে নিয়ে যাচ্ছে।

মদো—আরে বলিস কি ? ভাগ্যিস যাইনি কো।

এরপরে মদোর অনুরোধে হারু নীলকর সম্পর্কে বিদ্যাভুনী রচিত সেই বিখ্যাত গানটা ধরে।

যত সব নীলবানরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারখার

অসময়ে হরিশ মলো লংএর হলো কারাগার
প্রজার আর প্রাণ বাঁচান ভার।
রাম সীতার কারণে সুগ্রীবে মিতালী করে বধে রাবণে
যত আফিসের সাহেব সহায় এদের, আর......দুটো এডিটার
এখন স্পষ্ট লেখা ঘুচে গেল, জজ সাহেব এক অবতার।
যত...রাজত্ব হলো, সাধুর পক্ষে গঙ্গাপার।

দুই বাজারের বিবাদ-অশান্তি কিছুদিনের মতো স্থগিত থাকে, কারণ প্রহসনের উপসংহার অনুযায়ী,

"এক্ষণে হগ সাহেবের নূতন বাজারে সাহেবেরা কেনা বেচা করিতেছেন। বাবু হিরালাল শীলের বাজার কিনিবার কথা ছিল বটে, কিন্তু টাকার অনটন হেতু কেনা হল না। এক্ষণে সমুদয় গোলমাল চুকিয়া গিয়াছে।"

সাদা কালোর কলহের মধ্যে যার জন্ম, সেই সুন্দরী নিউমার্কেট কলকাতার ইউরেশিয়ান সমাজের কণ্ঠহার হয়ে দীর্ঘদিন দুলতে থাকে। আঁতুড়ে এর ঝিনুক বাটি যোগাতে শহরকর্তাদের কিন্তু বেশ হিমসিম খেতে হয়েছিল। বাজার বসাতে বিরাট অর্থসমস্যা দেখা দেয়। সমসাময়িক কাগজেও এই নিয়ে লেখা-লেখি হয়। দেখা যাক কিভাবে কর্তৃপক্ষ এর ফয়সালা করেছিলেন।

বাজারের জন্য জমি কেনা, বাড়ী তৈরী বাবদ ছয় লক্ষ টাকার এক ঋণ কলকাতার 'জাষ্টিস অফ পীস' বঙ্গ সরকারের অনুমতিক্রমে ভারত সরকারের কাছে চাইলেন। মধ্যপথে বঙ্গ সরকার এক আপত্তি তোলেন যে, শুধু শতকরা ৫% সুদই নয়, সিঙ্কিং ফান্ডের নিরাপত্তার জন্য তারও উপর আরও শতকরা ৩% সুদের সর্ত 'জাষ্টিস অফ পীসকে' মেনে নিতে হবে। জাষ্টিসদের চেয়ারম্যান মিঃ এইচ. এ. ককরেল বিস্তর যুক্তি[১] দেখিয়ে ছোটলাটকে জানালেন যে সহরের যাবতীয় কর এবং খাজানা অতিরিক্ত জামিন হিসেবে নেওয়া হয়েছে, সুতরাং আশঙ্কার কারণ নেই। এরপর বঙ্গসরকারের সেক্রেটারী মিঃ এ. ম্যাকেঞ্জি ভারত সরকারের অর্থদপ্তরে লিখলেন[২] যে ২৫ বৎসর ঋণের মেয়াদে জাষ্টিসরা চুক্তিবদ্ধ হলে ভারত সরকার পুনর্বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

টাকার সংস্থান হলো, এবার শুরু হয় কাজ। মুশকিল বাধে যখন দেখা যায় বাড়ী তৈরির কারিগরী ব্যবস্থায় গুরুতর গলদ ঘটেছে, লোহার খিলান ছাদের

(১) Proc. of the Govt. of Bengal in the Judicial (Municipal) Dept., Feb. 1873, No 26.

(২) ibid No. 28,

গম্বুজকে ধরে রাখতে পারছে না। কাজেই লোহার জায়গায় ইটের গাঁথুনি দিতে হলো। এবার পুরোদমে কাজ চলতে থাকে, কিন্তু হাতের কাছে ধর্মতলার বাজার চলতে দিলে নতুন বাজারের সৌভাগ্যলক্ষ্মী লাভ হয় কিভাবে? কলকাতা পৌরসভার ১৮৭৪ সালের রিপোর্ট[১] লিখছে—"It was partially opened at the commencement of the year, but as it had to compete with the old established Dhurrumtollah Bazar, constant misunderstanding arose between the establishment in charge of the Municipal Market and the owners of the Old Bazar. After much consideration, the Justices with the sanction of the Government of Bengal, decided on purchasing the Dhurrumtollah Bazar, and a special Act was passed by the Bengal Legislative Council to empower the Municipality to give effect to its decision." পৌরসভার রিপোর্ট আমাদের আরও জানাচ্ছে যে, ধর্মতলা বাজার হাতে আসার পর এটিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের বাজার হিসাবে রোজ খোলা হয়, আর নতুন বাজারের সংগে যোগব্যবস্থায় এটির কাজকর্ম চলতে থাকে, উপরন্তু ঐ বছরেই নতুন বাজারের আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়।

নতুন বাজার বসাবার প্রায় সতের বছর পরে, ১৮৯১ সালে রুডিয়ার্ড কিপলিং তাঁর 'The city of dreadful night and other places' গ্রন্থে এই বাজারের পটভূমিতে অল্প কথায় ইউরেশিয়ান সমাজের ছবি আঁকেন—"It is not one-half as pretty as the Crawford Market in Bombay, but......it appears to be the trysting place of Young Calcutta." তরুণী থিসবি মায়ের সংগে হগ-মার্কেটে সওদা করতে এসেছে। মাকে ব্যস্ত দেখে একসময়ে সে টুক করে আলাদা হয়ে পড়ে। পূর্ব্বরাগের সূত্রে তরুণ পিরামুস এসে জোটে। থিসবির মায়ের অসাক্ষাতে প্রণয়িনীর মুখচুম্বন কখনো কি তুমি করোনি পিরামুস? গোলাপের স্টলে বড় ভীড়। তাই রোমান্সহীন ফাঁকা মাংসের স্টলেই এরা ঢুকে পড়ে প্রণয় কলহ মেটাতে। ওদিকে বাজারের ঝুড়ি ছোকরা কুলির হাতে চাপিয়ে থিসবির মা ডাকাডাকি শুরু করে, তার কেনাকাটা শেষ, মেয়ের তাই তলব।

(১) Admin. Rep. of the Calcutta Municipality, 1874, p. 30, No. 98

"Pyramus departs. He never came here to do any marketing. He came to meet Thisbe who in ten years will own a figure very much like Mamma's. May their ways be smooth before them and after honest service of the Government, may Pyramus retire on Rs. 250 per a mensem, into a nice little house somewhere in Monghyr or Chunar.

"দারগা মশাই" প্রহসন।

শ্রীহরিগোপাল মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা

গুপ্তযন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৯৪। ইং ১৮৭২।

মূল্য।৵০ আনা মাত্র।

"দারগা মশাই" প্রহসন

আত্মম্ভরী, অপদার্থ দারোগা থানার প্রভু সেজে শৃঙ্খলার নামে কতদূর বিশৃঙ্খলা ডেকে আনতে পারে তারই পরিচয় এই নাটক। শান্তিরক্ষার ধারক, বাহক পুলিশ বিভাগ গত শতাব্দীর বাংলায় এক স্বেচ্ছাতন্ত্রের অবতারণা করেছিল। 'এক অদম্য, ভয়াবহ পীড়ন যন্ত্র'

যার মাধ্যমে

'মানুষের ওপরে অন্যায় ও উৎপীড়নের বিরাট এক বোঝা চাপানো হয়েছে'

এবং

'যার ফলে সমাজের নিম্নস্তর এমনভাবে নৈতিক অধোগতির পথে নেমে গেছে যা ক্রমান্বয়ে গুরু ধরনের অপকর্মের দ্বারাও তা সম্ভব হতো না'

তাছাড়া

'সারা বাংলায় বিরাট সংখ্যক সাজানো মামলা প্রত্যক্ষ করে'

এবং

'তাঁর সামনে উপস্থিত এধরনের কয়েকটি মোকদ্দমা পরীক্ষা করে'

তাঁর এ আশঙ্কা করার কারণ রয়েছে যে, 'দণ্ডিতদের বেশীর ভাগই নির্দ্দোষ।'

বাংলার লেফটেনান্ট গবর্ণর স্যার অ্যাসলি ইডেনের পূর্ণ বিবৃতি[১] হ'তে টুকরো টুকরো উক্তি উদ্ধৃত করে হাউস অফ কমন্সে আয়র্লন্ডের সদস্য মিঃ ও'ডনেল, ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭৮ সালে বাংলার পুলিশ বিভাগের উপরে এক বিতর্কের অবতারণা করেন। বিভিন্ন সমসাময়িক পত্র পত্রিকায়ও পুলিশী স্বেচ্ছাতন্ত্র নিয়ে কম লেখা হয়নি। চুঁচড়োর সাপ্তাহিক 'সাধারণী' তীব্র ভাষায় পুলিশী তান্ডব সম্বন্ধে যে সম্পাদকীয়[২] লেখেন এবং তার যে ইংরাজী তর্জমা[৩] আমরা পাই তার অংশবিশেষের অনুবাদ হ'লো—"সর্ব্বত্র প্রায় সমস্ত পত্রিকায় হামেশাই

---

(১) Calcutta the 26th December 1877, Resolution : Administration Report of the Police Department for the year 1876.

(২) ২১ শে মার্চ, ১৮৭৫

(৩) Report on Native Papers, ৩রা এপ্রিল ১৮৭৫

পুলিশ নিষ্ঠুর, অপদার্থ, মিথ্যাভাষী এবং শ্রমবিমুখ বলে ধিকৃত হচ্ছে। এভাবে ঝাঁটিয়ে অযোগ্য বলে রায় দেবার পেছনে সত্যতা থাকতেও পারে, না'ও থাকতে পারে, এবং এনিয়ে আমরা খুব মাথা ঘামাই না। আমরা শুধু প্রশ্ন করতে চাই যে আমাদের গভর্ণর কি পুলিশী অসন্তোষ সম্বন্ধে অবহিত ন'ন? দেশীয় পত্র পত্রিকা এ ব্যাপারে কি বৃথাই কলম চালাচ্ছে? সরকার নিযুক্ত ভাষ্যকারের বিরাট দল এগুলি কি ইংরাজী অনুবাদ করেন না? এতে বাস্তবিক নিরাশ হবার কথা। আমরা কি বৃথাই বিলাপ করছি? যদি অবস্থা অন্যরকম হতো, আমাদের অসন্তোষের কথা লেফটেনান্ট গভর্ণরের কানে যদি পেঁছাত তাহলে তের পৃষ্ঠারও বেশী তাঁর সুদীর্ঘ সমালোচনায় এই বিষয়ের উল্লেখ নাই কেন? কিন্তু এই অবস্থা কতদিন চলবে? সরকার হয় ঘোষণা করুন যে, এ আমাদের মারাত্মক ভুল; আমরা গায়ের গাঢ় রং, অজ্ঞতা এবং মূর্ত্তিপূজাবশতঃ শান্তিরক্ষকদের অকথিত মূল্য অনুধাবনে সমর্থ নই, অথবা বলুন যে আমাদের অসন্তোষের মূলে রয়েছে মানব প্রবৃত্তির সহজাত অভাব ও বঞ্চনা যার থেকে নষ্টামির সূত্রপাত এবং যা পুলিশের কঠোর বাধার সামনাসামনি আসতে বাধ্য।"

কলকাতার সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার মন্তব্যের[১] ইংরাজী অনুবাদ[২] হতে আবার বাংলায় তর্জমা করলে—"এই ব্যয়বহুল বিভাগের অযোগ্যতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই অবস্থার পুনরাবৃত্তি চলবে যতদিন না সৎ লোক পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত হয় এবং দুর্নীতি ও ঘুষ যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, তার প্রতিবিধান হয়; এছাড়াও এক বিরাট সংখ্যক অপ্রয়োজনীয় উঁচুপদ তুলে দিয়ে, সেই অর্থে নীচু স্তরের মাইনে বাড়ানো যেতে পারে।"

হরিনাভির সাপ্তাহিক 'ভারত সংস্কারক' পত্রিকার সম্পাদকীয়[৩] ইংরাজী তর্জমা[৪] হতে বাংলায় লিখলে দাঁড়ায়—"পুলিশ আমাদের জীবন ও সম্পত্তির অভিভাবক হওয়া সত্ত্বেও, ভদ্রসমাজ এদের এড়িয়ে চলেন ও লালপাগড়িকে ভয় করেন। এর কারণ কি? কারণ হোলো পুলিশ কর্মচারী নিজেকে রাজাজ্ঞান করে আর যথাযোগ্য মর্য্যাদা কাউকে দিতে জানেনা। যে ব্যক্তি তার অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছে, পুলিশ তাকে হেনস্থা করতে কোন চেষ্টাই বাকী রাখবে না; এমনকি সাজানো মামলায় তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনবে। জরিমানার জন্য কোন তোয়াক্কা পুলিশের নেই, ঘুষ থেকে সহজে তার ক্ষতির উশুল হয়; জেল খাটা বা প্রহারের ভয়ও পুলিশের নেই।"

---

(১) ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৭৫

(২) Report on Native Papers, ১৮ই ডিসেম্বর ১৮৭৫

(৩) ৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৮

(৪) Report on Native Papers, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৮

রাজসাহীর সাপ্তাহিক 'হিন্দুরঞ্জিকা'র মন্তব্য[১] ইংরাজী ভাষান্তর[২] হ'তে বাংলা অনুবাদ—"আগের দিনে ভদ্রসমাজে যারা লেখাপড়ায় অবহেলা করেছেন, পুলিশের চাকরী বা দারোগা হবার বাসনা ছিল তাদের শেষ ভরসা। সে সময়কার পুলিশ কর্মচারীরা ছিল এক একজন সিরাজউদ্দৌলা ; অত্যাচার, পীড়ন এবং অন্যায় অব্যাহত ছিল। আমরা স্বীকার করি পুলিশ বিভাগে অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং অনেক শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি এ বিভাগে নাম লিখিয়েছেন, কিন্তু আশানুরূপ পরিবর্ত্তন আসেনি। এর কারণ? কারণ হ'লো যারা এ বিভাগে সততার পথে চলেন, সরকারী ঘোষণাপত্রের সুনজরে তারা কখনই আসেন না, আর যারা মেলাই হামবড়া করেছেন, ক্রূর এবং নিষ্ঠুর হয়েছেন তাদের দ্রুত পদোন্নতি ঘটেছে।"

আলোচ্য নাটকের এক জায়গায় দারোগা কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় বলছেন, —"পুলিশে সত্যিও মিথ্যে হয়, আর মিথ্যে সত্যি হয়।" ঐ একই বক্তব্য সাপ্তাহিকী সোমপ্রকাশেরও। জনপ্রিয় এই পত্রিকা পুলিশ-সমস্যা নিয়ে যে প্রশ্ন[৩] করেছে তার ইংরেজী অনুবাদ[৪] বাংলায় পুনর্তর্জমা করলে দাঁড়ায়,— "সরকার পুলিশ কর্মচারীর হাতে নির্দ্দোষ মানুষের লাঞ্ছনা ও পীড়ন বন্ধের জন্য কি করেছেন? এরা যদি দিনকে রাত এবং সম্পূর্ণ নির্দ্দোষীকে জঘন্য অপরাধী বলে প্রমাণ করেও বিনা সাজায় চলতে পারে তাহলে মানুষ কি করে সুখ সাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে?"

কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় ভালুকন্যান থানার দারোগা। থানায় এজাহার, নালিশ এলে যখনই অকুস্থলে যান, দারোগার নজরানা হিসেবে দক্ষিণা নিতে কখনই ছাড়েন না। কেশবপুর গ্রামের কোন এক ছেলে সর্পাঘাতে মারা যায়। খবর পেয়ে দারোগা তদন্তে যান। ছেলের শোকে বাপের মুহ্যমান অবস্থা। কী করে নজরানা আদায় হ'লো থানার জমাদার রামেশ্বর ঘোষকে দারোগা বুঝিয়ে বলেন, "আর শালাও সেই সময় কান্না জুড়ে দিয়েছিলো, তা বাপু আর কি করি, রুধির নিয়ে বিষয়, গোমস্তা শালাকে একধারে ডেকে, চোখে আংগুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম, তবে শালা বাপ বেটার কাছ থেকে একটা টাকা এনে দেয়।"

(১) ২২শে নভেম্বর ১৮৭৮
(২) Report on Native Papers ৭ই ডিসেম্বর ১৮৭৮
(৩) ২২ শে মে, ১৮৭৬
(৪) Report on Native Papers, ২৭শে মে ১৮৭৬

রামেশ্বর—মশাই ও রকমে আর টাকা নেবেন না, ওতে বড় অধর্ম্ম হয়।

কম—অধর্ম্ম কিসে বাপু, আমি হাকীম, আমায় নজর দেবেনা ?

রামে—আজ্ঞে ও বিষয়ে নজর নেয়া অত্যন্ত অত্যাচার।

কম—কিসের অত্যাচার ? ঘর থেকে কি বাপু পাল্‌কী ভাড়াটা দিতে হবে ?

রামে—নাই পাল্‌কী চড়লেন।

কম-- বেশ বাপু, আমি একজন মফঃস্বলের হাকীম, আমার কি চোলে যাওয়া ভাল দেখায় ?

রামে—তেমনি আপনার কি পুত্রশোকে আচ্ছন্ন এমন এক ব্যক্তির কাছে থেকে টাকা নেয়া ভাল দেখায় ?

কম—উঃ, বাপু আমার কি ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির গো।

ঊর্দ্ধতন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছ হতে চিঠি আসে এই মর্মে যে অন্য এক থানা কনকপুরে এক মকদ্দমার তদন্ত সন্তোষজনক হয়নি। ভালুকনানের কমলাকান্তকে ঐ ব্যাপারে তদন্ত করে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। দেশে এত থানা আর দারোগা থাকতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নজর তারই দিকে পড়াতে কমলাকান্ত আহ্লাদে আটখানা। জমাদার বিজয়মাধব ও রামেশ্বরকে ডেকে সগর্বে বলেন

"বাপু আমি দারোগাগিরি অতি সামান্য কায বিবেচনা করি। আমি এ কর্ম্ম কত্তাম না, কেবল ডেপুটি মেজেষ্টরী আমার ত্বরায় হবে, এই জন্যেই এতে ঢোকা, তা নৈলে বাপু আমি কি এতে আসি ?"

বিজয়—ডেপুটি মেজেষ্টরী পাওয়া আজকাল বড় শক্ত মশাই।

রামে-- (স্বগত) ব্যাটাকে ফোলানো যাক্ না, (প্রকাশ্যে) যারা লেখা পড়া জানে না, তাদের ডেপুটি মেজেষ্টরী পাওয়া শক্ত বটে, বাবুর অনায়াসেই হতে পারে।

কম—(সগর্ব্বে) আরে বাপু ডেপুটি মেজেষ্টরী কায তো বড় শক্ত, আমাদের দারোগাগিরি কাযে কেবল সাজা দেবার ক্ষমতা নেই, এই যা, তা নৈলে সকলই মেজেষ্টারের মত কায।

রামে—আজ্ঞে ভাগ্যিস আইন কর্ত্তারা আমাদের সাজা দেবার ক্ষমতা দ্যান নি।

কম—কেন তাহলে কি হতো ?

রামে—তা হলে সকলেরই ফাঁশী হতো, আর কি হবে। এতেই রক্ষে নাই, আবার সাজার ক্ষমতা।

বিজয়—একেবারে, না ছমাসের হে ?

কম—কি রক্ষে নেই বাপু ?

রামে— ধর্ম্ম অবতার চুরি মকদ্দমার তদারকগুলো স্মরণ করুন না, তাহলে রক্ষা কি বিনাশ বুঝিতে পারবেন।

কম—ওহে বাপু চোরকে না মাল্লে ধল্লে কি ও গুণ্ডটার সন্তানেরা একরার করে, না মাল বার করে দেয় ?

রামে—কিন্তু মারা তো আইনের বিপরীত কায মশাই ?

কম—তা বিবেচনা কল্লে চলে কৈ ?

রামে—চলবেনা কেন ?

উত্তরে কমলাকান্ত বলেন যে যাহোক করে মকদ্দমার একটা কিনারা করতে না পারলে ওপরওয়ালাদের কত তম্বি, রামেশ্বরের মতো ধর্মপুত্তুর সাজলে দেশে থানা পুলিশ চলবে কি করে ?

কমলাকান্ত কনকপুর থানায় তদন্তের কাজে চলে গেলে, দুই জমাদার দারোগার আহাম্মকি নিয়ে আলোচনা করে।

বিজয়—বেটা ভেবেছে কি জান যে এত দারোগা থাকতে যখন ওর উপর তদারকের ভার হয়েছে, তখন হাকীমেরা ওকে বড় লোক বলে জেনেছে।

রামে—আসল কথাই তো তাই, কিন্তু ব্যাটা এ ভাবলে না যে কনকপুর থানা আমাদের থানার অতি নিকট বোলে ওকে হুকুম হয়েছে।

বিজয়—ভাব্বে কে, ব্যাটা যে ডাহা আহাম্মক।

কনকপুরে সরেজমিনে তদন্ত করার পর কমলাকান্ত দেখলেন যে প্রথমবার তদন্তের পরে কনকপুরের জমাদার যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা মিথ্যা নয়। দ্বিতীয়বার তদারকের শেষে কমলাকান্ত ঠারে ঠোরে এ থানার জমাদারের কাছে নজরানা চাইলেন। জমাদারও তো একই ডালের পাখী, বুঝেও বুঝতে চান না। শেষে চোখে আঙুল দিয়ে বলাতে, উত্তর করেন—সেই আমরই তো রায় বজায় থাকছে, তাহলে আর কেন। এবার দারোগার রাগবার পালা। যাহোক করে দশটি টাকা আদায় করে ছাড়লেন। শুনে ধর্ম্মপুত্তুর রামেশ্বর বলে যে তাঁবেদারের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়া ঠিক হয়নি।

কম—তাঁবেদারটা কে হে আবার ?

বিজয়—(স্বগত) তোর বাবা ! ব্যাটা আহাম্মক কোথাকার, তাঁবেদার বুঝতে পাল্লেন না।

রামে—ক্যান কনকপুর থানার জমাদার ?

কম—সে কি আমার তাঁবেদার ?

রামে—আপনার তাঁবেদার নয়? আপনি হোলেন দারোগা, সে হোলো জমাদার আবার তাঁবেদারের বাকি রৈলো কোন খানটা।

কম—হাঁ অমন ধত্তে গেলে জেলাসুদ্দুই তাঁবেদার হোয়ে পড়ে।

রামে—আজ্ঞে তাঁবেদার সন্তান তুল্য, তাদের নিকট ঘুষ নেয়া বড় অত্যাচার ও অধর্ম্ম, অমন কর্ম্ম কখন কর্ব্বেন না।

কম—হাঁ হে বাপু তুমি তাই কোরো।

ঘুষখোর দারোগা সন্ধ্যাবেলা রসরাজ। স্থানীয় বেশ্যা চম্পকলতার অতিথি হয়ে কমলাকান্ত সবে এক গ্লাস মদ নিয়ে বসেছেন। এমন সময় কনেষ্টবল হনুমান সিং হাঁক ডাক শুরু করে। থানায় জরুরী মোকদ্দর্মা এসেছে, এখনই যেতে হবে।

ভালুকনান থানার অধীন মালতীপুর গ্রামের প্রজা নরহরি দাসের ছেলে নবীন উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে।

কনেষ্টবল সহ দারোগা যখন অকুস্থলে পেঁছিলেন তখন গ্রামস্থ প্রজা, মোড়ল, চৌকিদার ইত্যাদি কাপড় ঢাকা লাশের চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে। দারোগা প্রথমেই জানতে চাইলেন, গ্রামের গোমস্তা, মণ্ডল এঁরা সব কোথায়। গোমস্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। ডেকে পাঠান হ'লে ও গোমস্তা এলে দারোগা অভিযোগ করেন,—

"গ্রামে খুন, তোমার হাজীর পাওয়া যায় না, এ যে বড় আশ্চর্যের বিষয়।"

গম—আজ্ঞে খুন হোলে অধীনকে থানায়ই হাজীর পেতেন।

কম—তা এটা কি খুন নয়?

মণ্ডল—দারোগা মশাই যা আজ্ঞে কচ্ছেন তা যথার্থ বটে, এ একরকম খুনই বৈকি।

গম—(মণ্ডলকে) গলায় দড়িকে খুন বলে?

কম—খুন কি গলায় দড়ী তা প্রকাশ হবে এখন।

গম—আজ্ঞে হুজুর যখন সরেজমিনে এসেছেন তখন যথার্থ যা তাই প্রকাশ হবে।

কম—কোথায় নরহরি কোথায়।

দারোগার প্রশ্নের জবাবে নরহরি বলে যে দু'বছর ধরে নবীন শূলব্যথায় ভুগছিল। ইদানিং চারদিন থেকে বেদনা খুব বাড়ে, যন্ত্রণায় দিনরাত বাপ'রে মা'রে চীৎকার করতে থাকে। আজ দুপুরে সকলে যখন একটু ঘুমোতে যায় তখন এই কাণ্ডটি ঘটে। নবীন আড়ার বাঁশে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ে, বৌমা এ ঘরে গিয়ে প্রথম দেখতে পায় আর সর্ব্বনাশ হয়েছে বলে চীৎকার করায়

সকলে গিয়ে দেখে নবীন প্রাণশূন্য। এরপরে দারোগার আদেশে চাদর সরিয়ে লাশ দেখানো হয়।

কম—(মৃতদেহ দেখিতে ২) কোথায় হে গমস্তা।

গম—আজ্ঞে করুন।

কম—বড় গলায় দড়ী বোলে যে গোল কচ্ছিলে, কৈ গলায় দড়ীর তো কোন চিহ্নই দেখতে পাইনে।

গম—আজ্ঞে গলায় অমন দাগ রোয়েছে, স্বচক্ষে দেখছেন আর আমি কি বল্‌বো। আর আপনি প্রমাণ নিননা।

কম—প্রমাণ আবার কি নেবো, এ বেশ খুন বোধ হচ্চে।

প্যাঁচে না ফেললে মোটা নজরানার আশা কম, দাপট দেখিয়ে দারোগা নরহরিকে বলেন—"হাঁ শালা তোমার ঐ কাঁদুনিতেই আমি ভুলবো, কোথায় তোর বৌ কোথায়, ডাক সে গুওর বেটিকে।"

গম—আজ্ঞে সে এত লোকের সামনে আসবে! আপনার বাড়ীর ভিতর গিয়ে জবানবন্দী নিলে ভাল হয় না?

কম—সেই হারামজাদীই তো উপপতির যোগে খুন কোরে গলায় দড়ী দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে, তার আবার লজ্জা কি?

মন্ডল—মশাই ও সব আজ্ঞে কোরবেন না।

কম—চোপরাও বাঞ্চৎ, তুমিও শালা ইহির যোগে ছিলে, শালা তোমাকেও বেঁধে নিয়ে যাবো।

গম—এক্ষণে আপনার কি মত বলুন!

কম—বেটিকে আমি থানায় নিয়ে যাবো, কখনই ছাড়বো না, বেটিইতো খুন কোরেছে। (মহাবীর সিংহ কনেষ্টবলের প্রতি) মহাবীর সিংহ দেখিও কৈ না যানে পাওয়ে, লাশ হাসপাতাল মে ভেজনে হোগা।

বিচক্ষণ গোমস্তা দারোগাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে যান। একটু পরে নরহরিরও ডাক পড়ে। পঞ্চাশটি টাকা পকেটস্থ করে ও নবীনের লাশ দাহ করবার হুকুম দিয়ে কমলাকান্ত থানায় ফিরে যান।

ঘটনার কিছুদিন পরে জমাদার বিজয়মাধব ঘোষাল একদিন হুজুরকে জানায় যে মালতীপুরে পাওয়া নজরানার বখরা ভাগে না পেয়ে কনেষ্টবল মহাবীর সিং কি এক মতলব আঁটছে, বলছে যে ওপরওয়ালাকে বেনামী দরখাস্ত দেবে। দুজনে এ প্রসঙ্গ আলোচনার সময় শ্যামনগরের কেশব মাইতি ও তার বিধবা বোন বিলাসবতীকে বেঁধে এনে চৌকিদার ও ফাঁড়ীদার থানায় উপস্থিত,

এদের সঙ্গে শ্যামনগরের প্রজা সনাতন দাস ও তার ছাগলও হাজির। ব্যাপার এই যে সনাতন দাসের ছাগল চুরি করে কেশব মাইতি নিজের বাড়ীতে রেখেছিল। সনাতন গিয়ে খবর দেওয়ায় ফাঁড়ীদার কেশব ও বিলাসবতীকে ছাগল সমেত ধরে এনেছে।

বিজয়—তা ওর ভগ্নীকে আনবার কারণ কি ?

কম—(জনান্তিকে) চুপ করোনা হে, পাগল নাকি! কিছুই বোধাবোধ নেই যে, বেশ কোরেছে এনেছে। (ফাঁড়ীদারের প্রতি) কৈ সনাতন কোথায় ?

দারোগার প্রশ্নের জবাবে সনাতন জানায় যে দড়িবাঁধা তার ছাগল মাঠে চরছিল, খোঁটা উপড়ে ওর ছাগলকে ওরা চুরি করেছে। আড়াই প্রহরে ছাগল বেঁধে এসে তিন প্রহরে তাকে দেখতে না পেয়ে সে ছাগল খুঁজতে থাকে। সেই পথ দিয়ে বৈরাগীর পো যাচ্ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করায় বলে যে কেশব মাইতিকে একটা ছাগল নিয়ে যেতে দেখেছে। সনাতন কেশবের বাড়ীর কাছে এসে আড়াল হতে ছাগল দেখতে পেয়ে ফাঁড়ীদারকে খবর দেয়। ফাঁড়ীদার সবাইকে থানায় চালান দেয়।

দারোগার আদেশে বিলাসবতীকে থানার ভিতরে ও কেশবকে থানার বাইরে পৃথকভাবে কয়েদ করা হয়।

কেশব—ধর্ম্ম অবতার চুরি যদি কোরে থাকি তো আমিই কোরেছি, আমার ভগ্নীকে খালাস দিন না কেন ?

কম—হাঁ হে তোমার বক্তৃতা পরে শোনা যাবে।

কেশ—ধর্ম্ম অবতার আপনি মা বাপ, সবই কত্তে পারেন, তা স্ত্রীলোককে বরং বাইরে রেখে দিন না।

কম—আমি তোমার মাও নই, তোমার বাপও নই, আইনমত কায আমাকে কত্তে হবে।

কেশ—তা হুজুর ওকে বাইরে রাখলে কি আর আইনমত কায হয় না।

দারোগা প্রতাপ দেখিয়ে বলেন, আর বেশি বকলে কেশবকে জুতোপেটা করবেন।

মকদ্দমা তদারক করতে জমাদার বিজয় মাধবকে ঘটনাস্থলে আসামী ও ফরিয়াদি সহ দারোগা পাঠিয়ে দেন। কিন্তু বিলাসবতী থানায় আটক থাকে। কনেষ্টবল লছমন পাঁড়ের ডাক পড়ে। পাঁড়ে এলে হুকুম করেন বিলাসবতীকে উপস্থিত করতে। বিলাসবতী এলে, কোনো এক ছুতোয় লছমনকে তাড়াবার জন্য বলেন, "পাঁড়ে, বাজার মে হামারা বামন গিয়া হায়, আব তক লৌটা নাহি,

উনকো বোলায় লে আও তো।"

লছ—পাহারা ছোড়কে যাঁয় হুজুর ?

কম—কেয়া হরজ হায়, হাম আসামী কো দেখতা হায়।

পাঁড়েজী বিদেয় হলে দারোগা বিলাসবতীর প্রতি নজর দেন, তোমার নাম কি, তোমার দাদা কখন ছাগল চুরি করেছিল ইত্যাদি। বিলাসবতী জানায় যে ছাগলটা তাদের তুঁত ক্ষেতে ঢুকে তুঁত গাছ নিকেশ করছিল, তাই তার দাদা ওটিকে খোয়াড়ে দেবার জন্য ধরে এনেছিল। এমন সময় ফাঁড়ীদার গিয়ে তাদের পাকড়াও করে আনে। দারোগা বলেন যে ওসব মিছে কথা, এক এক বৎসরের মেয়াদে তিনি ওদের চালান করবেন।

বিলা—তা আপনি ধর্ম্ম অবতার, সূক্ষ্ম বিচার করে চালান দেবেন।

কম—পুলিশে সত্যিও মিথ্যে হয়, আর মিথ্যেও সত্যি হয়।

বিলা—তা আপনি সব কত্তে পারেন, খালাসও দিতে পারেন, চালানও দিতে পারেন।

কম—হাঁ তা বটে কিন্তু তার মতন হয় তবে না—।

বিলা—কিসের মতন মোশাই।

ককম—তুমি কি আর বুঝতে পারনি।

বিলা—না মোশাই আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।

কম—ক্যান ভাই আর ছেনালী করো, বুঝেছ বৈকি। আমি কি আর চোখে আঙগুল দিয়ে বুঝিয়ে দেবো। একে তোমার সোমোত্ত বয়েস, তাতে কড়ে রাঁড়, আমার মনের ভাবটা আর বুঝতে পাল্লে না ভাই।

বিলা—(ভয়ে ও লজ্জায়) মোশাই আমি গেরস্ত ঘরের মেয়ে, আমরা খানকী কোশবী নই, আপনি যা ভাবছেন আমি তা নই।

কম—আর ভাই তোমার ছেনালী রেখে দ্যাও, কাল সকালে তোমাকে খালাস দেবো আর তোমার দাদাকেও চালান যেতে হবে না।

বিলা—আপনি মেরেই ফেলুন আর আমাদের চালানই দ্যান আমি ওতে রাজী হবো না।

কম—আর ক্যান ইয়ার, অনেক হয়েছে। (উঠিয়া বিলাসবতীর হস্ত [illegible]রণ)

বিলা—(সরোদনে) আপনি ছেড়ে দিন, আপনি আমার বাপ।

কম—ও সম্বোধনটা প্রথম ২ প্রায়ই হয়ে থাকে, তাতে আর ভয় করিনে ভাই, ছি প্রাণ তুমি বড় অরসিক।

বিলা—(চিৎকার করিয়া) আমি আপনার মেয়ে আপনি আমার বাপ আমাকে ছেড়ে দিন। দারগা মোশাই পায়ে পড়ি।

(বেগে রামেশ্বর ঘোষ জমাদারের প্রবেশ)

রামে—একি মশাই, একি, ছিছি একি কচ্ছেন।

কম—(সভয়ে) না না অপর কিছু নয়, বেটি একরার কচ্ছিলো না তাই হারামজাদীকে ভয় দেখিয়ে একরার করাচ্ছিলাম।

রামে—বুঝিছি মশাই, আব বোল্‌তে হবে না। আসামী হেপাজতে থাকলে মার মত বিবেচনা কত্তে হয়।

কম—তা তুমি বাপু কি ভাব্‌লে, তুমি যে বড় মজার লোক দেখতে পাই।

রামে—আজ্ঞে পথে হেগে চোক রাঙগাবেন না। চীৎকার অনেক লোকে শুনতে পেয়েছে তা জানেন ?

এরপর বিলাসবতীকে নিয়ে রামেশ্বর থানার অন্য ঘরে রেখে আসে।

ভালুকনান থানার অধীন রানপুর গ্রামে এক নৃশংস ডাকাতি হয়। ঘটনাটি হয় গ্রামস্থ ভদ্রব্যক্তি বিশ্বনাথ ঘোষের বাড়ী। ডাকাতেরা গহনা ও অর্থ নিয়ে যাবার আগে বিশ্বনাথ ঘোষের একমাত্র ছেলেকে খুন করে যায়। দারোগা কমলাকান্ত এ ডাকাতির তদন্তে আসেন। অনেক চেষ্টা করেও কোনো সূত্রে কোনো কিনারা করতে পারেন না। শেষে পাইকারী হারে বাড়ী তল্লাসী শুরু হয়। অনেক গৃহস্থ বাড়ী তল্লাস এড়াবার জন্য নজরানা দিতে রাজী হয়। এদের মধ্যে কয়েক ঘর গৃহস্থ স্থানীয় জমিদারের হাতে নজরানার টাকা জমা করে দেয়। জমিদার দারোগাকে সে টাকা দিতে গেলে দেখা গেল কুড়ি টাকা কম পড়েছে। জমিদার জানালেন যে গ্রামস্থ এক ব্রাহ্মণ তল্লাস অব্যাহতির কুড়ি টাকা দারোগার জমাদারের হাতে দিয়েছেন। ক্রুদ্ধ দারোগা আবার সেই ব্রাহ্মণের ঘর তল্লাস করতে চাইলে, জমিদার তাকে নিরস্ত করেন—"সেকি ভাল হয় মশাই, আপনার জমাদারকে শাসন করুন।"

ইতিমধ্যে থানার জমাদার বিজয়মাধব ও কয়েকজন কনেষ্টবল দুই ডাকাতকে বমাল গ্রেপ্তার করে, বাউটি ও একজোড়া তাবিজ পাওয়া যায়। এই দুই ডাকাত ফটিকচাঁদ ও রামহরির বাড়ীর কাছে আমবাগানে লুকিয়ে থেকে জমাদার ও কনেষ্টবলরা লক্ষ্য রাখছিল। দুই ডাকাত বাগানে এসে মাটি খুঁড়ে গহনা ক'খানা বার করে যেই বাইরে এসেছে অমনি বিজয়মাধব ও অন্যান্যরা এসে বমাল এদের গ্রেপ্তার করে। দারোগার নির্দ্দেশে আসামীরা থানায় চালান হয়।

কুসুমপুরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে নির্দ্দিষ্ট দিনে দুই ডাকাত, বাদী বিশ্বনাথ ঘোষ, জমাদার এবং সাক্ষীসহ দারোগা কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় উপস্থিত হন। কাছারীর কেতা অনুসারে সেরেস্তাদার ডাকাতির মামলা পেশ করলে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট মামলাটি বর্ণনা করবার উদ্যোগ করেন। ঠিক এই সময়ে রমনপুরের ১৫ জন প্রজা বেগে কাছারীতে প্রবেশ করে। তাদের মিলিত অভিযোগ যে রমনপুরে বিশ্বনাথ ঘোষের বাড়ী ডাকাতি হ'লে, দারোগা কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় মিছিমিছি তাদের বাড়ী খানাতল্লাসী করেন ও চোরাই-মাল না পেয়ে থানায় চালান দেবেন বলে ভয় দেখিয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে দশ টাকা, কুড়ি টাকা করে নজরানা গ্রহণ করেছেন। এখন কাছারীর ধর্ম্মাবতার যদি এর একটা বিহিত করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট কমলাকান্তকে বলেন যে ১৫ জন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ায় একটা ব্যবস্থা করতে হয়। এ ব্যাপারে কমলাকান্তের কি বলবার আছে। কমলাকান্ত জানান যে তিনি কিছুই জানেন না। বিচারে ম্যাজিষ্ট্রেট কমলাকান্তের প্রতি দুবছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

আইন সংযুক্ত

কাদম্বিনী নাটক।

প্রথম খণ্ড।

সদর আমীন মুন্সেফ আদালতের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত উকীল

শ্রীযুক্ত কুশদেব পাল কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

কলিকাতা।

শীলএণ্ড ব্রাদার্স যন্ত্রে যন্ত্রিত।

১২৬৯ সাল।

আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক

[বাঙ্গালী কি মামলাবাজ ? এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়। জমির লড়াই, লুঠতরাজ, হাঙ্গামা, নরহত্যা, ধর্ষণ ভারতের কোন্ প্রদেশে না হয়েছে ? যেখানে নিয়ম ও আইনের বিরুদ্ধাচার, সেখানেই থানাপুলিশ কোর্টের শাসন। আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কোর্ট কাছারী কি ব্যবস্থা নেয়, কী পন্থায় কোর্টের কাজ এগোতে থাকে তা হরিপদ কেরাণীদের জানবার কথা নয়। গত শতাব্দীতে শ্রীকুশদেব পাল এক প্রহসনের অবতারণা করে তখনকার দেওয়ানী, ফৌজদারী ও কালেক্টরী আদালতের ছবি সর্ব্বসাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন। লেখক স্বয়ং সদর আমীন মুন্সেফ আদালতের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত উকীল। পেশাগত অভিজ্ঞতা থেকে কলম চালিয়েছেন বলে নাটকটি বাস্তবানুগ হয়েছে। দুখণ্ডে সম্পূর্ণ এই নাটকে বলবার সরস ভঙ্গীটুকু লক্ষ্যণীয়। নাটকের শেষ পর্য্যায়ে প্রথম খণ্ডের শেষে ১৮৫৯-১৮৬১ সালের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের এবং দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তে ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্য্যন্ত দেওয়ানী, ফৌজদারী ও কালেক্টরী আইনের বিভিন্ন ধারার সার সংকলন করে লেখক গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করেছেন।]

ভোরবেলা গৃহিণীর চেঁচামেচিতে গদাধর সেনের ঘুম ভাঙে। কি ব্যাপার ? না, গদাধরের কন্যা কাদম্বিনী গতকাল সেই যে পাড়া বেড়াতে বের হয়েছে, আজ এত বেলাতেও এখনও ঘরে ফেরেনি। কর্ত্তার অবাক হওয়ার পালা। তিনি এসব কি করে জানবেন ?

গৃহিণী—তুমি জানবে কেন, মনে করে দেখ দেখি কতদিন বলেছি যে কাদী হোতে কোন্ দিন কি হয় বলা যায় না।

গদাধর—ও আমার কপাল! তাতে আমি কি বুঝব, তবে সে কথায় এই ভাবতাম, মেয়েটা আগুনের মতো হয়ে উঠছে, কোন্ দিন কি হয় বলা যায় না, এখন তার হয়েছে কি ?

গিন্নী জানান যে কাদম্বিনী নিত্য দশটা এগারোটার সময় যায় আর তিনটে চারটেয় বাড়ী ফেরে। এতক্ষণেও যখন ফেরেনি তখন বুঝি ঐ বাড়ুয্যেদের ছেলের সঙ্গে সরে পড়েছে। গদাধর একথায় আমল দেন না, কাদম্বিনী তো আর অবুঝ নয়। সে কি কুলে কালি দেবে ?

গৃহিণী—তার আশ্চর্য্য কি ? মেয়ে মানুষের মন, তায় মন না মতি, আর সকল সময় কি সেই জ্ঞান থাকে।

গদাধর—(কিঞ্চিৎ রাগ প্রকাশ করিয়া) তুমি যেমন গিন্নিটি তেম্নি তোমার

কন্যাটি, "রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট গিন্নির দোষে সংসার নষ্ট।"

গৃহিণী—আমার দোষ কি, আমি কি করব, আমি কি তারে বেঁধে রাখ্‌বো, না ছেঁদে রাখ্‌বো।

কর্ত্তা জানান যে বেঁধে ছেঁদে রাখতে হয় না, মেয়ের মন্দ চাল দেখলে ধমকাতে হয়। শাসনে রাখলে কি আর মেয়ে মন্দ হতে পারে, না, ঘরের বার হতে পারে, 'বিশেষ স্থানং নাস্তি ক্ষণং নাস্তি'।

গৃহিণী—তোমার যেমন কথায় কথায় শ্লোক, এখনকার মেয়ে ধমক ধামক মানে না, এক বোল্‌তে শতেক বলে, হেদ্দেখ তাও বলি, আমার কাদীরে মন্দ বলতে পারিনে, মন্দ কল্লে ত তারে শামী নাপ্তিনী।

গদাধর— কেন শামীর অপরাধ কি? কথন্ ধরে বেঁধে পিরীত আর মেজে ঘোষে রূপ।

গৃহিণী জানান যে ঐ শামী নাপ্তিনীই যত নষ্টের গোড়া। প্রথমে এবাড়ীতে বেড়াতে এসে কাদম্বিনীর সঙ্গে 'বেগুন-ফুল' সই পাতালে। তারপরে ঘন ঘন আসা যাওয়া, খাওয়া আর দেওয়া থোওয়া চলল কিছুদিন। এভাবে বাইরের টানে কাদম্বিনীর মন এখন বহির্মুখী।

খানিকক্ষণ পরে আবিষ্কার হয় শাড়ী ছেঁড়া আলুথালু অবস্থায় কাদম্বিনী বাড়ীর ভেতরে বারান্দায় পড়ে আছে। ব্যাপার কী?

কাদ—মা গো! আমি ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ঘোষালদের গলি দিয়ে যেই মুখুয্যেদের বাগানের কাছে এসেছি, কোথা ছিল সেই সর্ব্বনেশে গোপালে, ঈশ্‌নে, কৈলিশে আমার মুখে কাপড় দে বেঁধে, যা না করবার তাতো কল্লে গো মা।

গৃ—তাতে তোর কাপড় ছেঁড়া কেন, গায় ধুলো কাদা মাখাই বা কেন, আবার মার ধোর করেছে নাকি, তুই চেঁচাতে পারিসনি?

কাদ—চেঁচাব কি, পোড়াকপালেরা বলে, চেঁচাবি ত গলায় ছুরি দে মেরে ফেলাব, তাও যা হোক্, যাবার সময় টাকা দিতে চেয়েছিলি, টাকা দিলিনে বলে যেই ঈশ্‌নের কোঁচা ধরিচি সেই অম্নি তিন সর্ব্ব-নেশে আমার মুখ কোসে বেঁধে চুলে ধোরে, কত যে মার মাল্লে, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম, কতক্ষণের পর হুস হোলে আস্তে ২ খিড়কী দে এসেছি, মা গো নড়তে পারিনে।

সর্ব্বনাশী মেয়ের তো এই অবস্থা, এখন উপায়? কর্ত্তা মনে করেন লোক জানাজানি হওয়া চলবেনা, এক্ষেত্রে কীল খেয়ে কীল চুরি কর্ত্তে হবে।

গৃহিণী—কি বল্লে, এর একটা কিছু না কোরে, চুপ কোরে থাকলে ও ডেকরাদের দৌরাত্ম্যে কি দেশে থাক্তে পারবে না বসত কোর্ত্তে পারবে ?

গদা—কেন ওরা কি এ দেশের ফৌজদার হয়েছে নাকি, না নবাব সেরাজদ্দৌলা হয়েছে ?

গিন্নী জানান যে দেশের যা হাল হয়েছে ও দুষ্টদের জ্বালায় স্বস্তি আছে ? এই তো সেদিন সদানন্দের ভাইঝিকে নিয়ে গিয়ে কি কেলেঙ্কারী করলে। ঠিক এমন সময়ে সদানন্দ এদের বাড়ী এসে হাজির হন। সদানন্দ ঘুঘু ব্যক্তি। গদাধরের বাড়ী সন্দেহজনক কিছু আঁচ করে সেখানে জমিয়ে বসেন। নিজের ভাইঝির ব্যাপারে গোপাল-ঈশানদের সাতঘাটের জল একঘাটে খাওয়াতে পারেননি, আইনে তেমন সুবিধে হয়নি বলে। কিন্তু এবার ? ডেকরারা তো জানেনা নূতন দণ্ডবিধির আইনের কথা। সদানন্দের পরামর্শে কাদম্বিনী দুশমনদের নামে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে রাজী হয়, তার জন্য দেড় ক্রোশ পথ তাকে, যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় সদানন্দের সঙ্গে যেতে হবে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে দেখাতে হবে। গদাধর একবার আপত্তি তোলেন—

"তদ্দুর করা কি ভাল হে ? লোকেই বা কি বলবে ? এর পর মুখ তোলা কি যাবে, না কথা কওয়া যাবে ?

সদা—কি হে ভয় কি ? লজ্জাই বা কি ? কোন ঘরে কি না আছে, আর কি না হয়েছে, ওই যে বড়-বাড়ীর কথা (এখন যেন বেদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী) উনি আগে কি ছিলেন তা কি আর জান না, না শোন নাই, হেদে সেদিন ওদের বাড়ীর মধ্যে কি কান্ডটা না হোল তাও ত জান ? তুমি বসে থাক তোমার কিছুই দায় ঠেক্‌তে হবে না, তবে দু-পাঁচ টাকা খরচ তাও কাদী দেবে বোলেছে।

ফৌজদারী আদালতে পৌঁছে কাদম্বিনীকে গাছ তলায় বসিয়ে রেখে সদানন্দ দরখাস্ত লিখতে চলে যান। দুই মোক্তার দেবীদাস ও হরিদাস গাছতলায় একা কাদম্বিনীকে দেখে উৎসুক হয়ে ওঠেন।

হরিদাস—হেঁ গা বাছা ! ওগো ! গেরস্তের মেয়ে ? এখানে বোসে কেন গা ? কোন নালিশ আছে নাকি ? বলনা বেশ করে দরখাস্ত লিখে দেব এখন।

কাদম্বিনী মাথার কাপড় আরও একটু ভালো করে টেনে দেয়।

দেবীদাস—উনি বুঝি নরলোকের সঙ্গে কথা কন্ না, তা হোলে কৈতেন, কিম্বা বুঝি কেউ বারণ কোরেছে।

হরিদাস—আমাদের সঙ্গে কথা না কৈলেন ! না কৈলেন ! এখনি গৌরাঙ্গের সঙ্গে

কথা হোলেই চাপা থাকবে না।

মোক্তাররা বিদেয় হোলে, চাপরাসি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চেঁচায়—"দরখাস্ত দরখাস্ত দরখাস্ত' ? সদানন্দ দ্রুতগতি এসে কাদম্বিনীকে নিয়ে ভেতরে চলে যান। ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে তাকে দরখাস্ত দিতে হবে।

কোর্টের মুন্সি প্রতিবাদী ও সাক্ষীদের নাম সম্বলিত যে দীর্ঘ দরখাস্ত, বাদিনী কাদম্বিনীর তরফ থেকে পাঠ করে, তাতে আইনের কায়দায় ঘটনা পরম্পরাকে সাজানো হয়েছে। সব শুনে ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম দিলেন—অমুক দিনে সাক্ষী আর প্রতিবাদীদের কোর্টে উপস্থিত হোতে শমন জারী হোক।

পবন পেয়াদা শমন নিয়ে প্রতিবাদীদের বাড়ী উপস্থিত হয়।

পেয়াদা—তোম্‌গার নামে মুই শমন নেইছি, নে রসিদ দাও।

প্রতিবাদীগণ—কিসের শমন ? তুমি কোথাকার পেয়াদা সাহেব ?

পেয়াদা—মুই মেজেষ্টর সাহেবের পেয়দা কিসির শমন নে পোড়ে দেখ ট্যার পাবা ?

প্রতিবাদীগণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রসিদ দেয়। নাঃ, সেদিনের কাজটা ভালো হয় নাই ; একটু যেন বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, এখন কপাল ঠুকে কাছারী তো যাওয়া যাক, যা হবার তা হবে।

নির্দিষ্ট দিনে ফৌজদারী আদালতে বাদী, প্রতিবাদী, সাক্ষী ও সকলে উপস্থিত। ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে মুন্সি প্রথমে বাদিনীর এজাহার পড়ে শোনায় ; তারপরে বাদিনীকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হ'ল।

সওয়াল—তোমার এজাহার কি ?

জওয়াব—আজ দিন দশ বার হইল নিশীথ সময়ে ডেক্‌রা প্রতিবাদীরা আমায় নে যে কাণ্ডটা কোল্লে তা বোলব কি বল্‌তে কান্না পায়।

বাদিনী তার দীর্ঘ অভিযোগ শেষ করলে সাক্ষীদের একে একে তলব হল। প্রথম সাক্ষী অন্ধকার চৌধুরী, পিতার নাম নিবিড়ান্ধকার, নিবাস ঘোরান্ধকার-পুর, বয়সের সংখ্যা নাই, পেশা আলোনাশা ইত্যাদি ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা করিলেক। প্রথম সাক্ষী জানায় যে যদিও সন্ধ্যে না হতেই সে আলোর মাথা খেয়ে বসে আছে, কিন্তু দণ্ডের মধ্যে আহা সোনার বাছারে ওরা লণ্ড ভণ্ড করে ফেললে, ক্ষীণদৃষ্টি সাক্ষী শব্দ শুনেই স্তব্ধ হয়ে থাকল। দ্বিতীয় সাক্ষী উদ্যান ভট্টাচার্য্য জানায় যে ওদের লম্ফ দম্ফ দেখে ভয়ে কম্পমান হৃদয়ে ধরাসনে চেপ্টা হয়ে মাটি হয়ে থাকলাম। তৃতীয় সাক্ষী জোনাক চৌকিদার। সে জানায়—

"আমি মশায় সারারাৎ ফিরিয়া ফিরিয়া যেই ঘোষালদের বাগানে এসেছি, সেই যেমন বাঘে গরু ধরে, অমনি ধরে ফুস ফাস কোত্তে২ চট্‌পটু শব্দ শুন্‌তে

পেলেম, ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া ভাব্‌লাম বুঝি মল্লযুদ্ধ হয়, তারপর দেখি না যে, মদেমত্ত তিন ষন্ডা ঘন্টা ঘন্টা অবলা সরলা কুলবালা নিতম্বিনী কাদাম্বিনীর কটিতটে ধটি আঁটিয়া, নানা আঘাতের সহিত সুখ-যন্ত্রণা দিতেছে ; আরো কত হাঁই ফাঁই করিতেছে।”

এবার প্রতিবাদীদের পালা, প্রতিবাদীরা জানায়, আমরা দোষী হ'তে পারিনা কারণ আগে বাদিনী আমাদের কটাক্ষের শরাঘাতে আহত করে। আমরা সে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কিঞ্চিৎ শাস্তি বিধান করেছি।

প্রতিবাদীদের সাক্ষীরা বলে, আমরা প্রতিবাদীদের কোন দোষ দেখিনা, কারণ যুবতী বাদিনীর রকম সকম দেখলে মুনিঋষিও ক্ষেপে ওঠে ত' অন্যে কা কথা।

কেস ডিসমিস হয়ে যায়। তবে ম্যাজিস্ট্রেট বিধান দেন যেহেতু কন্যার সোনার অংগ ধুলায় লুণ্ঠিত হয়েছিল, সেজন্য প্রতিবাদীদের প্রতি বাদিনীর ২৫ চরণদন্ড দেওয়া হোক।

কার্দম্বিনীর গাত্রদাহ যায় না, সদানন্দকে ডেকে বলে, “হেঁগা মামা, সর্ব্ব-নেশেদের কি হলো ? ওদের ত কিছুই হয় নাই, আরো হেসে খেলে গেল।”

সদানন্দ স্থির করেন ওদের ভিটেয় ঘুঘু চরাতে হলে এবার দেওয়ানীতে নালিশ করতে হবে। সদর আমীন আদালতে ১০০০ হোরমত বাহা [মানহানির ক্ষতিপূরণ] দাবী করতে হলে প্রায় একশ-সওয়া'শ টাকা খরচ করতে হবে। এক্ষেত্রে কার্দম্বিনীকে আদালতে যেতে হবে না, বাড়ী বসে দস্তখত দিলে বাকী কাজ সদানন্দ করে দিতে পারবেন।

জেলার দেওয়ানী আদালতে হোরমত বাহার দাবীতে মামলা রুজু হয়। ফরিয়াদীর উকীল ও সদানন্দ মিলে লিখিত নালিশ জমা দিলে যথাসময়ে প্রতিবাদীদের নির্দ্দিষ্ট দিনে বিচারের সময় উপস্থিত থাকবার মর্মে শমন যায়। চৌকিদার সেই শমন প্রতিবাদীদের বাড়ীর দরজায় দরজায় লটকে আসে। গোপালের পিসি সিদ্ধেশ্বরী জিজ্ঞেস করেন, “হেঁরে গোপাল, একজন পেয়াদা একখানা ছাপমারা লেখা কাগজ সদর দরজার উপর টান্‌য়ে দিয়ে গেছে, আমাদের রাজেন্দ্র পোড়ে দেখেছে, তাতে সেনেরদের কাদীর নাম আর তোর নাম আছে, সে কিরে জানিস ?”

গোপাল—পিসি আমি ত কিছু শুনিনি গা ! দেখে আসি।

গোপাল, ঈশান ও কৈলাশ ভাবে এখন উপায়, এযে দেখি বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। যদি কোর্টে হার হয়ে হন্দমুদ্দ ডিক্রী জারী হয় আর টাকা নাই বললে যদি

বাড়ী ঘর ক্রোক হয় তখন প্রতিবাদীদের বাপেদের পক্ষ থেকে 'মোজাহেম' বা বিপক্ষ আবেদন করলেই হবে। আর যদি নেহাৎ কয়েদ করে তখন কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত শ্রীঘর বাস। তবে লোকের কাছে মুখ দেখানো যাবে না।

ঈশান—ভাই লোকে এওত বোলবে যে, ছোঁড়ারা সেনেদের বাড়ীর মৌচাক ভেঙেগ মধু খেয়ে জেলখানায় কয়েদ হয়েছে।

নির্দিষ্ট দিনে প্রতিবাদীরা আদালতে নিম্নরূপ বর্ণনাপত্র দেয়—

শ্রীগোপালচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, কৈলাশচন্দ্র—

আমারদিগের বর্ণনা এই যে আমরা বাদিনীর দাবির দায়িক হইতে পারি না, কেন না, বাদিনী আপনার হোরমত আপনিই নষ্ট করিয়াছে, কারণ যদি বাদিনী দশ হাত বস্ত্র পরিধান করিয়া আমাদের পাড়ায় আমারদের সম্মুখ দিয়া আড়-নয়নে চেয়ে শামী নাপ্তিনীর বাড়ী না যেত তবে কেন আমাদের এমত বিপদ ঘট্‌বে। ইহার বিশ্বাস্য-প্রমাণ যত যুবা পুরুষ আছে আমরা এখনি দর্শাইতে পারি, বিচারে যদি দায়িক হতে হয় তবে মদ্‌না বেটাকেও দায়িক করিতে হয় নিবেদন ইতি।

আমরা জানাইতেছি, বর্ণনাপত্রে যে কথা লেখা হইল তাহা মদনের ঘায় জ্ঞান ও হতজ্ঞানে সত্য।

শ্রী গোপাল চন্দ্র
শ্রী ঈশান চন্দ্র
শ্রী কৈলাশ চন্দ্র

হাকিম এবার বাদিনীর উকীলকে বলেন তার মক্কেলের দাবি ও প্রমাণ ব্যক্ত করতে। উকীল বলেন,

"আমার মোক্কেল বাদিনী অবলা-সরলা-কুলবালা-কুলাঙ্গনা—কিন্তু পতিহীনা, দুঃশীল প্রতিবাদীগণ তিনজনে নির্জ্জনে—গোপনে—উদ্যানে—ধরাসনে—দণ্ডবাণে—হতজ্ঞানে—হতমানে ফেলিয়া যাওয়ায় তজ্জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ ও ফৌজদারীর নজীর দর্শান হইয়াছে, সুবিচারে দাবি দেলাইতে হয়।'

হাকিমের নির্দ্দেশে এবার প্রতিবাদীদের উকীল শুরু করেন, "—উহারা ভদ্রলোকের ছেলে, ভদ্র আচরণই করেছে, কেননা বাদিনীর শরাঘাতে যখন সুধীর প্রতিবাদীগণ তৎক্ষণাৎ বাদিনীকে কিছু বলে নাই তখন কাযেই দাবির দায়িক নহে, তবে যদি চুপা-ঘায় ঘায়ে ঘা দেওয়া উচিৎ হয় নাই বটে, কিন্তু কি করে? অসহ্য যন্ত্রণা পুরুষ বেটাছেলে সহ্য করিতে না পারিয়া অধৈর্য্য হইয়াই মদন-পুরে শরাঘাৎ করিয়াছে এই সামান্য অপরাধে অপরাধী হইতে পারে না।"

আদালতে নথীর সমস্ত কাগজপত্র দেখার পর মোকদ্দমা বাদিনীর পক্ষে ডিক্রী হয়। প্রতিবাদীরাও চুপ করে থাকে না। ১০০০ টাকা হোরমত বাহার বিরুদ্ধে আপীল করে। আপীলের বিচারের রায় কিন্তু প্রতিবাদীদের অনুকূলে যায় না, কারণ দেওয়ানী আদালতের রায় কেন অন্যথা হবে তার সপক্ষে প্রতিবাদীরা যথেষ্ট কারণ দর্শাতে পারেনি।

দায়ীকানের সম্পত্তি ক্রোক ও নীলামের জন্য এবারে এক পরওয়ানা জারী হয়। সম্পত্তি ক্রোকের নোটিশ পেয়ে তিন সুপুত্রের তিন বাপ সম্পত্তিতে নিজেদের অধিকার ব্যক্ত করে জানায়—

"—আমারদিগের পুত্রেরা কোন বিষয়ে দায়িক হইলে তজ্জন্য আমারদিগের সম্পত্তি ক্রোক নীলাম হইতে পারে না, তাহারদিগের বাটিতে আহারাদি ভিন্ন টিকী দেক্তে পাই না, কেবল ষণ্ডামী ভাণ্ডামী করিয়া কালযাপন করে, সুতরাং এক্ষণে ক্রোকী সম্পত্তিতে দায়ীকানের কোন স্বত্ব না বর্ত্তিবায়, নীলাম মহকুপের ও খালাসের যোগ্য নিবেদন।"

ক্রোকের বিরুদ্ধে এই আবেদনে ১০ দিন সময় পাওয়া যায়, ঠিক হয় এখনই সম্পত্তি ক্রোক হবে না, তবে দশদিন পরে ঐ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণে নতুন করে বিচার হবে।

কাদম্বিনীর উষ্মা কিছুতেই যায় না—"কৈ গা মামা! কি হোল? কিছুই ত কোর্ত্তে পাল্লে না?"

সদানন্দ—আর বাছা! বেশ কুশিয়ে এনেছিলাম, বেটাদের বাবারা মোজাহেম দে ফেরে ফেলেছে।

কাদ—এখন তার উপায় কি কিছু স্থির কোর্ত্তে পেরেছ?

সদা—উপায় আর কি, ১০ দিন বিলম্ব হবে এই মাত্র কিন্তু নীলাম আটক কোর্ত্তে পারবে না।

কাদ—কেন ওদের জন্যে কি তাঁদের জায়দাদ নীলাম হোতে পারবে?

সদা—বাছা, আমি জেনেছি আইন আছে দায়িকের যে স্বত্ব থাকে তাই নীলাম হয়, এখন সেই ২ বাটিতে ত বেটাদের খাওয়া-পরার স্বত্ব আছে। তাই নীলাম হলেই সে বেটারা জব্দ হবে আর দেশ ছেড়ে যাবে।

কাদ—মামা! বেটাদের কয়েদ করে জেলে পচাতে পার না গা?

আইনজ্ঞ মামা এবার মাথা ঘামান, আইনের কোন্ ফাঁকে তিন ষণ্ডাকে শ্রীঘরে পাঠান যায়। ফৌজদারী ও দেওয়ানীতে কোনোভাবেই সুবিধে হল না। [শ্লীলতাহানির মামলা কালেক্টরী অফিসে হয় না, কিন্তু লেখকের

উদ্দেশ্য এই প্রহসনের মাধ্যমে তখনকার কালেক্টরী অফিসের আইন কানুন পাঠক সমাজে বিবৃত করা, তাই এই অংশে কিছু রূপকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।] সদানন্দের পরামর্শে কাদম্বিনী কালেক্টরীতে আর্জি দাখিল করে—

"নিবেদন, সেনপাড়া পরগণার যুবতী-পুর মৌজার ত্রিকোণ ভূমি কৃষিকার প্রতিবাদীগণ নিজ ২ হলের দ্বারা কর্ষণ করিয়া কর না দিয়া ফেরার হওয়ায় উচিৎ কর ৩০০০ হাজার টাকা পাইবার প্রার্থনা।"

রীতিমত শমন জারী করে প্রতিবাদীদের কালেক্টরীতে আনা হয়। প্রতি-পক্ষের বক্তব্য, "আমারদিগের প্রতি বাদিনী করের দাবি করা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে, কেননা যদিচ ভূমি কর্ষণ করা হইয়াছিল মাত্র বটে, কিন্তু যখন তাহাতে প্রণয়রূপ শস্য উৎপাদন হয় নাই তখন কাযেই আমরা করের দায়িক হইতে পারিনা প্রণিধানে সুবিচার আজ্ঞা হয়।"

কালেক্টরী রায় দেয়,"—ভূমিতে শস্যোৎপাদন হউক বা না হউক ভূমি কর্ষণ করিলেই কৃষিকারককে করের দায়িক হইতে হইবেক সন্দেহ নাই এমতে,

হুকুম হইল যে,

দাবি মায় খরচা বাদিনীর পক্ষ ডিক্রী হয়।"

প্রতিবাদীদের নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী হ'ল।

প্রতিবাদীগণ রঞ্জুরূপ কুহুম্বর ইত্যাদির সন্ধান পাইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত। কোথা ছিল পবন-পেয়াদা, অন্দরমহল পর্য্যন্ত গমন করিয়া ধৃত ও বন্ধন করিয়া লইয়া গমন করিল।

প্রতিবাদীগণ—(পথে রোদন করিতে ২ যাইতে ২) পেয়াদা ভাইরে! তোদের পায়ে ধরি এত কোসে বাঁধিস্ নে, মাঝে মাঝে একটু আল্‌গা দেরে ভাই।

পেয়াদা—আমাদের খুসি কর্‌বি ত কর, নৈলে এখন হয়েছে কি? এরপর ভূগোল দেখ্‌তে পাবি?

প্রতি—(উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে) বাবারে। এর উপর আবার ভূগোল আছে, তোদের পায়ে ধরিরে। এমন কর্ম্ম আর কর্‌বো না, তোরা ধর্ম্মের বাপ!

পেয়া—ওরে বেটারা ধর্ম্মের বাপ কিরে, আমাদের পাওনা গণ্ডা না দিলে ধর্ম্মের বোনাই বল্লে ছাড়্‌বো না।

প্রতি—আমাদের মেরে ফেল কিন্তু আমারদের কিছুই দেবার শক্তি নেই।

পেয়া—তোরা বেটারদের এখনি এই দশা এরপর জেলখানায় ঠেস্‌রে পল্লে কি হবে বলা যায় না।

প্রতি—ও বাবা ! জেলখানায় আবার ঠেলা কি ?

পেয়া—জান না ? প্রথম সেলামির ঠেলা, তারপর যে সকল ঠেলা তা ঠেলা পড়লেই টের পাবে।

অতঃপর প্রতিবাদীগণ নারীগঞ্জের যুবতী জেলখানায় উত্তীর্ণ হইয়া মদন কারাগারে আবদ্ধ।

প্রতিবাদীরা কয়েদখানায় কায়ক্লেশে মনোদুঃখে কিছুদিন কাটায়। ছন্দাকারে তাদের দুর্দশা নিম্নরূপ—

"জেলখানা	কি লাঞ্ছনা	দুঃখ কব কায় রে।
দিন দিন	তনুক্ষীণ	শুকাইল কায় রে॥
অহরহ	যেন দেহে	গরল মাথায় রে।
নাহি সুখ	কিবা দুঃখ	ডাঁশ মশা খায় রে॥
তীক্ষ্ন হেন	লাগে যেন	পিক যাহা গায় রে।
কোন ছলে	মনে হলে	জ্বর এসে গায় রে॥
গতি নাই	দুঃখ পাই	ঘা দিয়ে সে যায় রে।
হয়ে পাজি	যাত্রা বুঝি	করেছি মবায় রে॥
...	...	...
...	...	...
থেকে জেল	মারি শেল	দুঃশীল চক্ষায় রে।
এবে আশ	দেহ নাশ	করিব ভিক্ষায় রে॥
অতএব	কুশদেব	বলে হায় হায় রে।
হরি হরি	গড় করি	রমণীর পায় রে" ॥

আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক (২)

[আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটকের দ্বিতীয় খণ্ডে কাদম্বিনী আবার আইনের ফ্যাসাদে জড়িত হয়ে পড়ে। যদিও এ তার অনেকটা ইচ্ছাকৃত। বিধবার ব্যর্থ যৌবন কি মর্মন্তুদ পরিণতি ডেকে আনতে পারে তার ভূরি ভূরি নজীর বাংলাসাহিত্যে আছে।]

গ্রাম সম্পর্কে মাতুল সদানন্দের মাতৃশ্রাদ্ধে নানা মানুষের কাজের বাড়ীতে আনাগোনা। ক্রিয়াকর্ম দেখাশোনার আহ্বান পেয়ে রমণীমোহন দূর গ্রাম থেকে এসেছেন। গ্রামসুবাদে তিনি সকলের ঠাকুরদাদা, যদিও বয়সে প্রবীণ নন। সদানন্দের বাড়ীতে কাদম্বিনীকে দেখতে পেয়ে রমণীমোহন প্রথমে আকৃষ্ট, পরে মুগ্ধ, শেষে প্রণয়াবিষ্ট হন।

আর কাদম্বিনী চটুল চাহনি, চটুল কথায় রমণীমোহনের চিত্ত জয় করে, মন দেওয়া নেওয়ার মারাত্মক খেলায় মেতে ওঠে।

কেযোবাড়ী কাযে ব্যস্ত, রমণীমোহন।
কিন্তু মন সুস্থ নহে, সদা উচ্চাটন ॥
এইমাত্র মধ্যে মধ্যে কটাক্ষ সন্ধান।
থেকে থেকে উভয়ের চমকে উঠে প্রাণ ॥

ছোটো ভাই আট বছরের শশীকে কার্দাম্বনী পাঠিয়ে দেয় রমণীমোহনকে ডেকে আনতে, এ বাড়ীতে বৈকালিক জলযোগ সেরে নিতে। রমণীমোহনও তাই চান। গোল বাধায় শশী। রমণীমোহনকে খাবার সাজিয়ে দেওয়া হলে, বেয়াড়া ছেলে কিছুতেই বাইরে যাবে না, তার ভাগের খাবার নিয়ে সেইখানে বসে খাবে।— "ইঃ আমি বুঝি এই ছোট রিকাবি নিয়ে যাব।"

উভয়ের মনে মনে, হলো যে যাতনা।
দেবতা জানেন আর, জানে দুই জনা ॥
মনকথা এ সময়, না হইল যদি।
এমন ঘটনা কি আর, ঘটাবেন বিধি ॥

সদানন্দের বাড়ীতে আরও কয়েকবার দুজনের দেখা সাক্ষাৎ হল, কিন্তু অত লোকের মধ্যে মনের ভাব ভাষায় ব্যক্ত করা গেল না, কেবল দু'একটা হাল্কা রসিকতা ছাড়া। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে রমণীমোহন অস্থির মন নিয়ে নিজের

কর্ম্মস্থল যুবকনগরে ফিরে যান। কিছুদিন পরে নানা দেনা ও হিসাব নিকাশে বিব্রত সদানন্দ আবার রমণীমোহনকে ডেকে পাঠান। রমণীমোহন এলে, কাদম্বিনী কোন অছিলায় সদানন্দের বাড়ী আসে। এখন আর লোকের ভীড় নেই। নির্জ্জনে পেয়ে দুজনের মধ্যে আলাপ শুরু হয়।

কাদ—ঠাকুরদাদা মহাশয় ভাল আছেন?

র—আর ভাই তুমি কি ভাল রেখেছ, মারা যাই যে তার কি?

কাদ—কেন ঠাকুরদাদা আমি কি কল্লোম, মারা যাই যে বল্লে যে, কিছু বেয়ারাম হয়েছে নাকি?

র—তুমি বুঝি কিছু জান্তে পাচ্ছ না, না বুঝতে পাচ্ছ না।

কাদ—কেন ঠাকুরদাদা আমি কি জানতে পারব আর কিই বা বুঝতে পারব।

র—এখন ঠাট ছাড়, আসল কথার কি বল, আমাকে দিয়ে ব্যক্ত করাবে তা বুঝেছি।

কাদ—কেন ঠাকুরদাদা তুমি কি বলছ আমি ত কিছু বুঝতে পারিনে, আসল কথা আবার কি?

র—(স্বগতঃ "দেবা ন জানামি কুতঃ মনুষ্যাং") প্রকাশ করিয়া, আসল কথা এই ভাই একবার নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হবার কি?

কাদ—নির্জ্জন কেন ঠাকুরদাদা এই কোন নির্জ্জন নয়, কি বল্‌বে কেন বলনা।

র—এখন ঠাট ছাড় না, চালাকি ছাড় না, সরল হয়ে কথা কও না, আর কি খুলে বলতে হবে, যেন খুকী হলে যে।

কাদ—তা বুঝেছি, এখন ঠাকুরদাদা তোমার এতদূর মতলব, সে ভাই কেমন করে হবে, সে কথা আমায় বল না, সে কর্ম্ম সুখ্যাতির কর্ম্ম নয়, কি বলেই বা মনস্থ হল তা ভাই আমা হতে হবে না।

র—ও সর্ব্বনাশ! কি হে তুমি ত অনাসে গাছে তুলে আছাড় মারতে পার।

এরপর রমণীমোহন নানা বাক্যবিন্যাসে কাদম্বিনীকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেন।

—কি ভাই তোমাকে আর কি বলব, শুধু দেখাশুনা আলাপে কতদিন থাকা যায়, বিশেষ যে কথা বল্লে তা কোন ঘরে কি না আছে।

কাদ—তা ভাই সকল ঘরে সকল আছে বলেই কি কর্ত্তে হবে। তা ভাই হবে না সে আশা ছাড়, দেখে শুনে যে ভয় হয়।

রমণীমোহন তখনকার মতো ব্যর্থ হন, কিন্তু কিছুদিন পরে এক গভীর

রাতে, বাড়ী থেকে দেড় ক্রোশ পথ হেঁটে এসে কাদম্বিনীর বাড়ীতে নিঃশব্দে ঢেঁকিশালে এসে ঢোকেন। হাতের কাছে একটা পিঁড়ি পেয়ে তাই ঠুকে কয়েকবার শব্দ করেন! শব্দ শুনে রাতে কাদের গরু বুঝি ধান খেয়ে যাচ্ছে ভেবে কাদম্বিনী বাইরে আসতেই রমণীমোহন সামনে এসে কাদম্বিনীর হাত ধরেন।

এর পরের ঘটনা প্রাকৃতিক বিধানে দ্রুতলয়ে চলে। প্রথমে দু একবার আপত্তি করেও কাদম্বিনী রমণীমোহনকে ঢেঁকিশালে অপেক্ষা করতে বলে চলে যায়, মা ও শশী ঘুমোলে আসবে।

> অতঃপর রমণীমোহন কাদম্বিনী।
> তিনঘণ্টা কাটাইল, প্রমোদে রজনী॥
> উভয়ের মনস্কাম সম্পূর্ণ হইল।
> উভয় বিচ্ছেদহেতু ভাবিতে লাগিল॥
> বিলম্বেতে লজ্জা ভয়, চঞ্চল হইল।
> মনে রেখ বলি দোঁহে, প্রস্থান করিল॥

কাদম্বিনী—রমণীমোহনের গোপন প্রণয় বেশ কিছুদিন চলে। প্রথম দিকে প্রতি পাঁচ কি দশ দিন অন্তর দু'জনের নিয়মিত সাক্ষাৎ, শেষে দু'তিন মাস, ক্রমে সাত আট মাসের ব্যবধানে এদের গোপন মিলন চলে। ইতিমধ্যে প্রায় তিন বৎসর পরে কোন এক রাত্রে নির্জন সাক্ষাতের সময়ে কাদম্বিনী জানায় যে তাকে এক আত্মীয়ার গৃহে স্থানান্তরে যেতে হবে। সন্তান সম্ভবা মাতুলানীর পরিচর্যার জন্য কাদম্বিনীকে এখন প্রয়োজন। তার অনুরোধ সাত আট ক্রোশ দূরে সেখানে গিয়ে যেন রমণীমোহন একবার অন্ততঃ গোপনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর কিছুদিন পরে রমণীমোহন অনেক মেহনতের পর সে বাড়ী খুঁজে বার করেন ও রাতে উঠোনে ঢিল ফেলে সংকেত করলে কাদম্বিনী বাইরে এসে দেখা করে, জানায় যে একটু পরে বাড়ীর সকলের আহারপর্ব চুকে গেলে তাকে সে গোপনে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যাবে। খানিক পরে মাতুল-মাতুলানী পূর্বদিকের ঘরে গেলে, কাদম্বিনী ও রমণীমোহন পশ্চিমদিকের ঘরে প্রবেশ করেন। রমণীমোহন জানান যে এই শনি, রবি দুদিন ও সোমবার রথের বন্ধে তিনদিন ছুটি পাওয়া গেছে। কাদম্বিনী যোগ দিয়ে বলে, এমন সুখের দিন বারবার আসে না, এই তিন রাত তার অতিথি আর দিনমানে বাজারে যো যা করে কাটালেই হবে, এই অঞ্চলে রমণীমোহনকে কেউ চেনেনা। কথায় কথায় কাদম্বিনী জানায় যে

তার মামীমা কাদম্বিনীর ভাবান্তরে কিছু আঁচ করেছেন, আর রতা প্রশ্নের জ্বালায় কাদম্বিনী তার গোপন প্রণয় প্রকাশ না করে পারেনি।

কাদম্বিনী আশ্বাস দেয় তার মামীমা রসিকা এবং তিনি হাল্কাভাবেই এদের প্রণয় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু রমণীমোহন ভাবেন, মেয়েদের মন, আমার আসার সংবাদ সেই আত্মীয়াকে না দিয়ে পারবেনা, তখন ফ্যাসাদে পড়তে হতে পারে। এখানে আর নয়, কালই এ বাড়ী হতে লম্বা।

এরপর অনেকদিন গত হয়েছে। রমণীমোহনের প্রেমে ভাঁটা পড়েছে। এখন নানা কাজ কর্মের অছিলায় আগের মত সাক্ষাৎ করেন না। কিন্তু কাদম্বিনী এখনও প্রেমমুগ্ধা। রমণীমোহনকে জানায় ঘরে থাকতে আর মন চায় না। একে তো রমণীমোহন দেখা সাক্ষাৎ আর করেন না, তার পর পাড়ার লোকের গঞ্জনায় বিশেষ সেই যে তিন ষন্ডা ঈশান, কৈলাস ও গোপাল কয়েদ হয়েছিল, তাদের বাপ, মা, জ্ঞাতি গোষ্ঠী, ছেলে বুড়ো সকলেই তাকে গাল দেয়। বাইরে জ্বালা, ঘরেও শান্তি কই! এ অবস্থায় রমণীমোহন যদি একটু ঠাঁই দেন তো অভাগার গতি হয়। রমণীমোহন দেখলেন এ অবুঝ তো এখনই গৃহত্যাগ করতে চায়। নানাকথায় বুঝিয়ে, আগামী মংগলবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে ও সে রাতে দেখা করবেন আশ্বাস দিয়ে তখনকার মতো বিদেয় হন।

মংগলবারের প্রতীক্ষার রাত কাবার না হতেই ভোরবেলা নাপ্তিনী আসে রমণীমোহনের কাছে। বলে, কাদম্বিনী অস্থির হয়ে কৈফিয়ত জানতে চেয়ে তাকে পাঠিয়েছে। রমণীমোহন ভাবেন—সর্বনাশী বুঝি লেটা বাদালে, প্রকাশ্যে বলেন, "আচ্ছা তাকে বল আজকে যাব, কিন্তু আমি না গেলে যেন কিছু না করে।"

যাব বলে পাঠালেও রমণীমোহন ভাবেন আজ রাতে সাক্ষাৎ না করলেও কাদম্বিনী কিছুতেই ঘরের বার হবেনা। ওদিকে অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে অস্থির মন নিয়ে কাদম্বিনী রাতের আঁধারে ছোট এক পুঁটুলি হাতে ঘরের বাহিরে আসে। প্রথমেই নাপ্তিনীর বাড়ী এসে উপস্থিত, বলে—"সেই যে বাবু আসবেন বলেছিলে এখন ত এলেন না, তাঁর বাসায় আমাকে নিয়ে যেতে হবে।" নাপ্তিনী দেখে ভাল বিপদ; তখন আর কাকুতি মিনতিতে একটা খবর পৌঁছে না দিয়ে পারেনি, কিন্তু তাই বলে কাদম্বিনীকে সংগে নিয়ে সেই বাবুর বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া? নাপ্তিনী বলে,—

"আবাগের বেটি কিছু গঞ্জনা হয়েছে বটে তা বলে কি ঘরের বার হতে

হয়, না পা উঠতে হয়, তাতে কি জাত থাক্‌বে? তোর বাপের এই মস্ত নাম সংভ্রম একেবারে ডুব্‌বি, আর লোকেই বা কি বল্‌বে?"

কাদম্বিনী ভাবে একবার যখন ঘরের বার হয়েছি তখন আর ফিরব না, কিন্তু একা এই রাতে যুবকনগরে যেতে সাহস হয় না, বিশেষ বাড়ী চিনিনে, দেখি যদি নূতনগঞ্জের খুদী বৈষ্ণবীকে ধরা যায়। নাপ্তিনীর বাড়ী থেকে উর্দ্ধশ্বাসে সে খুদী বৈষ্ণবীর বাড়ী উপস্থিত হয়। এত রাতে একলা এমন উদ্ভ্রান্ত চেহারায় আসার কারণ কি জানতে চাইলে কাদম্বিনী বলে—দিদি আমি আর ঘরে থাক্তে পারিনে, আমার বড় লাঞ্ছনা হয়েছে।

বৈষ্ণবী—ও সব্বনাশী পোড়ারমুখী! তুই বল্লি কি? অমন কথা বলিসনে ২, চল্ ২ এখনি চল্ তোরে ঘরে রেখে আসি।

কাদম্বিনী জানায়, মনের জ্বালায় সে ঘরের বার হয়েছে, বাড়ীর গঞ্জনা আর সহ্য হয় না। বৈষ্ণবী বলে যে এ বয়সে যাই করনা, ঘরে থাকলে শেষটা দুঃখ পেতে হয় না, এখনরাত ভোর হবার আগে বৈষ্ণবী তাকে বাপের বাড়ী পেঁছে দিয়ে আসবে কেউ জানতে পারবেনা। কিন্তু এ মেয়েকে টলায় কার সাধ্য!

সকাল না হতেই কাদম্বিনীর বাপ গদাধর সেন কয়েকজন প্রতিবেশীর সঙ্গে বৈষ্ণবীর বাড়ী হাজির।

গদাধর—হেঁ গা বাছা! তোমার এমন জ্ঞান বুদ্ধি হয়ে একেবারে আমাদের মুখে আগুন দিতে উদ্যত হয়েছ? তা এখন চল বাছা বাড়ি চল, আর তোমায় কিছু বল্‌ব না।

বাপের সাধাসাধিতে কাদম্বিনী বলে, —

"তুমি আর আমায় কিছু বল না, গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা বৈ ত নয়, পাড়ার লোক দুকথা বল্লে সহ্য হয়, তোমাদের আর বকুনি রাত্ দিন খেতে পার্‌ব না।"

প্রায় দু'প্রহর বাক্যব্যয়ে গদাধর ও সঙ্গীরা মনস্থ করেন এবেলা কাদম্বিনী খুদী বৈষ্ণবীর বাড়ীতে থাক, এ তো আর ভিন্ন স্থান নয়। ফেরার পথে প্রতিবেশী সদানন্দ বলে,—

"দেখুন সেনজ মশায় আর যত্ন করা বিফল, বিবেচনা হয় পুনঃ ঘরে আসবার নয়, তার জন্য আর ভাব্‌লে কি হবে, কত ঘরে কত হচ্ছে তা কি করা যাবে? যৎ বিধির্মনঃসি স্থিতঃ।"

বৈষ্ণবীর বাড়ী হতে কাদম্বিনী কোন এক তরুণ মহেন্দ্র'র মারফৎ রমণীমোহনকে সংবাদ পাঠায়। বৃত্তান্ত শুনে রমণীমোহন খুসী হন না।

কাদম্বিনী এবার নিজে রমণীমোহনের আস্তানায় রাতে দেখা করতে আসে। রমণীমোহন বলেন,

"তুমি যে ঘরের বার হয়েছ একি ভাল কর্ম্ম করেছ? ভাল কর্ম্ম কর নাই, তোমার বাপের নাম সংভ্রম তুমিও বুদ্ধিমতি বটে, এককালে কি বলে জলাঞ্জলি দিলে, তা যা হোক আমাকেও দশজনে জানে শোনে, আমাকে কি বল্‌বে, এখন চল তোমাকে বাড়ি রেখে আসি সকল দিগ বজায় থাকবে।"

কাদম্বিনী জানায় যে বাড়ী ফেরার চিন্তা বৃথা, 'ঘরে পরে বড় গঞ্জনাতেই ঘরের বার হয়েছি।' তবে এ ব্যাপারে রমণীমোহনের বদনাম হবে কেন? থানা ও জমিদারের কাছারিতে সকলেই জেনে গেছে রমণীমোহন কাদম্বিনীকে ঘরের বার করেননি। কাদম্বিনী আরও বলে যে থানা ও কাছারিতে কাদম্বিনীর তলব হলে; খুদী বৈষ্ণবী একদিন থানায় আর একদিন জমিদারের কাছারিতে তাকে নিয়ে যায়, আর দু'জায়গায় দু'টি টাকা দিয়ে কি বলে কয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

রমণীমোহন—এর মধ্যে তুমি টাকা পেলে কোথায়, রোজগার হচ্ছে কেমন? যেন আসলে লোক্‌সান হয় না।

কাদম্বিনী—'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল' এঁর ঠাট্টা দেখে আর বাঁচিনে, কেন মায়ের বাক্সের চাবি আমার ঠাঁই ছিল, তাতে গহনা পত্র যা ছিল কিছু ছুঁইনি, কেবল ৬টি টাকা মাত্র আনি, তার মধ্যে কাছারী ২ টাকা, আর এই এক যোড়া ধুতি কিনি ২ টাকা, আর এক টাকা ভাঙ্গিয়ে কদিন চলেছে, আর ১ টাকা আছে; এখন আপনার চরণ শরণ নিলাম, আমার আর ভাবনা কি সকল ভাবনা গেল।

বৈষ্ণবী একদিন রমণীমোহনকে বলে যে এখানে কাদম্বিনীর দুঃখের শেষ নেই,—"আমার সাক্ষাতে সর্ব্বদা বলে 'বাবুর নিকট না থাকলে কষ্ট যাবেনা' এবং মাজে মাজে কাঁদা কাটাও করে থাকে, বিশেষ এখন আপ্নি নিয়ে গেলে আপনার বদ্‌নাম হবে না, কেননা এখানে প্রায় ৭/৮ মাস বাস করাতে সে গোল মিটেছে।"

কথাটা রমণীমোহন একেবারে ঠেলতে পারেন না, ভাবেন,—

যদিচ রমণী জাতি, ক্রূরা অতিশয়।
বিলম্বেতে এসে সদা, সেহ ভাল নয়॥
যাতায়াত করিতে, বিশেষ কষ্ট হয়।
অধিকন্তু দেখিতেছি, ছাড়াবার নয়॥

কাযে কাযে কামিনীকে, আনিতে হইল।
এতভাবি বাসাবাটি, ঠিকানা করিল ॥
শনিবার রজনীতে, রমণী মোহন।
পাচকে লইয়া সঙ্গে, করিল গমন ॥
উপনীত হইল যদি, রমণীমোহন।
আনন্দের সীমা নাই, রমণীর মন ॥
চলিত সামগ্রী যত, সংগ্রহ করিল।
ঘোড়া গাড়ি ভাড়া করি, তাহাতে পূরিল ॥
গমনে আনন্দ হাস্য, পরিহাস হয়।
যত হাসি তত কান্না কুশদেব কয় ॥

যুবকনগরে নতুন আস্তানার কথা কিছুদিন গোপন থাকে। ক্রমে ক্রমে রমণীমোহনের বন্ধু মহলে তা' প্রকাশ পায়, আর শুরু হয় লোক কানাকানি, এদের অপবাদে রমণীমোহনের তিষ্ঠানো দায়, মান সম্ভ্রম আগেই গেছে। ভাবেন, অনেকদিন ধরে মৌ লুটছি, আর কেন, এবার কাদম্বিনীকে কিছুদিনের মতো দূরে পাঠাই, অন্ততঃ লোকলজ্জা কিছুটা যাবে। কাদম্বিনীকে বলেন, —"যদিচ তোমার গৃহের বার হওয়া আমার মনস্থঃ ছিলনা, তুমি আপনা হতেই আমার প্রতীক্ষা না করিয়া বহির্গত হয়েছ, তথাচ আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে চাইনে এবং মনস্থঃও নয়, কিন্তু এক্ষণে ঘরে পরে সতত পরত যেরূপ দুর্নাম শুনতে পাই (যদিচ অনেক ২ ভদ্রলোকের এরূপ আছে বটে) তথাচ আমার মাথা তুলে বেড়ান ও মুখ তুলে লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া নিতান্ত লজ্জাকর হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং সেই হেতু আপাতত তোমাকে দিনকত স্থানান্তর রাখতে বাসনা করি, তাহা হইলে লোকাপবাদ দূরিভূত হইলে, পরে কোন নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া কাল যাপন করিব তার কি বল।"

রমণীমোহনের কূটচাল ধরতে না পেরে কাদম্বিনী সঙ্গে সঙ্গে রাজী। কিন্তু বাদ সাধে বর্ষীয়সী প্রতিবাসিনী জগদম্বা। কাদম্বিনীকে মন্ত্রণা দেয়—

"হেদেখ বাছা, তুমি কিছু বুঝতে পাচ্ছ না, তোমাকে বাবু রসিকগঞ্জে রেখে এলে কি আর আনবে না মনে করবে?" জগদম্বার বুদ্ধিতে কাদম্বিনী পালটা চাল চালে। পরদিন রমণীমোহনকে বলে যে নতুন জায়গায় যেতে হলে উপযুক্ত গহনা না থাকলে লোকের কাছে দাঁড়ান যাবে না। এছাড়া কিছু ভাল তৈজসপত্র যেমন কাঞ্চননগরের থাল, একটা গাড়ু আর একজোড়া ঢাকাই অথবা শান্তিপুরে শাড়ী চাই।

কাদম্বিনীর দাবীর বহর দেখে রমণীমোহন বুঝলেন কেউ কান ভাঙ্গানি দিয়েছে, মিথ্যা স্তোকবাক্যে আর কাজ হবে না। খানিকক্ষণ রাগারাগি করে চলে আসেন, স্থির করেন কাদম্বিনীকে পরিত্যাগ করবেন, যদিও মাস মাস একটা মাসোহারা তাকে পাঠিয়ে দেবেন।

দাসীর মুখে খবর পাঠান মাসিক তিন টাকা তিনি কাদম্বিনীকে দেবেন, —"ওর সঙ্গে যা হবার তা হয়েছে, তবে আমার এখন এই বলা থাকল যে যদি ও ঐ বাটিতে স্বভাবে থাকে, তবে ওর জীবনাবধি আমি অন্ন বস্ত্র দিব, আর যেন আমার কিছু শুন্তে না হয়।"

জগদম্বা বোঝায় তিনটাকা তো নস্যির টিপ, ৮/১০ টাকার কমে চলে কী করে, বিশেষ এই মাগ্গির বাজার, দুজন লোক বাড়ী এলে দুটো পান, জলখাবার না দিলে ভালো দেখায় না। উকীলের পরামর্শ নিতে হবে, দেখা যাক আইন কী বলে।

উকীল মুন্সি ছমির্নাদ্দন দু-চার কথার পরে জিজ্ঞেস করেন,—"রমণীমোহন বাবু আসেন না কেন ; এনার কোন দোষ হয়েল নাকি ?"

জগ—না গো বাছার আমার কোন দোষ নাই, তিনি লজ্জা পান বলে কিছুদিন রসিকগঞ্জে গিয়ে থাক্তে বলেছিলেন ; তাই না যাওয়াতেই রাগ করে আসেন না, তা তিনি রেখেছেন, রসিকগঞ্জে গেল না বলে কি ছাড়তে পারেন ?

উকীল—তা তিনি ছেড়েছেন ২, এনার ত বেশ বয়েস আছে কেন দেখে শুনে চলুন না।

জগ—তা ওকে আমি বিস্তর বলেছি, ও তা আর কিছু কর্ত্তে চায় না, এখন আপনার কাছে এলুম একটি নালিশ করে দেইন।

উকী—কি রকম নালিশ করে দিব গা ? কিছু বুজ্‌দি পাচ্ছিনি, রমণীমোহন বাবু এনার সঙ্গে ছেলেন, কি খোরাক পোষাক দেবেন, তার কোন দলিলপত্র লেখা পড়ি আছে ?

জগ—না গো মুন্সি মশায়, তার কোন দলিল পত্র লেখাপড়া নেই, তবে তিনি মাসে তিন টাকা করে দিতে চেয়েছেন তাতে কি চলে।

উকী—তা কেন রমণীমোহন বাবু ত বেশ করেছেন ; তিন টাকা মাসে দিবেন ত আর কি তাতে একটা মানুষের ত বেশ চলবে।

জগ—তিন টাকাতে কেমন করে চলে গা ? দু' জন লোক এলে দুটো পান, কি মানুষ বিশেষ কিছু জলখাবার না দিলে কি ভাল দেখায়, বিশেষ এ মাগ্‌গির বাজার, ৮/১০ টাকার কম কি চলতে পারে ?

উকী—কেন তিন টাকাতে একটা মানুষের বেশ চলবে, যদি রমণীমোহন বাবু না আলেন এবং তিনিই খোর পোষই দেলেন তবে আর পান পানি খাবারি বা খরচ কি, আর অন্য লোকই বা আসবে কেন এবং অন্য লোক এলেই বা রমণীমোহন বাবু খোর পোষ দেবেন কেন ?

এ প্রশ্নের জবাবে কান্না ছাড়া কাদম্বিনীর গতি থাকে না। উকীল ভাবেন ভাল বিপদে পড়া গেল, বোঝালেও বোঝে না। ফৌজদারী বা দেওয়ানী যাহোক একটা করা যাবে, এই বলে সেদিনকার মতো দুজনকে নিরস্ত করে বাড়ী পাঠিয়ে দেন।

পরদিন দুজনে আবার উকীলের বৈঠকখানায় হাজির। জগদম্বা বলে দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুটোতেই নালিশ করা যাক, উকীল মনে মনে ভাবেন—এত মন্দ নয়, ভাল মেয়ে মানুষের পাল্লায় পড়েছি, যাহোক ক্রমে নিরস্ত করা উচিত, যে হেতুক যে হেতু বলে কোন আইন মতে কোন আদালতে নালিশের যোগ্য নহে, বিশেষ ভদ্রলোকের অখ্যাতির সূচনা করা উচিত হয়না এই ভাবিয়া [প্রকাশ্য করিয়া] 'আচ্ছা তা যা ঠাউরেছ সেই ভাল, ঐরূপ নালিশ করা যাবে।'

দেওয়ানী ও ফৌজদারীর জন্য লিখিত নালিশের দুই আর্জি প্রস্তুত করে উকীল বলেন ১০/১৫ টাকা যোগাড় করে আন। জগদম্বা কাদম্বিনীর গহনা বন্ধক দিয়ে তখনই টাকা আনতে চায়। উকীল ভাবেন, ল্যাঠা এদের থামান যায় কী করে, বলেন, "তা এজ্‌কো গে খাওয়া পেওয়া কর, দরখাস্তের যো গেছে।"

এইরূপে জগদম্বা, আম্বা করি মনে।
নিত্য যায় ধনী সহ, উকীল ভবনে॥
উকীল প্রত্যহ ছলে, করে কাল ক্ষয়।
আজি কালি করে গত, কত দিন হয়॥
কাদম্বিনী বলে মাসী, কি হল কি হল।
বাসনা না হয় পূর্ণ, সময় যে গেল॥
কুশদেব বলে ধনী, সময় কি রবে।
আজি কালি কর্ত্তে ২, সিঙ্গে নিতে হবে॥

জগদম্বা বলে, ভেবে আর কি হবে,—"তুই যদি বেঁচে বর্ত্তে থাকিস আর যদি মনে করিস তবে তাঁর মত ব ত বাবু এই দ্বারে গড়াগড়ি যাবে।"

কাদম্বিনী—বাছা বল্লে বটে, কিন্তু যেমন যায় তেমন কি আর হয়, বিশেষ সেই আমি সোমত্ত হতে না হতে যোটাযুটি হয়েছে বাছা কেমন করে ভুল্‌ব আর কেমন করেই সয়ে থাক্‌ব ?

দিনে দিনে দীর্ঘকাল গত হল, কিন্তু রমণীমোহনের আর ভ্রুক্ষেপমাত্র নেই।

কাদম্বিনীর ককারাদিতে খেদ

পয়ার

কর্ম্মদোষে জন্মভূমি,	কি ক্ষণে এলাম রে।
খলের হাতেতে পড়ে,	ভাবিয়া গেলাম রে ॥
গলায় কাটারি দিয়ে,	কেন না মলাম রে।
ঘোর দায় পড়ে একি,	যন্ত্রণা পেলাম রে ॥
ঘট না বুঝিতে পেরে,	ভেবে প্রাণ যায় রে।
সত্য নারায়ণ যদি,	মুখ তুলে চায় রে ॥
হল ক্লেশ তনুশোষ,	তবু তায় ধায় রে।
ক্ষান্ত নাহি হয় মন,	হায় হায় হায় রে ॥
কুশদেব কষ্টভুগে,	গ্রন্থ কৈল সায় রে।
ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম কিন্তু,	এ প্রেমের পায় রে ॥

জেল-দর্পণ

নাটক।

চা-কর দর্পণ নাটক প্রণেতা

শ্রীদক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং তদপি নমুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং॥

মোহমুদ্গর।

" এসা দিন নেহি রহে গা "

"কোটী কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় রে নরকের প্রায়।
মুহূর্ত্তের স্বধীনতা স্বর্গ সুখ তায় রে স্বর্গ সুখ তায়॥

"England with all thy faults I love thee still.'

কলিকাতা।

সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট ৫৩ নং ভবনে

শ্রীদক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

১২৮২।

Price 12 Annas. মূল্য বার আনা।

জেল দর্পণ নাটক

দাক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম নাটক 'চা-কর দর্পণ'-এর মতো আলোড়নকারী না হলেও ঊনিশ শতকের বাংলায় হাজতগুলির কি অবস্থা ছিল, সে সম্বন্ধে জেল-দর্পণ নাটক যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। কয়েদ ব্যবস্থার যে বর্ণনা এ নাটকে আছে তা প্রথমে অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসু সত্যসন্ধানী পাঠক পুরনো জেল-রিপোর্ট, পার্লামেন্টের বিতর্ক আর Report on Native Papers-এর পাতায় পাতায় যে আসল জেল দর্পণের বিশেষ করে ফৌজদারী কয়েদীদের অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হবেন, তা নিঃসন্দেহে আরও ভয়াবহ, আরও নৈরাশ্যজনক।

ভারতবর্ষের কয়েকটি ইংরাজী কাগজে প্রকাশিত খবর ও বাংলার বার্ষিক জেল রিপোর্ট হতে উদ্ধৃত করে পার্লামেন্টের দুই কক্ষের কয়েকজন সদস্য ১৮৭৬-১৮৮৩ সালে বিতর্কের যে ঝড় তোলেন তার থেকে জানা যায় যে ঐ সময়ে বাংলায় কয়েদীর মৃত্যুর হার পরপর কয়েক বছর বেড়েই চলে; যথা—১৮৭৭ সালে ৮৬৯ জন, ১৮৭৮ সালে ১২১৬ জন এবং ১৮৭৯ সালে ১৬৭৯ জন কয়েদী জেলে অন্তরীণ অবস্থায় মারা যায় অর্থাৎ মৃত্যুর হার ঐ তিন বৎসরে ক্রমান্বয়ে ৫·০৬, ৭·১৭ এবং ৯·৮৯। সেক্রেটারী অফ ষ্টেট (মার্কুইস অফ হার্টিংটন) এক নির্দেশনামায়[১] লর্ড রিপনকে লিখলেন,—"I have been much impressed in particular by the statement contained in the Bengal Gaol Report for 1879 that heavy mortality has been going on from month to month without the attention of the Government being called to it." এর তিন মাস পরে ১৮৮২ সালের ১০ই আগষ্ট, হাউস অফ কমন্সে এক প্রশ্নোত্তরে সেক্রেটারী অফ ষ্টেট জানান যে বাংলায় ১৮৭৯ সালে প্রবর্ত্তিত কয়েদীদের নূতন আহার্য তালিকা এ দুর্গতির জন্য মূলতঃ দায়ী বলে বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর মনে করেন, শুধু তাই নয় মার্কুইস অফ হার্টিংটন আরও ব্যক্ত করেন যে এক ১৮৭৯ সালেই বাংলার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেন্ট্রাল জেলগুলিতে মোট ৮২৩২ জন কয়েদীকে চাবুক মারা হয়েছে জেলের নিয়মভঙ্গের অপরাধে। কি সেই অপরাধ? আয়র্লণ্ডের Dungarvan অঞ্চলের সদস্য মিঃ ও'ডনেল 'বম্বে গেজেট' ও 'ক্যালকাটা ইংলিশম্যান' পত্রিকা হতে উদ্ধৃতি করে জানাচ্ছেন[২] —"Prisoners who from want of food

(১) Judicial Despatch to India, No. 16, dated 25 May 1882

(২) House of Commons, June 23, 1881

were unfit to labour were dragged to the triangles and flogged by the thousand because they were weak and sick unto death on starvation rations."

কয়েদীদের আহার্যের পরিমাণ কম হওয়ার অভিযোগ নতুন নয়। এ ব্যাপারে Mr. T. C. Loch যে বিবৃতি দিয়েছেন সংক্ষেপে তার ভাষ্য হলো—"আহার্যের প্রসঙ্গ স্বভাবতই বার বার আমার সামনে এসেছে, একথা অস্বীকার করা যায় না যে ১৮৫৪ সাল থেকে জেলে মৃত্যুর হার বেড়েছে, কিন্তু বেশির ভাগ চিকিৎসক খাদ্যের এই কম পরিমাণকে মৃত্যুর কারণ বলে মনে করেন না; সাধারণ বিশ্বাস এই যে খাদ্যের পরিমাণ পর্যাপ্ত। কিন্তু আমি সন্তোষজনক উত্তর কোথাও পাইনি।" ঐ একই রিপোর্টে মিঃ লক আবার লিখছেন যে জেলে অন্তরীণ অবস্থায় বিমর্ষ মানুষের যতটা পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন, জেলের বাইরে প্রহরামুক্ত মানুষের ততটা প্রয়োজন হয় না। এদেশে আত্মীয় পরিজন সম্বন্ধে মানুষের যত টান দেখা যায় এমন বোধ হয় সচরাচর আর কোথাও দেখা যায় না। জেল থেকে পলাতক ব্যক্তি এই কারণেই ঘরবাড়ির মায়ায় স্বগ্রামে দেখা করতে এসে আবার ধরা পড়ে। ভাঙ্গা মন নিয়ে কয়েদীদের এক বৃহৎ অংশ জেলে কাজ করতে বাধ্য হয়, এজন্য বন্দীদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে তাদের যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার দেওয়া উচিত।

দুঃখের বিষয়, জেল কর্তৃপক্ষের সকলেই মিঃ লকের মত পোষণ করতেন না। বন্দীদের খাদ্য তালিকা নিয়ে সরকার অনেকবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। ১৮৬১ সালে জেলের ইন্সপেক্টর জেনারেল Dr. F. J. Mouat জানাচ্ছেন[২] যে ঐ বছরে নতুন খাদ্যব্যবস্থায় বন্দীদের আপত্তি এই যে মিঃ লকের তালিকাভুক্ত ভরপেট ভাতের ব্যবস্থা এতে নেই।

এর দু'বছর পরে ডাঃ মোয়াট লিখছেন[৩] —"The most prominent defects in the existing prisons of the Lower Provinces are—want of space to an extent that is responsible for very much of the heavy preventile mortality that occurs; insecurity and

(১) Rep. on the Jails of Bengal, Behar and Orissa for the year 1854-55, p. 3

(২) Rep. on the Jails of the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1861 and 1861-2, p. 64.

(৩) Rep. on the Jails of the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1863, p. 65

defective construction of the greater number of prisons under my charge, in some cases amounting to utter and absolute unsuitability for any of the purposes of a prison ; the entire absence of a sound system of prison discipline and the urgent need of a special agency for the management of at least of those prisons in which heinous offenders, or persons sentenced to rigorous imprisonment, are confined."
ঐ একই রিপোর্টের উপসংহারে ডাঃ মোয়াট লিখছেন যে কলেরার প্রকোপে জেলে মৃত্যুর হার বেড়ে গিয়েছে আর জেলের আভ্যন্তরীণ শিল্প ও হাতের কাজে ঐ বছর যথেষ্ট আয় হয়েছে, এছাড়া আর কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয়নি, চলতি জেল ব্যবস্থায় কোনও পরিবর্ত্তন সম্ভবও নয়।

জেলের এই অচলায়তন অবস্থার কারণ অনেকগুলি। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল জেল কর্মচারীর অযোগ্যতা। এ বিষয়ে জেলের ইন্সপেক্টর জেনারেল Mr. A. S. Lethbridge লিখছেন —"Where Superintendents and Jailors are ignorant of the details of jail management, it is not to be expected that those under them can arrive at those details by intuition, much less carry them out. Judging from applications I receive for Jailorships, it would appear that when a man fails in other walks of life he considers that he is at least fitted for a Jailorship. Why or how this idea came to be so generally prevalent, is more than I can undertake to explain, for the training and qualities we require of a Jailor are not usually found in rolling stones."

১৮৮১ সালের ১৮ই আগষ্ট হাউস অফ কমন্সের বিতর্ক পাঠে জানা যায় যে এক ১৮৭৯ সালেই বাংলার জেলগুলিতে মোট ৮২৩২ জন কয়েদীকে প্রহার দণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং পরের বছর প্রথম ছয় মাসে ৩৩৮৬ আসামী এই দণ্ড লাভ করে। জেলের মধ্যে এভাবে পাইকারী হারে মারপিটের কারণ কি? বাংলার বিচার ব্যবস্থায় শাস্তি হিসাবে প্রহারদণ্ডের প্রচলন ছিল। অন্যদিকে জেলের নিয়মভঙ্গ ও অপরাধেও উত্তম মধ্যম জুটত। এই দুই পর্য্যায়ের প্রহার

(১) Administration Report on the Jails of Bengal for the year 1877, p. 16.

জেলের অভ্যন্তরেই হ'ত। ১৮৬৪ সালের ৬নং আইন অনুসারে সারা ভারতে কয়েক পর্যায়ের অপরাধে প্রহারদণ্ডের ব্যবস্থা বলবৎ হ'ল, যথা—চুরি, ডাকাতি, জালিয়াতি, মিথ্যা সাক্ষ্য, ধর্ষণ, অপ্রাপ্তবয়স্ক নাবালক অপরাধী, সীমান্ত অঞ্চলের বন্য জাতি এবং দ্বিতীয়বার একই অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি।

সীমান্ত অঞ্চলের বন্যজাতের আসামীকে প্রহারদণ্ড দানের কারণ হিসাবে বাংলার হাইকোর্টের জাষ্টিস W. S. Seton-Karr জানাচ্ছেন (১৩ই অক্টোবর ১৮৬৩ সাল)—"No. 5, Wild Tribes & C: The reason for this recommendation is that amongst Wild Tribes many persons are found who can not be subjected to confinement without its endangering their health, and to such persons flogging is positively far less inhuman than imprisonment." ভারতবর্ষের শ্রীঘরকে স্বাস্থ্যনিবাস মনে করার কারণ নেই। শুধু বন্যজাতিই নয়, যে কোনো কয়েদী এখানে এসে স্বাস্থ্য হারাতে পারে। জেলের অভ্যন্তরে লাঠ্যৌষধির অপপ্রয়োগে দেশের সংবাদপত্র ও বিলাতের পার্লামেন্ট ধিক্কার দিয়েছে। ১৮৬৪ সালে উপরোক্ত বিল পাশ হবার আগে বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তরফ হতে দুটি প্রতিবাদপত্র আসে। অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য যে এই প্রথা অমানুষিক, বর্বর। স্বয়ং লর্ড বেণ্টিংক এই শাস্তির অসারতা উপলব্ধি করে ১৮৩৪ সালে প্রহারদণ্ড রদ করেন। তাছাড়া এ বিল সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটি একমত নন।

প্রহারদণ্ড বরবাদ হওয়ায় কারাদণ্ড প্রাপ্ত কয়েদীর সংখ্যাবৃদ্ধি ও জেলে অত্যধিক ভীড়ের যে অভিযোগ প্রস্তাবিত বিলের সপক্ষে কারণ হিসাবে বলা হয়েছে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সেক্রেটারী অফ ষ্টেটকে লিখছেন যে এই যুক্তি সত্য নয়। ব্যবসা বাণিজ্যের বৃদ্ধি, এদেশে বহু বিদেশীর আগমন, দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, আর সর্বোপরি নূতন পিনাল কোডে শাস্তির যোগ্য অপরাধের সংজ্ঞা প্রসারিত হওয়ায় ইদানীং অপরাধের সংখ্যা বেড়ে গেছে।

প্রহারদণ্ড বাতিল হওয়ায় এক বাংলা প্রেসিডেন্সিতে জেলবিভাগে দু'লক্ষ টাকা বেশি খরচ হচ্ছে বলে যে অভিযোগ আনা হয়েছে সে সম্বন্ধে অ্যাসোসিয়েশন ঐ একই প্রতিবাদ পত্রে জানাচ্ছেন,—"We think such a justification illogical and cruel—cruel in as much as it arbitrarily visits upon the helpless subject of shortcomings, the errors, or the

(১) Home Dept., Legislative Proceedings, April 1864, No. 13, dated 21st March 1864.

weakness of the Ruler—illogical as it attempts to refute a moral objection with an argument of financial expediency."

ভাইসরয়কে লেখা অন্য প্রতিবাদ পত্রে[১] অ্যাসোসিয়েশন লিখছে,—"That can not be called sound economy, which is enforced by producing utter demoralization of the people and offering an irreparable injury to their feelings of self respect."

এই বিল সম্বন্ধে কলকাতার সোমপ্রকাশ পত্রিকা লিখছে[২] যে, বেত মারার সংখ্যা নির্দিষ্ট হলেও যে সে সংখ্যার কমবেশি হবে না তার নিশ্চয়তা কি? শাস্তির সময়ে উপস্থিত রাজকর্মচারী কেউ ক্রুদ্ধ আর কেউ বা দয়ার অবতার হয়ে যে এর অন্যথা করবেন না সে সন্দেহ যায় না।

কয়েদে অপরাধীর ভীড় হলে মড়কের ভয় আছে, অন্যদিকে প্রহারদণ্ড চালু হলে জেলে ভীড় ও মারীর ভয় কম, আর তরুণ বয়স্ক অপরাধীদের দাগী কয়েদীর অসৎ সংসর্গে আসার সম্ভাবনা অল্প—বিলের এই যুক্তির উত্তরে সোমপ্রকাশ লিখছে,—"কারাগৃহের অবস্থা ও দোষ সংশোধন করিলে কি মারী ভয় কমিয়া যায় না? যুবা ব্যক্তিদিগের কারাগৃহ বাসসুলভ কুক্রিয়া নিবারণ জন্য যদি তথায় উপদেশক নিয়োজিত করা ও তাহাদিগের চরিত্রের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা যায়, ইষ্টলাভ হওয়া কি দুর্ঘট হয়?"

জেলে অন্তরীণ অবস্থায় কয়েদীদের যথেষ্ট খাটুনি ও পরিশ্রমের কাজ দেওয়া হ'ত, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই পরিমাণে যথেষ্ট আহার্য্য দেওয়া হ'ত না। আবার বিশেষ বিশেষ কারণে শাস্তি হিসাবে কয়েদীর খাবারের পরিমাণ আরও কমানো হতো। এ অবস্থায় কয়েদী নির্দিষ্ট কাজ করতে অপারগ হলে, সেই অক্ষমতা জেলখানায় অনিয়ম বলে গণ্য হ'ত। এই অপরাধের সাজা ছিল উত্তম মধ্যম। ঊর্দ্ধপক্ষে এ শাস্তির পরিমাণ ছিল তিরিশ ঘা বেত। এ নিয়ে পার্লামেন্টে বিতর্ক হয়েছে, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়ও এ নিয়ে কম লেখালেখি হয় নি। লর্ড সভার অধিবেশনে[৩] ভারতবর্ষে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভিমত উল্লেখ করে, লর্ড ট্রুরো (Lord Truro) জানান যে দেখা গেছে মাত্র সাত অথবা আট ঘা চাবুকের পরেই কয়েদীর পিঠের মাংসপেশি বেতের সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে।

---

(১) Home Dept., Legislative Proc., April 1864, No. 14, dated 15th Feb. 1864

(২) সোমপ্রকাশ, ভাগ ৩, সংখ্যা ৬, ১১ই পৌষ ১২৬৭ —"শারীর দণ্ড"।

(৩) Parliamentary Debates in the House of Lords, July 6, 1883.

জেল দর্পণ

কাহিনীর নায়ক জমিদার শিবনাথবাবু আলিপুর জেলে যান দেওয়ানী মামলার আসামী হয়ে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকার দেনা শোধ করতে পারেন নি। বিরাট পৈতৃক সম্পত্তি বাপের মৃত্যুর পর হাতে আসে। বংশের এত নাম ডাক. লোকে বলত শিববাবুর বাপের ভয়ে বাঘে-গরুতে একত্র জল খায়। আর তার দেদার টাকায় নাকি ছাতা পড়ে যেত, তিনি নাকি দেওয়ালে নোট, কোম্পানীর কাগজ টাঙিয়ে রাখতেন।

সেই সম্পত্তি, কোম্পানীর কাগজ বাপের ছেলে হয়ে শিববাবু কেমন ফুঁকে দিয়ে জেলে ঢুকলেন। শিববাবুর ছিল অনেক গুণ। আফিং, গুল, মদ, ইয়ার-বন্ধুর অভাব ছিল না। কিন্তু মেয়েমানুষের নেশাই হল কাল। ঘরে সতী লক্ষ্মী স্ত্রী থাকতেও, রক্ষিতা বিরজাসুন্দরীর পায়ে ধনমনপ্রাণ সঁপে বসে আছেন। আর এক একটি ধনী খদ্দেরকে 'ফেল' করাতে পারলে বেশ্যারা বড়-লোক। নগদে আর জিনিষপত্রে কয়েক লক্ষ টাকা শিবনাথবাবু তার রক্ষিতাকে দিয়েছেন। স্ত্রীর কাতর মিনতি, চোখের জল কিছুই তার মনে দাগ কাটে না। স্ত্রী সুরবালা একদিন বলেন,—

"এই সেদিন আমি খাতাঞ্জির কাছে শুনলেম, তোমার চারদিকে দেনা হয়েছে, সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় এক লক্ষ টাকা, এছাড়া জমিদারী বন্ধক আছে।"

শিব—এক লক্ষ টাকা, খাতাঞ্জির বাবা কখন দেখেছে?

সুর—(ক্রন্দন করিতে করিতে) তা যাই কর, আমাকে পথের ভিখারী করলে আর কি? তুমি তো এখনও বদ চাল ছাড়বে না।

কিন্তু মোহান্ধ শিবনাথ স্ত্রীর উপর আরো বিরক্ত হয়ে রক্ষিতার উদ্দেশ্যে বার হয়ে পড়েন। তার তিন মদের সঙ্গী গোপাল, মধু ও তারিণীর উপর শিবনাথের অগাধ বিশ্বাস। তারই সুযোগ নিয়ে গোপাল ও তারিণী জমিদারের দুই জোড়া শাল, পাঁচটা হীরের আংটি আর কিছু রুপোর জিনিষ চুরি করে সরিয়ে রাখে। এদিকে দেনা শোধ না হওয়ায় শিববাবুর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়। তাকে পাওয়া যায় সোনাগাছির বিরজাসুন্দরীর বাড়ী। শিববাবু পাকড়াও হয়ে থানায় চালান হন।

শিববাবু ফাটকে যাবার পরে গোপাল ও তারিণী তড়িঘড়ি ব্যস্ত হয়ে পড়ে চুরি করা জিনিষগুলি বেচে দিতে। আবার শিববাবুর সই জাল করে, গোপাল দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ বেচে। এজন্য মিথ্যা সনাক্তকরণের কাজে এক ইয়ারবন্ধুকে বেশ কিছু ঘুষ দিতে হয়। তবু শেষ রক্ষা হয় না। গোয়েন্দা ও সার্জন এসে গোপাল, তারিণী আর সেই সঙ্গে মধুকেও পাকড়াও করে ফৌজদারী আদালতে চালান দেয়।

আলিপুরের দেওয়ানী জেলে শিববাবু অন্য দুই কয়েদী শ্যামচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করছেন। বৃদ্ধ গোবিন্দচন্দ্র তামাক খেতে খেতে বলেন যে বুড়ো বয়সে জেলে থাকার অনেক কষ্ট, কোথায় বাড়িতে থেকে গঙ্গা স্নান করে ভগবানের নাম করবেন, তা, না, জেলে পচতে হচ্ছে। শ্যামচন্দ্র মনে করেন অন্য কথা, জেলে পাঠাতে পারলেই তো পাওনাদারের টাকা আদায় হয় না। কেবল যে পাওনা লোকসান হয় তা নয়, ঘর থেকে রোজ রোজ খোরাকি দিতে হয়। শ্যামচন্দ্র বলে চলেন,—

"আমি যদি কাহাকে টাকা ধার দিতুম, আর সে যদি না দিতে পারত, তা হলে কোন শালা তাকে জেলে দিত। জেলে দিয়ে লাভ তো বড়, ঘর থেকে খোরাকি দেওয়া বড় শক্ত কথা—তার কি? সে যেন শ্বশুরবাড়ি বসে খেতে থাক্‌তো এ কি বোকার কাজ নয়।"

গোবিন্দ—হ্যাঁ নির্লজ্জদের পক্ষে বোকার কাজ বটে।

শ্যাম—আরে ছিঃ মহাশয়, আপনি কিছুই বুঝেন না, আপনার কষ্টটা কি হচ্চে বলুন না! দিবা পার উপর পা দিয়ে বসে বসে খাচ্চেন, গল্পগুজব কচ্চেন, একরকম না রকমে দিন কেটে যাচ্চে। তাতে আপনার লাভ বই লোকসান নাই। বলি—ঘরের খোরাকির টাকাটা তো বেঁচে যাচ্চে। পরমেশ্বরের নাম ঘরে বসে করতে পারতেন, আর এখানে কি করা হয় না? বরং ঘরের চেয়ে এখানে আরো হয়। একে নির্জ্জন, তাহাতে আবার কষ্টে পড়লে ঈশ্বরের উপর অধিক ভক্তি হয়।

গোবিন্দ—যা বলেচ সব সত্য। কিন্তু তোমাকে বুঝাতে আমার বাবা এলেও পারবে না।

শিব—শ্যাম, তুমি থাম। বৃদ্ধ লোকের সঙ্গে তোমার তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন কি? উনি যা বুঝবেন, তাই করবেন, তুমি যা বুঝেচ তাই কর।

দেওয়ানী জেলের এই তিন কয়েদীর মন উদাস হয়ে যায়। শিববাবুর কিছু ভালো লাগেনা। বিরজার জন্য মন হু হু করে। শ্যামচন্দ্র একে একে দুটো

আধ্যাত্মিক গান গায়। কিন্তু শিববাবুর অধ্যাত্মভাব বেশিক্ষণ ভালো লাগে না। জেলের চাকরের গোপনে আফিং দিয়ে যাবার কথা ছিল, তা সে দিয়েছে কিনা শ্যামচন্দ্রকে খোঁজ নিতে বলেন। জেলে বসে কাঁহাতক চুপে চুপে ব্র্যান্ডি খাওয়া চলে, পেটে যে চড়া পড়ে গেল, একটু আফিং না হলে আর চলে না। আফিং যথেষ্ট আছে শ্যাম জানালে ; দুজনে ব্র্যান্ডির বোতল নিয়ে বসে, এই বেলা সঞ্জীবনী নিতে হয়, হুট করে কখন ইন্সপেক্টর এসে পড়বে আর বাগড়া দেবে। গোবিন্দচন্দ্রকে মদ দিতে চাইলে তিনি বলেন, আমি ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যা, আহ্নিক করি, মদ খাব? দূর দূর। বৃদ্ধ আপন মনে সংস্কৃতে বকে যান যে কলিতে অন্ন ও ক্ষেত্রের বিচার থাকবে না, সকলেই ব্রহ্ম ব্রহ্ম করে বেড়াবে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পথে কেউ যাবে না।

একসময় শ্যামচন্দ্রের আর সহ্য হয় না, বলে,—

"আর বাবা, তোমার সংস্কৃত বুকনি ঝাড়তে হবে না, আমরাও সকল জানি।"

গোবিন্দ—দূর ম্লেচ্ছ বেটা! তোদের কাছে বস্‌লে পাপ হয়, নরকগামী হতে হয়। [প্রস্থান]

শিবনাথ বলেন,—

"আজ চাকর বেটাকে একটা মেয়ে মানুষ আন্‌বার জন্য বলেছি।"

শ্যাম—কি করে আনবে?

শিব—সে সকল বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। ছুঁড়িকে বেটাছেলের কাপড় পরিয়ে আন্‌বে, আর এদিক ওদিকে দুই পাঁচ টাকা খরচ করলেই হবে এখন।

শ্যাম—হা হা হা (উচ্চ হাস্য) আজ বাবা পাথরে পাঁচ কিল। শিবনাথবাবু, তুই বাবা বেঁচে থাক। তোর সার্থক জীবন, তুই জেলে এসেছিলি, তাই জেল পবিত্র হবে। চল আমরা একটু বেড়াইগে। [উভয়ের প্রস্থান]

আলিপুর ফৌজদারী জেলে দারোগার সঙ্গে গোপাল, তারিণী ও মধুকে দেখা যায়। তিনজনকে পরণের জামাকাপড় ছেড়ে জেলের পোষাক নেঙ্গটে পরে নিতে বলেন।

মধু—ও বাবা, ও পরলে যে একপ্রকার উলঙ্গ হয়ে থাকতে হয়। বোধ করি আধ গজ কাপড়ের তয়েরি হবে। ওযে কপ্‌নির বাবা।

দারোগা—তোরা যে ভারি বাবু দেখ্‌তে পাই। নেঙ্গটে পরতে পারবে না, সিমলার কি ফরেসডাঙ্গার ধুতি এনে তোমাদের দিতে হবে? যদি প্রাণে এত সাধ আছে, তবে চুরি কর্ত্তে গিয়েছিলে কেন? সে সময় এ সকল

মনে হয় নাই যে গবর্ণমেণ্টের জেল আছে, সেখানে পাথর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে, ঘানি টান্‌তে টান্‌তে, কল ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে মুখে রক্ত উঠতে থাকবে।

দারোগা আরো মেজাজ গরম করলে, তিনজনেই পোষাক ছেড়ে জেলের জামা পরে নেয়। অজানা শাস্তির ভয়ে গোপাল আগেই দারোগাকে জানায় তাকে যেন মেথরের কাজ ছাড়া অন্য কিছু করতে না দেওয়া হয়, ভারী কাজ সহ্য হবে না।

দারোগার অবাক হবার পালা—

"তুমি ভদ্রলোকের ছেলে দেখ্‌চি, মেথরের কাজ করবে কি করে?"

গোপাল—আমার পক্ষে সেও ভাল। কলে কিম্বা ঘানিগাছে কাজ কর্ত্তে গেলেই সদ্য সদ্য মারা যাব। মেথরের কাজ নিলে বরং একটু বিশ্রামের সময় পাব।

মধু ও তারিণীকে নিয়ে দারোগা জেলের কলঘরে যান। এ উদ্ভট জিনিষটা কি জানতে চাইলে দারোগা জানান—

"এই তোমাদের শ্রীমন্দির, এইখানে তোমাদের কিছুদিনের জন্য লীলাখেলা করতে হবে। তারপর এখান থেকে উতরে যেতে পার, তাহলে আবার অন্য কর্ম্ম পাবে। আর না হ'লেই এইখানে তোমাদের গয়া গঙ্গা বারাণসী।"

দারোগা ওদের কাজ করতে বলে চলে গেলেন। কল ঠেলার কাজ বড় কঠিন। তারিণী ভাবে যদি গোপালের মতো মেথরের কাজ নিত ভাল হতো। সকালের দিকে খানিক খেটে খুটে সারাদিন বিশ্রাম করতে পারা যায়। মধু বলে যে না বাবা, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে ওই নরকের মধ্যে যেতে পারব না।

একটু পরে ইন্সপেক্টর সাহেব আসেন, কতটা কাজ হয়েছে জানতে চান। মধু বলে যে তার জ্বর হয়েছে। সাহেব ছেঁদো কথায় ভোলে না, ওসব মিছে কথা হলো কাজ না করার ছল। মধু একটু জল খেতে চায়, জানায় তার জ্বরের কথা মিথ্যা নয়, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। ইন্সপেক্টর বলে, "নেই নেই হাম শুনেগা নেই।" তারিণী মধুর পক্ষ নিয়ে দুকথা বলে, সে জানায় যে ইংরাজদের দয়ার কথা কোথাও অবিদিত নাই, আর এই বুঝি সাহেবের দয়া হচ্ছে।

ইন্সপেক্টর—You stupid brute, আমি তোমার lecture শুনতে আসবে না। ইংরাজ লোকদের দয়া ছিল না ছিল, তোমারা বেয়া হুয়া। তুমি কাম করেগা নেই, বৈঠা বৈঠা খাগা। (চাবুকের দ্বারা প্রহার)

ইন্সপেক্টরকে তারিণীর সঙ্গে ব্যস্ত দেখে মধু তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল ঢেলে খেতে যায়, সাহেব দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসে এক ঝটকায় মধুর হাতের গ্লাস ফেলে দেয়—"কিয়া করতা? সুয়ার তোম হামকো জানতা নেই?"

মুখের জল কেড়ে নেওয়াতে মধু সাহেবকে শাপমন্যি করে। কলঘর থেকে যাবার আগে সাহেব বলে যান তিনি শীগগিরই আবার আসবেন, দু একদিনেই এদের সিধা করবেন।

আলিপুরের ফৌজদারী জেল হতে বদলী হয়ে গোপাল যশোহর জেলে আসে। এখানে পরাণ নামে অপর এক ফৌজদারী কয়েদীর সঙ্গে তাকে ঘানিতে কাজ করতে দেওয়া হয়। প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে জেলের চাপরাসি এ'দুজনকে ঘানির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধে। একটু আলগা করে বাঁধবার জন্য চাপরাসিকে গোপাল অনুরোধ করে। চাপরাসি বলে যে একটু কসে না বাঁধলে সে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে গড়াগড়ি দেবে। ম্যাজিস্ট্রেট এবার হুকুম দেন, ঘানি ঘুরাও। ঘানি চলতে শুরু করলে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলেন,

"জেল দুষ্ট লোকদের শাসনের জন্য হইয়াছে। এখানে দুষ্ট বদমায়েস লোক বিলক্ষণ শাসন হয়। God যেমন heavenয়ে শাস্তি দেন, এখানে অন্যায় কাজ করিলে Government সেইরূপ punishment দেন। আমার মতে prisoner দের বিলক্ষণ কঠিন শাস্তি দেওয়া উচিত in that case either they live or die".

একটু পরে গোপাল বলে যে সাহেব আর তো পারি না, এবার ছেড়ে দাও। গোপাল যত অনুনয় করে, সাহেব ততই না না করে। সাহেব বলে—

"বাবা, যেমন কাম করিয়েছ, এখন তার ফল পাও, আমি শীঘ্র ছাড়িব না— যখন দেখিব মাটিতে ছটফটি করিবে, যখন মুখ দিয়ে রক্ত বাহির হইবে, তখন ছাড়িয়া দিব।"

ঘানি ঘুরোবার প্রচণ্ড পরিশ্রমে, ক্লান্তিতে আর তৃষ্ণায় গোপাল সত্যসত্যই একসময় কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যায় আর রক্তবমি করে। আর পরাণ ঘেমে নেমে সর্দিগর্মিতে আক্রান্ত হয়।

ম্যাজিস্ট্রেট—"এ আদমির Consumption ছিল; তা না হলে blood পড়বে কেন? (সহাস্যে) আচ্ছা হুয়া। এরকম না হলে বাঙ্গালী লোকেরা জব্দ হয় না; জেল punishment দিবার জন্য—এখানে কয়েদি মরে যাক বেঁচে থাক, তাহাতে আমাদের কি? We must do our duty. চাপরাসি, দেখতো এ আদমি মর গিয়া কি নেই?"

চাপরাসিকে ডেকে সাহেব গোপাল আর পরাণকে জেলের হাসপাতালে পাঠাতে বলেন।

যশোহর জেলের ডাক্তার মনুষ্যত্ববোধ একেবারে হারান নাই। শাস্তির

কঠিন চাপে আধমরা কয়েদীদের শুশ্রূষা করে করে, শাসনের নামে এই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তিনি এক মত খাড়া করেছেন,—"বাবা, এ সকল দেখ্‌লে দুঃখ হয় এবং পাপও হয়! যে লোক যে পরিমাণে সহ্য করতে পারে তাকে সেইরূপ কার্যে নিযুক্ত করাই উচিত। বাবা, জেল কি মনুষ্যদিগের বধের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে? না এখানে দুষ্টলোকদিগের চরিত্র সংশোধনের জন্য হইয়াছে? এখানে চরিত্রের পরিবর্ত্তন হওয়া দূরে থাক, আরো বিকৃত হইয়া যায়। কারাগারের চতু সীমা হইতে দয়া ধর্ম্ম পলায়ন করে। এখানে একটি দয়ালু ব্যক্তি আসিলে দিন দিন নিষ্ঠুর হইয়া পড়েন, এখানে একটি ধার্ম্মিক চূড়ামণি আসিলে পাপে কলুষিত হন। কয়েদীদিগকে কোথায় সৎ উপদেশ দেওয়া হইবে, তাহা না হইয়া অন্যায় পূর্ব্বক তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিলে বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে। কল টানিয়া, ঘানি টানিয়া প্রতি বৎসর যে কত লোক প্রাণত্যাগ করে তাহার সংখ্যা করা যায় না। অপরাধী-দিগকে শাস্তি দেওয়া হউক, তাহাদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া ফল কি। আর ব্রিটিশ রাজত্বে এটি শোভাও পায় না।" গোপালের সাংঘাতিক অবস্থা দেখে ডাক্তার আপ্রাণ চেষ্টা করেন তার প্রাণ বাঁচাতে। কিন্তু বেশ কয়েকবার রক্তবমি করে গোপাল শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে।

নড়াল জেলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিধিরাম ভট্টাচার্য্য চুরির দায়ে হাজতে এসেছেন। আজকাল যজমানদের বাড়ী পুজো আচ্চা নেই, বেটারা ঘোর নাস্তিক। ব্রাহ্মণের সংসার চলে না। এই অবস্থায় গর্ভবতী স্ত্রী এটা খাব, সেটা খাব নানা আবদার করলে তিনি এক শিষ্যের বাগানের এক কাঁদি কলা গিন্নীর মুখ চেয়েই চুরি করেছিলেন। তা যজমান এমন পাষণ্ড, তাকে পুলিশের হাতে দিয়ে দিলে। ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম ব্রাহ্মণকে কুড়ি ঘা বেত মারতে হবে। ব্যবস্থা মতো প্রথমে জেলের ছোট ডাক্তার, একজন 'নেটিভ' ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করতে এলেন, নেটিভ ডাক্তারের সব দেখে শুনে মনে হোল, এ ব্রাহ্মণ আগে কখনও বেত খায়নি, এর শরীর কোমল, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণরা চাল, কলা, দুধ, দইয়ের ওপর নির্ভরশীল। এ ব্রাহ্মণ ২০ বেত সহ্য করতে পারবে না। অনেক ভেবে ছোট ডাক্তার সার্টিফিকেট দিলেন যে নিধিরাম ভট্টাচার্য্য ১০এর বেশি বেত খেতে অসমর্থ।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব শুনে রেগে আগুন। নেটিভ ডাক্তারের সুপারিশ বাতিল হয়ে গেল, জেলের বড় ডাক্তার সিভিল সার্জেনের বিরূপ রায়ে,—

"এমন বোকা পাঁটার মত চেহারা, এস্‌কো আউর দশ বেত দেনেসে কুচ হোগা নেই, আমাকে for nothing trouble দিলে কেন।"

বেতে চর্বি মাখিয়ে জমাদার বলে,—

'ঠাকুর সমান থাক, যদি এক ঘা পিছলাইয়া যায় তাহলে আর এক ঘা খাইতে হবে।"

কিন্তু দেশী কয়েদীর অবস্থা দেশী ডাক্তারই ভাল বুঝেছিলেন। দশ ঘা'র পরে, 'আর সহ্য হয় না, প্রাণ যায়, দোহাই কোম্পানি, দোহাই কুইন ভিক্টোরিয়া"—সজোরে কেঁদে উঠে ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছা যান।

আলিপুর জেল থেকে বদলি হয়ে মধু ও তারিণী বর্দ্ধমান জেলে আসে। এখানে পাথর ভাঙ্গার কাজ। তারিণীর আজকাল রোজ বিকালে জ্বর হয়। মুখে অরুচি। বর্দ্ধমানের জেলডাক্তারকে বললে গ্রাহ্য করেন না। আলিপুরে কিছু না হোক চিকিৎসা ভাল হোত। বর্দ্ধমানের জেলে পাথর ভেঙ্গে রোজ দু'থলে বোঝাই করে দিতে হবে। এখন আশংকা, তারিণীর ম্যালেরিয়া হয়েছে। বর্দ্ধমানে ম্যালেরিয়ার বদনাম আছে। জেলে খাওয়াও খুব কম দেয়। মধু বলে, "বিশেষ এখানে না খাটলে তো গবর্ণমেণ্ট বসিয়ে বসিয়ে খাওয়া দেবেনা। খাটতে হবে চারিগুণ, খেতে দেবে অর্দ্ধগুণ।" দুজনে মিলে পরামর্শ হয় ডাক্তারকে বুঝিয়ে বলে যদি একটা সার্টিফিকেট তারিণীর জন্য পাওয়া যায়, তাহলে হাসপাতালে চিকিৎসা, খাওয়া, বিশ্রাম সব মিলতে পারে। এদিকে বসে কথা বলারও তো সময় নেই। পাথরভাঙ্গা হলনা। বেত হাতে ইন্সপেক্টর আসেন।

ইন্স—তোমরা কি করচ ?

তারিণী—বাবা আমার বড় জ্বর হয়েছে, আমি মোটেই কাজ করতে পারিনা, আমার মজ্জাগত জ্বর হয়েছে।

ইন্স—(রাগান্ধ হইয়া) খাবার বেলা জ্বর হয়না, আমি ওকথা শুনতে চাইনা। (বেত্রাঘাত) কেমন এখন জ্বর সেরেচে ?

তারিণী—আমাকে আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন দেন ? একে আমি মর্ত্তে বসেছি, তার উপর আর মার কেন ?

তারিণীর উপর আরও কয়েক ঘা বেত ও বাক্যবাণ বর্ষণ করে আর মধুকেও চোখ রাঙিয়ে ইন্সপেক্টর চলে যান।

বাঁকুড়া জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মনে করেন, যে সমস্ত কয়েদীর লঘু অপরাধ তাদের কঠিন সাজা হওয়া উচিত আর যারা গুরুতর দোষে দোষী তাদের

অল্প অল্প শাস্তি দিয়ে সিধা না করে আনলে চলেনা। লেফটেনান্ট গবর্ণর অবশ্য অন্যরকম মনে করেন। বিভিন্ন জেলদর্শনে তিনি দেখেছেন সর্ব্বত্র লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিচ্ছে। এ ব্যবস্থা অযৌক্তিক তিনি মনে করেন। বাঁকুড়ার জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লেফটেনান্ট গবর্ণরের মতামত গ্রহণ করেন না। বাঁকুড়ার এই জেলে মধু বর্দ্ধমান থেকে বদলি হয়ে আসে। প্রথম দর্শনে মধুকে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রশ্ন করেন মাথায় বড় বড় চুল কেন। তারপর সাহেবের খেয়াল হয় মধুর মাথায় ক্ষৌরকাজ করাতে হবে। নাপিতের তলব হল। নাপিত এসে সাহেবের ইসারায় এমন ভাবে মধুর মাথায় ক্ষুর চালায় যে এখানে সেখানে কেটে গিয়ে মাথায় রক্ত ঝরে। সাহেব জিজ্ঞেস করে জানলেন যে মধু পুরনো কয়েদী, বেশ কয়েকটা জেল ঘুরে বর্ত্তমানে বাঁকুড়ায় এসেছে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মধুকে হাল্কা কাজ দেবেন জানিয়ে চলে যান।

পাগলা গারদের দুই কয়েদী কেষ্ট ও বেষ্ট প্রশ্ন করে আমরা কি পাগল, তাই বা কি করে হয়, আমাদের মাথা শুধু গোল, যে আমাদের পাগল বলে সেই আসলে পাগল।

দুই পাগলের খেয়াল হয় স্বদেশের উপর বক্তৃতা করবে। প্রথমে বেষ্ট আরম্ভ করে; দেশের কথা, পূর্ব্বেকার স্বচ্ছল ভারত, বর্ত্তমান দৈন্যদশা, বিদেশী শাসন সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বলে যায়। শারীরিক বলবীর্য্য, মানসিক উৎকর্ষ কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি আর ঐক্যের বিষয়ে বক্তৃতার তুবড়ি ছুটিয়ে সবশেষে বলে, "আমি পাগল বলে আমার কথা হাঁসিয়া উড়াইয়া দাও, দিলে, যদি আমার পরামর্শানুসারে চল, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদের উন্নতি হইবে। এ কথায় যদি কেহ তোমরা বিশ্বাস না যাও, তাহা হইলে আমি বাপান্ত দিব্বি করে বোল্‌তে পারি। শুন ভালই, না শুন নাচার।"

বক্তৃতা করে বেষ্টর মাথা গরম হয়ে যায়। সে জল খায় ও মাথায় জল ঢালে।

এবার কেষ্টর পালা।

কেষ্ট—হে বঙ্গবাসীগণ, তোমরা সুরাপান কর, তোমাদের পেটে প্লীহা, যকৃত, অগ্রমাস, কাঁসর, ঘণ্টা, পঞ্চপ্রদীপ রূপ পুত্র জন্মিবে, তাহারাই তোমাদিগকে পাকা আঁবের মত চক্‌লা চক্‌লা করে ছাড়িয়ে ভক্ষণ করবে। তোমাদের আর বঙ্গে মুখ দেখাইবার প্রয়োজন কি? তোমরা অকালকুষ্মাণ্ডবৎ; তোমরা বঙ্গমাতাকে অনাথিনী,—পাগলিনী,—ভিখারিণী,—কাঙ্গালিনী দেখিতেছ, তথাপি তাহার একটি কোন সদুপায় করিতেছ না।"

আরও কিছুক্ষণ বাঙ্গালীকে ধিক্কার ও সুরাপানের সপক্ষে জোর বক্তৃতা দিয়ে



সুর-বালা।



চা-কর দর্পণ

কেষ্ট থামে। অতঃপর এই দুই পাগল নৃত্য শুরু করে।

জমিদার শিববাবুর স্ত্রী সুরবালা এ পর্যন্ত কায়ক্লেশে দিনযাপন করছিলেন। শিববাবুর মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আর মাত্র ক'টা দিন বাকী। সাত পাঁচ ভেবে সুরবালা স্বামীর উদ্দেশ্যে এক চিঠি লিখলেন। চিঠিতে জানালেন যে তিনি আজও স্বামীর পথ চেয়ে অপেক্ষা করছেন, জমিদারীর আর সেই পূর্ব্ব গৌরব নেই, দাস দাসী লোকজন নেই, না থাক, সুরবালা স্বামীর পদসেবা করে ধন্য হবেন ইত্যাদি। এ চিঠি সুরবালা লোক মারফৎ পাঠালেন আর বলে দিলেন যেন বাবুর একটা চিঠিও নিয়ে আসেন।

শ্রীঘর বাস করেও শিববাবুর চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি লিখলেন যে, আমার বিরজা বেঁচে থাকলেই সুখী হবো, তুমি মর আর বাঁচ আমার তা'তে কিছু যায় আসে না। এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে এই নিদারুণ পত্রাঘাত। সহ্যশীলা সুরবালার সংযমের বাঁধ ভেঙেগ গেল। তিনি ছুরির আঘাতে নিজের প্রাণ নেন।

ঠিক তার পরদিনই শিববাবু জেল থেকে খালাস পান। প্রথমেই ছুটলেন বিরজার বাড়ী। কিন্তু আশানুরূপ অভ্যর্থনা হল না। বিরজা অপ্রসন্ন মুখে বলে যে ছোট রাজা বাহাদুর এখনই আসবেন, তুমি এই বেলা বাড়ী যাও। এতোদিনে শিববাবুর চৈতন্যোদয় হলো, এই বেশ্যার জন্য তিনি কী না করেছেন। এরই জন্য তো তিনি পথের ভিখারী হয়েছেন। আর আজ এই ব্যবহার। পৈতৃক বাড়ীতে ফিরে এলেন।

কিন্তু এ আঁধার পুরীতে কি মানবজন নেই ? কোথা থেকে মধু এসে উদয় হয়, সেও আজই ছাড়া পেয়েছে কিনা। মধু জানায় তারিণী ও গোপাল দুজনই মারা গেছে, গোপাল রক্তবমি করে আর তারিণী বর্দ্ধমানে ম্যালেরিয়ায় ভুগে। আরও একথা সেকথার পরে দুজনের মধ্যে ঠিক হয়, বাড়ী ঘর বেচে সপরিবারে কাশীবাসী হবেন।

মধু বিদায় নিলে, শিববাবু ভিতর বাড়ীতে সুরবালার খোঁজে যান। দেখতে পেলেন তারই চিঠি মুঠিতে ধরে প্রাণহীন দেহে সুরবালা পড়ে আছে, হাতের কাছে ছুরি। এক তীব্র অনুশোচনায় মনে হোল সুরবালার মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী। সুরবালার ছুরি তুলে নিয়ে নিজের বুকে আমূল বসিয়ে দেন।

জমীদার দর্পণ

নাটক।

শ্রীমীর মশারুরাফ হোসেন কর্ত্তৃক
প্রণীত।

কলিকাতা।

সিমুলীয়া ২০১ নং করন্ওয়ালিস ষ্ট্রীট
মধ্যস্থ-যন্ত্রে
শ্রীরামসর্ব্বস্ব চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

১২৭৯ বঙ্গাব্দা।

মূল্য ।।০ আনা।   *Price eight Annas.*

জমীদার দর্পণ নাটক

'বিষাদ-সিন্ধুর' রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেনের নাম বাংলা সাহিত্যে সোনার অক্ষরে লেখা, কিন্তু 'গৌরী তটবাসী মশা'কে[১] কজন পাঠক জানেন? মশাররফ হোসেনের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই যেমন 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী', 'আমার জীবনী', 'জমীদার-দর্পণ', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' নিয়ে খুব একটা আলোচনা তেমন হয়নি। জমীদার-দর্পণের মৌলিকত্ব এই যে মুসলমান চরিত্র নিয়ে এধরনের সামাজিক নাটক বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। নাটকে নীলদর্পণের প্রভাব কিছু কিছু আছে।

ভূমিকায় লেখক জানাচ্ছেন,—"জমীদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয়-স্বজন সকলেই জমীদার, সুতরাং জমীদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না।" অভিজ্ঞতালব্ধ মালমশলা নিয়ে লেখা নাটক জীবন্ত হয়েছে এবং লেখক সাহসের সঙ্গে লম্পট জমিদারের চরিত্র এঁকেছেন, কিন্তু নাটক পুরোপুরি বাস্তবানুগ হয়নি। প্রজা এখানে অসহায় শিকার, পড়ে পড়ে শুধু মারই খেয়েছে। কিন্তু ইতিহাসও কি তাই বলে? এ বই যখন প্রকাশ হয় তার অনেক আগে থেকে আঠারো শতাব্দী থেকেই বাংলায় কৃষকদের অসন্তোষ মাথাচাড়া দিতে থাকে।

ইংরাজ তার সাম্রাজ্যের তল্পিবাহী হিসেবে অভিজাত ও জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব চেয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে অঢেল কাঁচামাল পেতে হলে জমিদারী ব্যবস্থা অপরিহার্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদাররা কিন্তু পুণ্যাহ ও অন্যান্য সামাজিক কারণে প্রজাদের ওপর অন্যায় শোষণ, আবওয়াবের অর্থ

(১) জলধর সেন 'কাঙ্গাল হরিনাথ' গ্রন্থে, প্রথম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখছেন, "তাঁহার বিষাদ-সিন্ধু তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। মীর মশারফ কাঙ্গালের প্রকাশিত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকার লেখক ছিলেন। আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম তখন প্রতি সপ্তাহে মীর সাহেবের লেখা পড়িবার জন্য যে কত আগ্রহ হইত তাহা বলিতে পারিনা। তিনি প্রবন্ধের নিম্নে নিজের নাম দিতেন না,—লিখিতেন "গৌরীতটবাসী মশা"। এই 'মশা'র লিখিত গদ্য-পদ্য সন্দর্ভ পাঠ করিয়া আমরা যে কত উপকৃত হইয়াছি তাহা বলিতে পারিনা। তাঁহার 'গৌরী সেতু', তাঁহার 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', তাঁহার 'গাজি মিঞার বস্তানী' আর তাঁহার অমূল্য রত্ন 'বিষাদ-সিন্ধু' যে আমরা কতবার পড়িয়াছি তাহার সংখ্যা করা যায়না।"

আদায় করতে থাকে যার ফলে বাংলার নানা অঞ্চলে কৃষকদের বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। উনিশ শতকে ময়মনসিংহে কৃষকবিদ্রোহ ও গারোবিদ্রোহ, ত্রিপুরায় কৃষক আন্দোলন, সন্দীপের কৃষক সংগ্রাম ও সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে। সন্দীপের জমির লড়াই নিয়ে মুখে মুখে ছড়া গাওয়া হতো। মিঃ গ্রিয়ার্সন বাংলার কথ্য ভাষার নমুনা সংগ্রহকালে সন্দীপ থেকে যে ছড়া আহরণ করেছেন তার মধ্যে সেখানকার গণসংগ্রামের আভাস পাওয়া যায় [Linguistic Survey of India, vol. 5, pt. 1]। সন্দীপের ছড়াটি নিম্নরূপ,—

১। কির হাইচানির বাপ্ আইলানা ক্যা কাইল বৈটহে।
২। * * * আমিন ক দিন ফিরব চহে চহে ॥
৩। গোলার গোলার মাপুক্ গই যাই চিন্ দিতাম্ ন জমিনে।
৪। বেল্লিশ সনের চিডাদি আর কিও হারে আমিনে ॥
৫। মাইরত গেলে বাড়ীতে দাইরা যাইমুম্ তহাতে।
৬। আংতে কই দিব হেতে বাড়ীত্ নাই কইলকাত্তা থাহে ॥
৭। হুইন্‌চানি বাইছাবেরা চান্ মিয়ার যে কই হাডাইছে।
৮। লাল বলদ লাগাই দিউম যেতের বাড়ীত্ আমিন্ আছে ॥
৯। যুম্মার নমাজ পইর্‌তে হুইনলাম্ মজিদে ছল্লা।
১০। জরীপ্ কইরতাম দিতাম্ ন বাই যায় যাবে কেল্লা ॥
১১। জমার পর্ চান্দা দর্ আন্টে আনা তোলা পর্।
১১। চাটিগ্রামের হুইনলাম্ খবর গোলজানের বাপ্ বোন্ডে গেছে ॥

ভাবার্থ—

১। কি গো হাইচানির বাপ কাল বৈঠকে এলে না কেন।
২। * * * আমিন ক'দিন চকে চকে ঘুরবে ॥
৩। ক্ষেত খামারে জরিপ করুক, জমিতে চিহ্ন দেব না।
৪। বিয়াল্লিশ সনের কাগজ দিয়ে আমিন আর কতটুকু করবে ॥
৫। মারতে গেলে বাড়ীতে ধেয়ে তফাতে যাব।
৬। আওরতকে শিখিয়ে দেব এখানে বাড়ীতে নাই, কলকাতা থাকে বলতে ॥
৭। শুনেছ ভাই সাহেবরা চান্দ মিয়া যা বলে পাঠিয়েছে।
৮। লাল বলদ লাগিয়ে দেব যার বাড়ীতে আমিন আছে ॥
৯। শুক্রবার নমাজের পর মসজিদে শলা পরামর্শ শুনলাম।
১০। জরিপ করতে দেবনা, ভাই যায় যাবে মাথা ॥
১১। খাজনার পর টাকা প্রতি আট আনা চাঁদা।
১২। চট্টগ্রামের খবর শুনলাম গোলজানের বাপ বোর্ডে গেছে ॥

বাংলার নাটকে ও গল্পে গেঁয়ো চাষার গোয়ার্তুমি আর সাহস স্থান পেয়েছে। নীলদর্পণের তোরাপ আর রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র গোবিন্দ সামন্ত (ইংরাজী)

গ্রন্থের কাল্পোমানিক অনবদ্য সৃষ্টি। এদিক দিয়ে মীর মশাররফ হোসেন আমাদের হতাশ করেছেন।

এটা নজর করার মতো যে কৃষক আন্দোলন লক্ষ্য করে বঙ্কিমচন্দ্র জমীদার দর্পণ সমালোচনা কালে লিখছেন (বঙ্গদর্শন, ১২৮০ ভাদ্র সংখ্যা)—"এই দর্পণে জমীদারের যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, তাহা বিকৃত কি প্রকৃত, সে বিষয়ে আমরা কিছুমাত্র আলোচনা করিতে চাহিনা। এ তাহার সময় নহে। বঙ্গদর্শনের জন্মাবধি এই পত্র প্রজার হিতৈষী এবং প্রজার হিতকামনা আমরা ত্যাগ করিব না। কিন্তু আমরা পাবনা জেলায় প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত ও বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি নিষ্প্রয়োজনীয়। আমরা পরামর্শ দিই যে গ্রন্থকারের এ সময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্ত্তব্য।"

পাবনার যে কৃষক বিদ্রোহের কথা বঙ্কিম উল্লেখ করেছেন সেই বিদ্রোহ কিন্তু বাংলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে প্রখ্যাত ঘটনা। ১৮৭২-৭৩ সালে বর্ত্তমান বাংলাদেশের বগুড়া ও পাবনা জেলায় জমিদার কৃষক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। নাটোরের জমিদারী ভেঙে যাওয়ায় ইউসুফশাহী পরগণা পাঁচজন জমিদার কিনে নেন। নতুন মালিক হয়ে জমিদাররা বাইশ হাত নলের জায়গায় বার হাত নল দিয়ে জমি মেপে অল্প আয়তনের অনেক ভূমিস্বত্ব বার করলেন। খাজনার হার যদিও আগের হারেই ধার্য্য হল। অসন্তুষ্ট প্রজারা প্রথমে শান্তিপূর্ণ পথে দাবী জানাতে থাকে। কিন্তু জমিদাররা জিদ ধরলে, প্রজারাও ক্ষেপে যায়। অবস্থা এতদূর গড়ায় যে গবর্নমেন্ট Agrarian Dispute Act, 1876 পাশ করে খাজনাবৃদ্ধি ও বকেয়া খাজনার মামলা দেওয়ানী থেকে সাময়িকভাবে রেভিনিউ আদালতে পাঠালেন। কিন্তু প্রজাদের দাবী দাওয়ার কোন মীমাংসা হ'ল না। ১৮৭৯ সালে Rent Commission নিযুক্ত হয়ে জমিদার ও রায়ত সম্পর্কের সমস্ত আইন পর্য্যালোচনা শুরু করেন। এই কমিশনের সুপারিশে প্রজাস্বত্ব আইন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পাশ হ'ল।

'বঙ্গদেশের কৃষক' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে কৃষকদের সপক্ষে সহানুভূতি আছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সারা দেশের অর্থনৈতিক ও ভূমিব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করেছেন এবং জমিদারী ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি সমালোচনা করে বলেছেন 'প্রজাওয়ারি' বন্দোবস্ত হলে দেশের দুচারজন অতি ধনীর পরিবর্ত্তে ছয় কোটি সুখী প্রজা দেখতে পাওয়া যেত। গত শতাব্দীর প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী হিসেবে তিনি অন্যান্য বুদ্ধিজীবী, সরকার, জমিদার ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের

বুদ্ধি, বিবেচনা, বিবেকের কাছে আপীল করেছেন। কিন্তু পদানত দেশে রাজশক্তিপুষ্ট জমিদারদের বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুর ও চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ শ্রেণীসংগ্রামের ফলে বাংলার মেদিনী কাঁপলে দেশের অবস্থা কোন চেহারা নেবে কল্পনা করে বঙ্কিম খুসী হননি। বঙ্গদর্শনে (১২৭৯, ভাদ্র সংখ্যায়) তিনি লিখছেন—"দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের মঙ্গল নাই।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে শুধু বঙ্কিমই ন'ন, বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশ বাংলার রায়তের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা চিন্তা করেছিলেন। কলকাতার সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' ও কুমারখালির মাসিকপত্র 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' এ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় স্তম্ভে আলোচনা করে। Report on Native Papers হ'তে ঐ দুই পত্রিকার মন্তব্য (ইংরেজী অনুবাদ) আলোচ্য নাটকের শেষে দেওয়া হ'ল।

জমীদার-দর্পণের শেষ পর্যায়ে আদালতের দৃশ্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য—"আমরা প্রজা, জমীদারের কথা বলিতে চাহিনা, কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে সেসন আদালতের চিত্রটি অতি পরিপাটি হইয়াছে।" মামলাবাজ জমীদার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র যা বলেছেন তা হোলো—

"জমীদার ধনী, আদালতের খেলা তিনি খেলিতে পারেন। দোষে হউক, বিনা দোষে হউক, তিনি ইচ্ছা করিলেই কৃষককে আদালতে লইয়া উপস্থিত করেন। তথায় ধনবানেরই জয়, সুতরাং কৃষকের দুর্দ্দশা ঘটে। অতএব আইন আদালত কৃষককে পীড়িত করিবার ধনবানের হস্তে আর একটি উপায় মাত্র।" (বঙ্গদেশের কৃষক, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, আইন সংখ্যা)।

আলোচ্য নাটকের বিচার দৃশ্যে দেখা যায় যে দুইজন সাক্ষী জিতু মোল্লা ও হরিদাস বৈরাগী জমিদারের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে। এরা বলে যে ফরিয়াদীই তার স্ত্রীকে প্রহার করে মারে। ডাক্তার রিপোর্ট দেন যে মৃতার অধোদেশ হতে রক্তক্ষরণ হয়েছিল এবং গলার নীচে রক্ত জমা হয়েছিল। মস্তিষ্কের কোন অসুখে স্ত্রী লোকটির মৃত্যু হয় বলে ডাক্তার মনে করেন আর জুরীরাও তাই মেনে নিয়ে রায় দেন আসামী নির্দোষ।

বাস্তবিক গত শতকের বিচার ব্যবস্থা কাজীর বিচার অপেক্ষা বেশী উন্নত ছিল না। একদিকে যেমন ঘুষের জোরে মিথ্যা সাক্ষ্যে দিনকে রাত, রাতকে দিন করা যেত, অন্যদিকে খুনের মামলার আসামী অর্থশালী অথবা শ্বেতাঙ্গ হলে, মস্তিষ্কের

দোষ নয়তো প্লীহার অসুখ মৃত্যুর কারণ বলে রায় দিতে জুরীদের দ্বিধা হতো না। গত শতাব্দীর আদালতে এটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। এ নিয়ে কাগজে কাগজে কম লেখা হয়নি। কয়েকটি চিঠি Report on Native Pepers হ'তে তুলে পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

জমিদার হায়ওয়ান আলী অধীনস্থ প্রজা আবু মোল্লার সুন্দরী স্ত্রী নুরন্নেহাকে দেখে অবধি তাকে হাতে পাবার জন্য অস্থির। একদল মোসাহেবের সঙ্গে দিনরাত কুপরামর্শ চলতে থাকে। গহনা ও অর্থের লোভ দেখিয়ে নুরন্নেহাকে বশীভূত করতে জমিদার অনেকদিন ধরে চেষ্টা করে এসেছেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। হায়ওয়ান আলী এবার এক বাঁকা পথ ধরলেন। কোনো ছুতোয় আবুমোল্লাকে কাছারীতে ধরে এনে বেশ কিছু চোটপাট ও মার ধোর করা হবে। ওদিকে কৃষ্ণমণি বৈষ্ণবীকে নুরন্নেহার কাছে খবর দিয়ে পাঠাতে হবে, যে তুমি যদি আজ বৈঠকখানায় সন্ধ্যের পর গিয়ে জমিদারের সঙ্গে দেখা কর তাহলে সমস্ত গোল চুকে যায়।

জমিদারের হুকুমে জামাল প্রভৃতি পাঁচজন পাইক ছোটে আবুমোল্লাকে ধরে আনতে। দাপট দেখাতে পাইকই বা কম কিসে? গলা ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাবার ভয় দেখিয়ে, আগে আবুমোল্লার কাছ থেকে 'কোমর খোলাই' বা পান খাবার খরচ হিসেবে পাঁচ টাকা আদায় করে। তাতেও কী রক্ষে আছে! ঘর থেকে তাকে গা-জড়াবার চাদরখানা পর্যন্ত আনতে দেওয়া হয় না। জমিদারের হুকুম, যেমন অবস্থায় আছে, সে ভাবেই ধরে আনতে হবে। বাংলার চিরন্তন চাষী আক্ষেপ করে,—

"আমি তো কোন অপরাধ করিনি তবে এত জুলুম কেন? সকলই আমার নসীবের দোষ, আমি কোন কথার মধ্যে যাইনে, কোন হের ফের বুঝিনে, কেউ চড়া কথা বল্লে কি দুঘা মাল্লেও পীঠে সই। দোষ কল্লেই সাজা হয়, তবে যখন সাচ্চা আছি তখন সকলি নসীবের! একালে যে যত সোজা হয়ে থাকে তার পাছে কাটি দিতে কেউ রেয়াত করেনা। আমি ভাল জানিনে, মন্দ জানিনে, আমার ওপর পাঁচজন প্যায়দা! বাবা! কাকের ওপর কামানের আওয়াজ!"

জমিদারের বৈঠকখানায় তাসের আড্ডায় আবুমোল্লা উপস্থিত হলে, হায়ওয়ান আলী কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করেন,—

"অরে আবু। তুই জানিস আমি তোর সব কর্ত্তে পারি? তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি?

আবু—হুজুর ! আপনি সব কর্ত্তে পারেন ; আপনি রাজা ;—জান জাহানের মালিক ; মাল্লেও মার্ত্তে পারেন, রাখলেও রাখতে পারেন ।

হায়ওয়ান—তোর এত দূর আস্পর্দ্ধা ? আমার সঙ্গে কৌশল ? তুই ভেবেছিস কি ? আমি তোকে সোজা ক'র্ব্বোই ক'র্ব্বো ! কাবার পঞ্চাশ—জামাল ! হারামজাদ্ সে পচাশ রোপেয়া জর্‌বানা আদা কর্ ।"

কোনো কারণ দর্শান নেই, বিনা অভিযোগে জমিদারের হুকুম হয় আবুকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হবে। তার ওপর পেয়াদার ওপর আদেশ হয় আবুর মাথার ওপর খান কতক ইট চাপিয়ে দিতে। এভাবে নাজেহাল অবস্থায় খানিকক্ষণ থেকে আবুমোল্লা জমিদারের অসাক্ষাতে তার মোসাহেবকে অনুনয় করে মাথার ইট নামাবার ব্যবস্থা করতে, বিনিময়ে সে মোসাহেবকে ভবিষ্যতে টাকা পয়সা দিয়ে খুসী করবে। পারিষদের চেষ্টায় আবুর দৈহিক শাস্তি লাঘব হয় কিন্তু জমিদারের দেউড়িতে তাকে সন্ধ্যে পর্যন্ত আটক থাকতে হয়।

এরপরে হায়ওয়ানের দূতীগিরি করতে বৈষ্ণবী কৃষ্ণমণি আবুমোল্লার বাড়ী ভিক্ষের ছল করে নুরন্নেহার সামনে উপস্থিত হয়। গোপনে জানায় যে জমিদার তার জন্য পাগল, আজ রাত্রে যদি নুরন্নেহা তার বৈঠকখানায় যেতে পারে তাহলে সব গোলযোগ চুকে যায়, উপরন্তু জরিমানার দ্বিগুণ টাকা ঘরে আনতে পারবে।

জমিদারের প্রস্তাব ঘৃণার সংগে নুরন্নেহা প্রত্যাখ্যান করে, —

"আমি বৈঠকখানায় যাব মাসি ? এতকাল পরে তুমি আমায় এই কথা বল্লে ? তাঁর কি এমন কর্ম্ম করা উচিত ? অধীনে আছি বলেই কি এমন অধর্ম্মের কাজ কর্ব্বেন ? এই কি তাঁর ধর্ম্ম ? এ বড় দারুন কথা, আমা হতে এমন কর্ম্ম হবে না। তিনি যা করুন, তা করুন, প্রাণ থাকতে আমা হতে এমন কুকাজ হবে না—আমি বৈঠকখানায় কখন যেতে পার্ব্বো না। যদি বড় পেড়াপীড়ি হয় তবে এই রাত্রেই গলায় দাঁড় দিয়ে মর্ব্বো।"

দূতি বিদেয় করলেও নুরন্নেহার ভয় যায় না। ননদিনী আমিরণকে ডেকে বলে, "আজ মাসাবধি লোকের দ্বারায় কত রকমের কথার ঠারে কত লোভ দেখাচ্ছে। খাঁ সাহেবও বিকেলে সন্ধ্যার পর মিছি মিছি শীকারের ছুতো করে বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি আজ সকলি বুঝিছি। আমি যা যা বলিছি, বোধ হয় কৃষ্ণমণি তার দ্বিগুণ বাড়িয়ে বলবে, আমার কি হবে ? আমি কোথা পালাব ? এখনই যদি আমাকে ধরে নিয়ে যায়, তবে আমার কি দশা হবে ? কার কাছে গে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাব ? এমন কি কেউ নেই ?"

সেদিন রাতে জমিদারের জন কয় সর্দ্দার নুরন্নেহার বাড়ীর ধারে কাছে লুকিয়ে

থাকে। অনেকক্ষণ পরে কানে আসে মেয়ে মানুষের গলা—একটু দাঁড়াও আমি বা'র থেকে আসি। তারপরে নুরন্নেহা বাইরে আসে। আর পলকের মধ্যে জমিদারের সর্দ্দাররা তাকে তুলে নিয়ে উধাও হয় একেবারে জমিদারের আস্তানায়।

পরবর্ত্তী অধ্যায় নারী লাঞ্ছনার এক চরম ইতিহাস। সপারিষদ হায়ওয়ানের সামনে নুরন্নেহা বলির পাঁঠার মত কাঁপতে থাকে।

হায়ওয়ান—কেমন? এখন তো হাতে পড়েছ! এখন আর কে রক্ষা কর্ব্বে? বাড়ীতে বসে বসে যে বলেছিলে, ও'র উপরে কি আর হাকিম নাই? কৈ কাকেও যে দেখতে পাই নে! তোমার সে বাবারা কোথায়? এখন দেখে না! এসে রক্ষা করে না! সতী সতী করে বড় ঢুলে পড়তে! এখন সতীত্ব কোথায় থাকবে? আমার হাতে তো পড়তেই হলো, তবে আর এত ভিবকুটি কল্লে কেন? আমার ক্ষমতা আছে কিনা তাও তো দেখ্‌লে? আরো এখনি দেখ্‌তে পাবে জান্‌! এত দিন আমার জান্‌কে যে এত হায়রাণ করেছ জান। এস তার প্রতিফল দিই।

নুরন্নেহা—(সকরুণে) আপনি সব ক'র্ত্তে পারেন! আমি আপনার প্রজা, আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ! জাতমান রক্ষা ক'র্ত্তেও আপনি, প্রাণ রক্ষা ক'র্ত্তেও আপনি। আমি আপনার মেয়ে। আপনি আমার বাপ! (রোদন) আপনিই আমার জাত্‌কুল রক্ষা ক'র্ব্বেন!

হায়ওয়ান—এই যে তাই ক'চ্ছি। (নুরন্নেহাকে টানিয়া লইতে উদ্যত)

নুরন্নেহা—(মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া সরোদনে) আমায় ছেড়ে দিন! গলায় কাপড় দে ব'ল্‌ছি আমায় ছেড়ে দিন! আমি আপনার মেয়ে! আপনি আমার বাপ। আমার কাপড় অসামাল হলো, কাপড় পরি, ছেড়ে দিন।

হায়ওয়ান—(রুমাল দ্বারা মুখ বন্ধন করিতে করিতে) কাপড় নেওয়াচ্ছি।

নুরন্নেহা—(গোঙ্গাইতে গোঙ্গাইতে)পায় ধ—ব—আমা—

হায়ওয়ান—(মোসাহেবগণ প্রতি) আপনারা দুইজন হারামজাদীর পা ধরুন, আমি হাত ধরে টেনে নিচ্ছি। [প্রস্থান]

জামাল সর্দ্দার ও একজন মোসাহেব নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে যে কাজটা অত্যন্ত গর্হিত হচ্ছে, তার ওপর আবুমোল্লার স্ত্রী গর্ভবতী। জমিদারের এখন ন্যায় অন্যায় জ্ঞান নেই। অধীনস্থ দাস হয়ে জামাল সর্দ্দারই বা কি করবে। বাবু ধরে আনতে হুকুম করলে, না বলবে কি উপায়ে?

একটু পরে ফিরে এসে হায়ওয়ান আলী জামাল সর্দ্দারকে বলেন, যে তিনি

সর্দারের কাজে খুসী হয়েছেন তাই তাকেও তিনি খুসী করবেন। জামাল আবার আইন আদালতকে ভয় করে। জমিদার বলেন,—

"তার জন্য ভয় কি? মকদ্দমা আছে, মামলা আছে, আমি আছি। যতটাকা লাগে বে পরওয়া, জান কবুল।"

জামাল—হুজুর সে যথার্থ। কিন্তু আমরা গরিব সেটা যেন মনে থাকে।

এক মোসাহেব ছুটে আসে। নুরন্নেহা বুঝি বাঁচেনা, কেমন করছে। জমিদার ও মোসাহেব ছুটে যান অন্য ঘরে ও একটু পরে ধরাধরি করে তাকে নিয়ে আসেন।

হায়ওয়ান—যথার্থই কি মরে, না ওর সব মিছে? ও কিছুই নয়, ও একটা কাপ্ ক'রে রয়েছে।

মোসাহেব—না, না, দেখুন যথার্থই গর্ভবতী ছিল। ঐ দেখুন তলপেট তোল-পাড় ক'চ্ছে।

হায়ওয়ান—(নিকটে যাইয়া সবিস্ময়ে) যথার্থই গর্ভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তলপেট অত নড়ে কেন?

নিস্তেজ, অবসন্ন নুরন্নেহার তখন মুমূর্ষু অবস্থা। শেষবারের মতো সে আক্ষেপ করে যে সতীত্ব রক্ষা হলনা, স্বামীর সঙ্গে জন্মের মতো বিদায়ের আগে একবার দেখা হল না, জাত গেল, দেশজুড়ে কলঙ্ক হল, শুধু নিজের প্রাণই নয়, ভাবী সন্তানের প্রাণও নষ্ট হোল, খোদা এর বিচার করবেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে।

ঘটনা এবার দ্রুত অন্যদিকে মোড় নেয়। লাশ সরাতে না পারলে কারুরই স্বস্তি নেই। খবর পেয়ে বড়কর্ত্তা, হায়ওয়ানের বড়ভাই সিরাজ আলী ঘুম ভেঙ্গে ছুটে আসেন।

সিরাজ—আরে পাজিরে! এমন কাজ ক'ল্লি? একেবারে হাবুখাঁর নাম ডুবালি? তোর কি কাণ্ডজ্ঞান নাই? চিরকালই কি তোর এইভাবে গেল? লক্ষ্মীছাড়া। আর কি মরবার জায়গা ছিল না? এমন কাজ কি কর্ত্তে হয়? যত গোঁয়ার একঠাঁই জুটে এই কাজ ক'চ্ছে। এখন মুখে কথা নাই। তোর জন্যে সর্ব্বনাশ হবে। পূর্ব্বপুরুষের নাম গেল, তুই কি একেবারেই পাগল হয়েচিস? এখন আর কি বলবো? তোরে এ বুদ্ধি কে দিলে?

সিরাজ আলী অনেকক্ষণ হেঁটমুখে চিন্তা করেন, বাঁচবার উপায় খোঁজেন। তাঁর নির্দ্দেশে ভোর হবার আগেই লাশ নিয়ে আবুমোল্লার বাড়ীর কাছে খেজুর বাগানে ফেলে আসা হয়।

পরদিন লোক জানাজানি হতে দেরী হয় না। খবর পেয়ে থানা হতে কনষ্টেবল, ইন্সপেক্টর ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। ইন্সপেক্টরের নির্দ্দেশে লাশ থানায় চালান হয়।

এরপর প্রকাশ্য আদালতে বিচারের নামে বেশ কিছুদিন প্রহসন চলে। ভেতরে ভেতরে হায়ওয়ান আলীর টাকা কাজ করতে থাকে। আসামীর উকিল বলে যে, "কোনো সাক্ষীতেই এমন স্পষ্ট প্রমাণ দেয় নাই যে আমার মক্কেল নুরন্নেহা আওরতকে জবরান বলাৎকার করেছেন, আর সেই বলাৎকারে তার প্রাণ বিয়োগ হয়েছে, ফরিয়াদি আবু মোল্লা বড় ফেরেববাজ।"

দারোগা যে সুদীর্ঘ রিপোর্ট দেন তার মর্ম্মার্থ এই যে, ১নং আসামী জমিদার হায়ওয়ান আলীর সঙ্গে ঐ গ্রামের আংশিক তালুকদার কাতল মারিয়া নিবাসী লালবিহারী সাহার বিবাদ হওয়ায় এবং খাঁদের অধীনে থেকেও আবুমোল্লা সাহাদের অনুগত হওয়ায়, আসামী বাদীকে নির্য্যাতনের উদ্দেশ্যে ভৃত্য ও সাঙ্গ পাঙ্গ দিয়ে আবুমোল্লার বাড়ীতে হামলা করান ও বাদীর স্ত্রীর উপর নানা অত্যাচার করে হত্যা করান।

সাক্ষী জিতু মোল্লা ও হরিদাস বৈরাগী আদালতে সাক্ষ্য দেয় যে আবুমোল্লাই স্ত্রীকে প্রহার করে মারে। কিন্তু সাহেব ডাক্তার কানিংহাম যে রিপোর্ট দেন তারই ফলে মামলায় আবুমোল্লার একেবারে ভরাডুবি। ডাক্তার জানান যে মৃতার অধোদেশ হতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল, আর গলায় চামড়ার নীচে রক্ত জমা হয়েছিল, এছাড়া কোনো অত্যাচারের চিহ্ন দেহে ছিল না, ডাক্তার মনে করেন মস্তিষ্কের কোনো গুরুতর অসুখে স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয়।

ফরিয়াদীর উকীলের প্রশ্নে ডাক্তার জানান ঐ লক্ষণগুলি কেন 'ব্রেণ ডিজিস' প্রমাণ করবে না? জ্বরের জন্য যদি প্লীহা বাড়তে পারে তাহলে রক্তদোষও মস্তিষ্কের পীড়া ঘটাতে পারে।

এরপরে জুরীরা রায় দেন আসামী নির্দ্দোষ।

মোকদ্দমা জিতে হায়ওয়ান আলী আবুমোল্লার বাড়ীঘর ভেঙ্গে ফেলে। আর আবুমোল্লা পথে গিয়ে দাঁড়ায়।

গায়কোয়াড়ের ভাগ্যবিড়ম্বনা ও বাংলা প্রহসন

১৮৭৫ সালে সুদূর বরোদায় দেশীয় রাজন্যের ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে আসে। কুশাসনের অভিযোগে গায়কোয়াড় মলহর রাও রাজতক্ত হারালেন। বিচার কমিশন বসলো। ইংরেজ ব্যারিষ্টার ব্যালান্টিন তুখোড় যুক্তিজালে[১] মহারাজার বিরুদ্ধে রেসিডেন্ট ফেয়ার সাহেবকে বিষপ্রয়োগের অভিযোগ সাজানো মিথ্যা বলে প্রমাণ করে বললেন,—

'I have said, my Lord, that the mass of evidence, the character of it, and the nature and character of the witnesses, is such as to be almost without a parallel. I remember no case of modern days bearing the slightest similarity to it— I have not the slightest acquaintance with the proceedings of courts of justice in this country. And for ought that I know, infamy may exist elsewhere, and cases of infamy may have been discovered before a tribunal like this. But in my time and in my knowledge of other tribunals with which I am familiar I have known none of the same character—I have known none bearing even a similarity to it, and I confess it is with wonder and astonishment I find that this unfortunate and unhappy Prince has had his liberty taken away and been followed by slanders of the foulest kind and has been heaped with infamy of the most extraordinary kind from quarters where he would feel it most. And when I come to look at the evidence, I find nothing but a mass of groundless lies of filthy perjury of abominable invention."

বিষপ্রয়োগ সম্বন্ধে বিচার কমিশনের দ্বিধাবিভক্ত রায়ে ভারত সরকার কোন

(১) East India (Baroda No. 7) : Proceedings of the Commission appointed to investigate charges against the Gaekwar, 1875, p. 77.

সিদ্ধান্তে পেঁছতে না পারলেও রাজ্যশাসনে অযোগ্যতার অভিযোগে মলহর রাও গদীচ্যুত হন। মাদ্রাজ প্রদেশে তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের স্থানান্তর ও থাকা বাবদ গভর্ণমেন্ট এক ভাতার ব্যবস্থা করেন। আর ভারতবর্ষের এ প্রান্তে আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন বাঙ্গালী লেখক তীব্র স্বাদেশিকতাবোধে চারটি 'গুইকওয়ার নাটক' উপহার দেন। বাংলার ছোটলাটের কোপদৃষ্টি এই নাটকগুলির উপরে পড়ে। লেফটেনান্ট গবর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল তাঁর বিবৃতিতে[১] লেখেন,—

"Last year, 1875, a play was written called 'The trial of the Gaekwar' which travestied and distorted the judicial and political proceedings at Baroda". ওদিকে বড়লাট এর আগেই পত্রযোগে[২] বিলাতে সেক্রেটারী অফ স্টেটকে লেখেন,—"The circumstances connected with the recent trial of the Gaekwar of Baroda has been dramatised and represented in Calcutta; and although we are informed by the Lieutenant-Governor of Bengal that this performance has not attracted particular atttention, it is obvious that at a time of political excitement representations of this class might give rise to serious consequences." নির্ভর-যোগ্য সূত্রে যতদূর জানা যায়[৩] ১৮৭৫ সালে বাংলা ভাষায় মোট চারটি রাজনৈতিক প্রহসন বরোদার পটভূমিকায় লেখা হয়েছিল। এদের মধ্যে তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। এ তিনটির সার সংকলন এ বইতে যুক্ত হ'ল। বরোদার রাজনৈতিক ব্যাপারে সারা ভারত যখন বিক্ষুব্ধ, বিভিন্ন পত্রিকায় স্বভাবতই সরকারী নীতির সমালোচনা প্রকাশ হতে থাকে। অমৃত-বাজার পত্রিকার দুটি চিঠির ইংরাজী অনুবাদ Pall Mall Gazette ১৮৭৫ সালের ৩রা মে ছাপে। ঐ চিঠি দুটি সেক্রেটারী অফ স্টেটের নজরে আসে। বলাবাহুল্য এদের তীব্র জ্বালাময়ী ভাষা তাঁর মনঃপূত হয় না। ভারত সরকারকে এক নির্দ্দেশনামায়[৪] তিনি ভারতীয় পিনাল কোডের, ১৮৭০ সাল

(১) Home Department Proceedings, Public, August 1876 (Minute by the Lieutenant-Governor of Bengal dated 13th June 1876)

(২) Home Department Proceedings, Public, No. 45, dated Simla, the 9th August 1875

(৩) Appendix to the Calcutta Gazette—Bengal Library Catalogue of Books.

(৪) Political Despatch to India, No. 53, dated 6th May 1875.

২৭ নং ধারা অনুসারে অবমাননাকর লেখার দায়ে এ সম্বন্ধে সরকারী হস্তক্ষেপ করা যায় কিনা জানতে চান। এই নির্দ্দেশনামার প্রতিলিপি নাটক তিনটির শেষে যুক্ত হ'ল।

বরোদার রাজনৈতিক সংকট ও পশ্চাৎপট—

১৮৪৭ সালে বরোদার রাজা সায়াজীরাও গায়কোয়াড়ের মৃত্যু হলে জ্যেষ্ঠ পুত্র গণপতরাও রাজা হন। কিন্তু গণপতরাও বেশিদিন বাঁচেননি। ১৮৫৬ সালে অপুত্রক অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর দ্বিতীয় ভাই খুদিরাও গায়কোয়াড় হলেন। খুদিরাওকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টায় তাঁর ভাই মলহর রাও ১৮৬৩ সালে অভিযুক্ত হন এবং তারপর হতে মলহর রাওকে দীর্ঘদিন পদরা অঞ্চলে নজরবন্দী হয়ে থাকতে হয়। এর প্রায় সাত বৎসর পরে খুদিরাও মারা যান এবং তাঁর কোন পুত্রসন্তান না থাকায় মলহর রাও গায়কোয়াড় পদে অধিষ্ঠিত হন।

শাসনক্ষমতা হাতে পেয়ে মলহর রাও মৃত খুদিরাওয়ের সমর্থকদের রাজপদ হতে অপসারণ করেন। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে মলহর রাও শীঘ্রই অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সিংহাসনে আরোহণের নজরানা বাবদ প্রজার কাছে অর্থ চাইলেন। একদল প্রজা ক্ষেপে গিয়ে ব্রিটিশ রেসিডেন্সিতে নালিশ জানায়। খুদিরাওয়ের পরিবারজন মলহর রাওয়ের দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ করে। ওদিকে লক্ষ্মীবাই নামে যে সুন্দরী কামিনীকে রাজপ্রাসাদে কিছুদিন রেখে রাজা তাকে বিবাহ করার উদ্যোগ করেন, সে সম্বন্ধে পন্দু বিন গোবিন্দরাও নামে সুরাটের এক বাসিন্দা বরোদার রেসিডেন্সিতে অভিযোগ আনে যে, লক্ষ্মীবাই তার বিবাহিতা স্ত্রী, মহারাজের চরেরা তাকে জোর করে ধরে এনে রাজপ্রাসাদে রেখেছে; মহারাজের সঙ্গে তার স্ত্রীর বিবাহ সিদ্ধ হতে পারেনা। এ অভিযোগ কতদূর সত্য সে সম্বন্ধে যখন রেসিডেন্সির পক্ষ থেকে অনুসন্ধান চলছিল তখন অন্তঃসত্ত্বা লক্ষ্মীবাইকে মহারাজ বিবাহ করেন। সরকারের নির্দ্দেশে রেসিডেন্ট বিবাহসভায় অনুপস্থিত থাকেন। কয়েকমাস পরে লক্ষ্মীবাই এক পুত্রসন্তান প্রসব করে। কিন্তু ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ এ সন্তানকে সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃতি দিতে অসম্মতি জানায়।

বরোদার রাজসভায় একদল স্বার্থান্বেষী সভাসদ ও অমাত্যের চক্রান্তে গায়কোয়াড়ের পক্ষে রাজ্যে কোন নূতন সংস্কার প্রবর্ত্তন একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। রাজ্যের দায়িত্বশীল পদ হতে অযোগ্যদের অপসারণ ও ইংরেজের মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য রেসিডেন্ট রাজাকে ক্রমাগত চাপ দিতে থাকেন। এ ব্যাপারে রেসিডেন্ট কর্নেল রবার্ট ফেয়ারের অনমনীয় মনোভাবের জন্য রাজা-রেসিডেন্ট সম্পর্কে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

কর্ণেল ফেয়ার প্রথম জীবনে সৈনিক ছিলেন। মিঃ রবার্ট ফেয়ার ১৮৩৯ সালে সামরিক শিক্ষানবিশ হিসাবে প্রথম বোম্বাই আর্মিতে যোগ দেন। তারপরে দীর্ঘদিন ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে সামরিক বিভাগে কাজ করেন। ১৮৭৩ সালের মার্চ মাসে বরোদার রেসিডেন্সিতে যোগ দেবার আগে দেড় মাস গুজরাটের উত্তরভাগে পালনপুরে পোলিটিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। তার আগে সিন্ধুর উত্তর অঞ্চলে পোলিটিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও চীফ কম্যান্ডান্ট হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেন। বিষযুক্ত সরবতের মামলায় সার্জেন্ট ব্যালেন্টাইনের জেরায়[১] প্রকাশ পায় যে বোম্বাই সরকার কর্ণেল ফেয়ারকে সিন্ধুপ্রদেশের দায়িত্বপূর্ণ পদ হতে অব্যাহতি দিয়ে যে সরকারী অনুজ্ঞাপত্র দেন, তার এক প্রতিলিপি কোনভাবে রেসিডেন্সির দপ্তর হতে মহারাজের হাতে পেঁছিয় এবং গায়কোয়াড় তা পরবর্ত্তী রেসিডেন্ট স্যার লুইস পেলিকে দেখান। যে দূরদর্শিতা ও কূটনীতি রাজনীতিজ্ঞকে সহনীয় করে তোলে, সেনানী কর্ণেল ফেয়ারের ছিল তার অভাব। বাস্তবিক বরোদার অশান্তির জন্য ব্রিটিশ রেসিডেন্ট কতটা দায়ী সে প্রশ্নও উঠতে পারে। এ সম্বন্ধে কাথিয়াওয়াড় রাজন্যসমিতির (Kattyawar Chiefs' Association) সেক্রেটারী মিঃ দিনশা আর্দেশির তলেয়ার খাঁ লিখছেন[২]—"I consider Colonel Phayre to have directly aided in opening a blessed way for light in one of those most terrible dungeons of crimes and miseries that still exist in many parts of this Presidency—I pay him the highest honour for his unsullied integrity, and his pious, humane and zealous qualities, but still deplore that by his want of tact and moderation, indispensably needed in the situation in which he was placed, he should have crippled his own great future that was within his grasp, had he but possessed the kingly and serene temper and suasive perseverance of his successor."

বরোদা রাজ্যের অশান্তি লক্ষ্য করে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭৩ সালে তদন্ত

(১) Proceedings of the Baroda Commission appointed to enquire into the charges against H. H. Malharrow Gaekwar of Baroda, of instigating an attempt to poison the British Resident : reprinted from the Times of India, Verbatim Report.

(২) The revolution at Borada, 1874-75, pp. 6-7.

কমিশন বসান। কমিশন দেখে যে বরোদারাজের রাজ্যশাসনে অযোগ্যতার যে অভিযোগ রেসিডেন্ট কর্নেল ফেয়ার এনেছেন তা' মিথ্যা নয়। এবার বড়লাট গায়কোয়াড়কে ১৮ মাস সময় দিয়ে বললেন রাজ্যের উন্নতি দেখাতে হবে।

ইতিমধ্যে ১৮৭৪ সালের ৯ই নভেম্বর রেসিডেন্ট অভিযোগ আনেন যে তাঁর পানীয় সরবতে কেউ বিষপ্রয়োগ করেছে বলে তাঁর সন্দেহ, আর এ ব্যাপারে মহারাজের হাত আছে বলে তাঁর ধারণা। এরপর থেকে ঘটনা দ্রুত অন্যদিকে মোড় নেয়। বিচার কমিশনের তদন্তে গায়কোয়াড়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হলেও শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে গদী হারাতে হয়। ভারত ও বৃটেনের পত্র পত্রিকায় জনমত মলহর রাওয়ের সপক্ষে ও সরকারের বিপক্ষে রায় দেয়। কিন্তু সন্দেহভাজন করদ রাজার সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনে সরকারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার আশংকা ছিল। শুধু তাই নয়, বরোদার দৃষ্টান্তে ছোটবড় আরও দেশীয় রাজন্যবর্গের এই ধারণা বদ্ধমূল হতে পারে যে রাজ্যে আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও কুশাসন যতই অব্যাহত থাকুক না কেন, ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। মিঃ ডি. এ. তলেয়ার খাঁ লিখছেন[১], "But the question here is, whether the Government could place themselves in the humiliating position of becoming an ally, as before of a feudatory who was strongly suspected of a treasonable act."

আলোচ্য তিন প্রহসনে বাংগালী লেখক দেখিয়েছেন যে মলহর রাও গায়কোয়াড়কে যে যত অপবাদই দিন না কেন, প্রকাশ্য আদালতে সওয়ালের সময় সাক্ষীদের পরস্পর বিরোধী জবানবন্দীতে মহারাজার বিরুদ্ধে ফেয়ার সাহেবকে বিষপ্রয়োগের অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রমাণ না হয়ে যায় না।

(১) The revolution at Baroda, 1874-75, p. 64

গুইকোয়ার নাটক।

OR

THE MIRROR OF BARODA.

শ্রী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

শ্রী স্থরেশচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা;

গুপ্তপ্রেশ ২৪, মীর্ জাফর্স লেন।

১২৮২ সাল।

মূল্য ।/০ পাঁচ আনা।

গুইকোয়ার নাটক

(চার অংকের নাটিকা)

বরোদা রাজ্যের বৃটিশ রেসিডেন্ট কর্নেল ফেয়ারের বাসভবনে ভৃত্য রাউজি ও আবদুল্লা সাহেবের জন্য সরবত প্রস্তুত করতে করতে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে, আজকাল সাহেবের মধ্যে কেমন যেন এক ভাবান্তর লক্ষ্য করা গিয়েছে, সদাই উদ্বিগ্ন, দিনরাত নানা লোকের আনাগোনা আর গোপনে কী যেন শলাপরামর্শ চলে। ভৃত্যেরা বিদেয় হ'লে ফেয়ার সাহেব ঘরে প্রবেশ করেন। সরবতের গ্লাস টেনে নিয়ে খানিক পান করেন। সরবত বিস্বাদ মনে হওয়ায় গ্লাস নামিয়ে রেখে কর্নেল ফেয়ার ডাক্তার সিউয়ার্ডকে তলব করেন। ডাক্তার এলে ফেয়ার সাহেব জানান যে তাঁর সরবতে কেউ বিষ মিশিয়েছে বলে তাঁর ধারণা। মনে সন্দেহ উঁকি দেওয়ায় তিনি সবটা পান করেননি, নতুবা আর বাঁচতে হতো না।

ডাক্তার—সেকি তাও কখন হতে পারে, সরবতের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেয় এমন কার মাতার উপর মাতা।

ফেয়ার—ওহে তার আর বিচিত্র কি বল, যে গুরু কার্য্যভার গ্রহণ করেচি এতে পদে পদে শত্রুর আশংকা। ভাই তোমায় বলব কি, এই অতি অল্পদিন হলো, সরবৎ খেতে খেতে আর দুদিন আমার মনের মধ্যে এইরূপ ভয় হয়েছিল—ভয়ের সংগে সংগে মাতাও ঘুরেছিল; আমার আর মন সুস্থির হচ্চে না, বোধ হচ্চে সরবতের মধ্যে বিষ আছে।

কর্নেল সাহেবের পীড়াপীড়িতে ডাক্তার পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সরবতের গ্লাস নিয়ে যান।

প্রথম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে বরোদার রাজ-অন্তঃপুরে মহারাণী লক্ষ্মীবাই ও রাজকুমারী কুমাবাইকে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা নিয়ে আলোচনায় রত দেখা যায়। আগের সেই গরিমার দিন নেই, রাজবংশের এত নাম, পূর্ব্ব-পুরুষের এত যশ সব খুইয়ে এখন বিদেশীর বশম্বদ হয়ে থাকতে হচ্ছে, একি কম দুঃখের কথা! আবার এখন সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী মহারাজের সন্তানকে নিয়েও এরা গোলযোগ শুরু করেছে। রেসিডেন্ট ফেয়ার সাহেবই যত অশান্তির মূলে। এদের এই আলোচনার সময়ে মহারাজ মলহর

রাও প্রবেশ করেন। মহারাণী জানান যে রাজ্যের দেওয়ান দামুদরের কেমন যেন সন্দেহজনক গতিবিধি, মহারাজ যেন দেওয়ান সম্পর্কে সতর্ক হন। কিন্তু দামুদর সম্বন্ধে মহারাজের উচ্চ ধারণা একতিল ক্ষুণ্ণ হয় না। কথা-প্রসঙ্গে মলহর রাও মহারাণীকে জানান যে বড়লাট ১৮ মাস সময় দিয়েছেন, এর মধ্যে রাজকার্যের উন্নতি দেখাতে হবে। সুবিজ্ঞ, দেশহিতৈষী বলে বড়লাটের সুনাম আছে, তার কাছ হতে অন্যায় আচরণ আশা করা যায় না। এমন সময়ে কঞ্চুকি রাজঅন্তঃপুরের দরজায় এসে নিবেদন করে বিশেষ প্রয়োজনে মহারাজকে একবার বাইরে আসতে হয়, মন্ত্রি এখানে এসেছেন। মহারাজ শুনলেন ফেয়ার সাহেবকে কে বিষ দিয়েছে, রাজ্যময় মহা অশান্তি। রেসি-ডেন্সিতে মহারাজের তলব হয়েছে এখনই যেতে হবে।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বরোদা রেসিডেন্সির অন্যতম প্রধান পেলি সাহেবকে কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত দেখা যায়। বড়লাটের নির্দ্দেশ অনুসারে মলহর রাও সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন হবে তারই আভাস দিয়ে বলেন যে আপাততঃ বরোদার রাজাকে রেসিডেন্সিতে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ এলে তাঁকে নিবেদন করা হোল যে কর্নেল ফেয়ারকে বিষপ্রয়োগ সম্পর্কে ভারত গবর্নমেন্ট মহারাজকেই সন্দেহ করছেন, এজন্য আপাততঃ এখন কিছুদিন তিনি বন্দী।

মহারাজ—তিনি আমাকেই দোষী অনুভব করেচেন? ভাল, যদি দোষী হই, উপযুক্ত দণ্ডবিধান করুন, এখনি বন্দী করুন, উচিত শাস্তি দিন, আমি আনন্দের সহিত দণ্ড গ্রহণ করব; কিন্তু আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যেন আমি অবিচারে এ কলঙ্কভার মস্তকে না বহন করি।

বিচিত্র মনে হলেও রেসিডেন্সির নিয়ম এই যে, আমন্ত্রণ পেয়ে মহারাজ এখানে এসেছেন, এজন্য রেসিডেন্সির এলাকায় তাঁকে বন্দী করা চলবে না। মহারাজকে গ্রেপ্তারের জন্য পেলিসাহেব রেসিডেন্সির সীমার বাইরে তাঁকে যেতে অনুরোধ করেন।

মহারাজ—মহাশয়! আমাকে অনর্থক ক্লেশ দেবার আবশ্যক কি? যদি আমার প্রজাসমূহের সম্মুখে আমাকে অপদস্থ করবার ইচ্ছা থাকে চলুন।

পেলিসাহেব—না না ঈশ্বর জানেন আমার সে ইচ্ছা নাই।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে রেসিডেন্সি সংলগ্ন ময়দানে রেসিডেন্সির দুই পরিচারক রাউজি, আবদুল্লা, মহারাজের ভৃত্য সেলিম ও রেসিডেন্সির মেমসাহেবের পরিচারিকা আমিনা পরস্পর আলোচনা করে যে মহারাজ তো

গ্রেপ্তার হলেন, এখন বিচারে সাক্ষ্য দিতে এদের না আবার তলব হয়। মহারাজের দেওয়ানই তো যত গণ্ডগোলের মূলে, রেসিডেন্সি সাহেবের দপ্তরখানায় ঘন ঘন যাতায়াত করে মহারাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলে। এখন মলহর রাওয়ের ফৌজ, অস্ত্রশস্ত্র কেবল যে রেসিডেন্সির দখলে গেছে তাই নয়, মহারানীর নিজস্ব সম্পত্তিতেও এরা হস্তক্ষেপ করেছে। কিন্তু এখন সাক্ষ্য দিতে হলে কি বলা যায়। একথা আলোচনার সময় ঘটনাস্থলে চৌকিদার ও কনেষ্টবল এসে এদের রেসিডেন্সির সাক্ষী হিসেবে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

তৃতীয় দৃশ্যে দেখা যায় আদালতে সিন্ধিয়া ও জয়পুরের দুই মহারাজ, দিনকর রাও, কয়েকজন কমিশনার, দুই ব্যারিষ্টার—ব্যালেন্টাইন ও স্কোবল, বরোদার মহারাজা, ফেয়ার সাহেব ও অন্যান্য কর্মচারিরা সমাগত। প্রথমে ব্যারিষ্টার স্কোবল বলেন যে এমন বিচিত্র ও জমকালো মামলা সহজে চোখে পড়ে না। বিষের প্রতিক্রিয়ায় কর্ণেল ফেয়ার সাহেব আজ হতশ্রী। নিষ্ঠুর গুইকোয়ার সাহেবের পানীয় সরবতে গোপনে হীরকচূর্ণ দিয়েছিলেন।

ব্যালেন্টাইন—স্কোবল সাহেব, আপনি ও কি বলচেন? হীরকচূর্ণ বিষ নয়, রসায়নশাস্ত্রে অনেক প্রমাণ আছে।

স্কোবল এক নাতিদীর্ঘ বিবৃতিতে জানান যে করিতকর্ম্মা কর্ণেল ফেয়ারের শাসনকার্য্যে যোগ্যতার অনেক নজীর আছে। ১৮৭৩ সালে বরোদার রেসিডেন্ট হয়ে তিনি মহারাজের সঙ্গে বন্ধু সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হন, কিন্তু মহারাজ তেমন ব্যক্তি নন। বরং গোপনে ফেয়ার সাহেবের ভৃত্যদের ঘুষ দিয়ে বশ করলেন, শেষে এদের দিয়েই সাহেবকে বিষ প্রয়োগ করেন। "কিন্তু ধর্মের অনুগ্রহে যীশুখৃষ্টের কৃপায় পেগান দত্ত বিষ খ্রীষ্ট বিশোধিত জীবনে কিছুই করিতে প্যারিল না—ধর্ম্মের তারতম্য মনুষ্যের তারতম্য দেখা—"

ব্যালেন টাইন—মহাশয়! এখানে ধর্মের মীমাংসা কত্তে আসিনি, যা কত্তে এসেচেন তাই করুন।

প্রথম সাক্ষী আমিনাকে জেরার সময় স্কোবল প্রশ্ন করেন,

—আচ্ছা মহারাজা তোমার কাছে ফেয়ার সাহেবকে বিষ খাওয়াবার কোন কথা বলেছিলেন? চুপ করে রইলে যে—তা বলেছিলেন তার কোন সন্দেহ নাই।

আমিনা—কই না-হ্যাঁ-এই রকম কি বলেছিলেন।

স্কোবল—রাজা তোমায় কখন টাকা দিয়েছিলেন?

আমিনা—হ্যাঁ দিয়েছিলেন।

এরপরে দ্বিতীয় ব্যারিষ্টার ব্যালেনটাইন দু চার প্রশ্নের পরে আমিনাকে জিজ্ঞাসা করেন,

—মহারাজা তোমাকে ফেয়ার সাহেবকে বিষ খাওয়াতে বলেছিলেন ?

আমিনা—না।

ব্যালে্নটাইন—বিষ খাওয়াবার কথা কিছু জান না ?

আমিনা—না

দ্বিতীয় সাক্ষী কর্ণেল ফেয়ারকে অনেকক্ষণ জেরার পরে ব্যালেন্টাইন বলেন,

—তুমি সরবতে বিষ দেওয়ার কথা কার মুখে শুনলে ?

ফেয়ার—কেন ?

ব্যালেন্টাইন—আমার কথার উত্তর দাও না।

ফেয়ার—দামুদরের মুখে কতক কতক শুনেছিলেম, আর আমি খেয়ে টের পেয়েছিলুম।

ব্যালেন্টাইন—খেয়ে কি করে বিষ টের পেলে ?

ফেয়ার—কেন কষা লেগেছিল আর মাতা ঘুরেছিল।

ব্যালেন্টাইন্—বিষ কি কষা ?

ফেয়ার—তা আমি বলতে পারিনি, আমার যা লেগেছিল তাই বল্লুম।

তৃতীয় সাক্ষী ডাঃ সিউযার্ড বলেন যে, সরবতের গ্লাসে হীরকচূর্ণ ও অল্প পরিমাণে আর্সেনিক বিষ ছিল। গ্লাসে যে পরিমাণ বিষ ছিল তাতে নিঃসন্দেহে মানুষ মরতে পারে, সরবতের গ্লাস তিনি বাড়ী নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন ইত্যাদি। কিন্তু জেরার শেষের দিকে আর্সেনিক জলের চেয়ে কত ভারি, আর্সেনিকের কি কি গুণ—ব্যালেন্টাইনের এ জাতীয় প্রশ্নে ডাক্তার সদুত্তর দিতে পারেন না।

চতুর্থ আসামী দামুদর পন্থ জেরার উত্তরে জানায় যে মহারাজ তাকে দু' তোলা আর্সেনিক আনতে হুকুম করেন, সেই বিষ সাক্ষী মহারাজের ভৃত্য সেলিমের হাতে দেয়।

স্কোবল—টাকাকড়ি হিসাবপত্র সব কি তোমার কাচে থাকত ?

দামুদর—হ্যাঁ

ব্যালেন্টাইন—তুমি খাতায় আর্সেনিক বলে খরচ লিখেচ ?

দামুদর—না, দান ধ্যান বা অন্যান্য খরচ বলে লিখে রাখতেম।

ব্যালেন্টাইন—মহারাজা কি তোমাকে ঐরকম লিখতে অনুমতি কত্তেন ?

দামুদর—হ্যাঁ

ব্যালেন টাইন—তবে তোমার খাতাপত্র সমস্ত মিথ্যা ?

দামুদর—কতক কতক।

ব্যালেন্‌টাইন—মহারাজা যদি এমন বলেন যে তুমি তার সর্ব্বস্ব অপহরণ করার জন্য জাল করেছ, তুমি কি প্রমাণ দেবে ?

দামুদর—আর কি প্রমাণ দোব, মহারাজা স্বয়ং আমায় অনুমতি করেছিলেন।

ব্যালেন্‌টাইন—মহারাজার অনুমতি পত্র দেখাতে পার ?

দামুদর—না।

পাঁচ নম্বর সাক্ষী হেমচাঁদ জহুরী জানায় যে মাস কয়েকের মধ্যে মহারাজের নাম করে তার দোকানে কেউ হীরক চূর্ণ কিনতে আসেনি। তবে যে এজাহারে সে সই করেছে তা' পুলিশ গজানন্দ ভিতলের চাপে পড়ে। এজাহারে কি লেখা ছিল সে জানে না ইত্যাদি।

ভারতবর্ষে বিচারব্যবস্থার নমুনায়, বিলাতের আনকোরা ব্যারিষ্টার ব্যালেন্‌-টাইন স্তম্ভিত। বলেন,—

"বিজ্ঞ কমিশনারগণ! আমি এদেশে কখনই ওকালতি করি নাই। বিলাতে ওকালতি করিয়া থাকি, এদেশে আমার এই প্রথম আসা। আমি অনেক সাক্ষ্য দেখিয়াছি ও পরীক্ষা করিয়াছি, কিন্তু এমন প্রতারকের দল কখন দেখি নাই; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইণ্ডিয়া গবর্নমেন্ট পুলিসের হস্তে যে পরিমাণে ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছেন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এরকম নাই। এখানকার পুলিসের কর্ম্মচারীগণের মধ্যে অনেকেই মূর্খ, নিষ্ঠুর ও আপন আপন ইষ্ট সাধনে অতীব যত্নশীল। এ প্রকার সম্প্রদায়কে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া গবর্নমেন্টের উচিত নয়। বিজ্ঞ স্কোবল্‌ সাহেব হতভাগ্য গুইকোয়ারের বিপক্ষে যে সকল সাক্ষ্য তুলিয়াছেন তাহাদের মধ্যে প্রায় কাহাকেও বিশ্বাস করা যায় না। গুইকোয়ার ভারতবর্ষের একজন প্রধান রাজা; কতকগুলি কুচক্রীর কুচক্রে পড়িয়া তিনি এ প্রকার বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। যে গুরুতর দোষ তাঁহার উপর অর্পণ করা হইয়াছে তিনি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, কারণ তাঁহার বিপক্ষে কোন দৃঢ়তর প্রমাণ নাই, অতএব আপনারা এ বিষয়ে উত্তমরূপে প্রণিধান করিয়া আপন আপন মত ব্যক্ত করিবেন।"

উওরে স্কোবল বলেন যে মহারাজ নিশ্চয়ই দোষী নইলে তাঁর বিপক্ষে এত সাক্ষী কি করে পাওয়া যায়। এদের শিখিয়ে পড়িয়ে আদালতে আনা হয় নাই।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কারাগারে শোকসন্তপ্ত মলহর রাওকে বিলাপ করতে দেখা যায়। বিশ্বাসঘাতক দামুদরের মনে এই ছিল? কালসাপকে না

চিনে তাকে এতটা আস্থার ফল এই। এ সময়ে কমিশনার সিড সাহেব এসে জানান যে মলহর রাওকে এখনই মাদ্রাজ যেতে হবে, সেখানে গিয়ে বন্দীবাসে থাকতে হবে। যদিও ফেয়ার সাহেবকে বিষ প্রয়োগের অভিযোগ প্রমাণ হয় নাই, বড়লাট নর্থব্রুক মহারাজের শাসনব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট, কাজেই তাঁকে রাজ্যচ্যুত করা হোল। সিংহাসন বঞ্চিত হতভাগ্য মলহর রাও স্ত্রীপুত্রের কাছে শেষ বিদায়ের অনুমতি পান না। দেশান্তরের পথে তখনই রওনা হতে হয়।

চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে বরোদার রাজকুমারী ও মহারাণীর বিলাপ এবং ভবিষ্যতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে মহারাণী লক্ষ্মীবাইয়ের আবেদনের সংকল্পে নাটক শেষ হয়।

হীরকচূর্ণ নাটক।

THE DIAMOND DUST.

A Drama In Five Acts

BY AN ACTOR:

"ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর
নহিলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার"

হেমচন্দ্র।

"কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা-সম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী
নীরব রবাব বীণা, মুরজ, মুরলী;"

মাইকেল।

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮২ সাল।

হীরকচূর্ণ নাটক

পাঁচ অংকের রাজনৈতিক প্রহসন। নাটিকার নাম প্রথম পৃষ্ঠায় "হীরকচূর্ণ নাটক" আর পরবর্তী প্রতি পৃষ্ঠার শীর্ষে "গাইকোয়াড় নাটক"। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে বরোদার রাজা মলহর রাও গাইকোয়াড় ও রাণী লক্ষ্মীবাইকে রাজঅন্তপুরে আলাপ করতে দেখা যায়। লক্ষ্মীবাইয়ের অনুযোগ তিনি মহারাজের অন্যান্য রাণীদের তুলনায় রূপেগুণে নিকৃষ্ট হলেও, অধীনাকে তিনিই বড় করেছেন। তবে কেন আজ চারদিন রাজদর্শন লাভ হয়নি। মহারাজ বলেন যে লক্ষ্মীবাই রূপেগুণে অতুলনীয়া। বিশেষ অপুত্রক মলহর রাওয়ের অভাব এতকাল পরে লক্ষ্মীবাইয়ের গর্ভজাত সন্তান হতে ঘুচলো। তবে কিনা রাজ্যে নানা গোলযোগের জন্য মহারাজা অন্তঃপুরে সময় দিতে পারেন না। দুষ্টলোকের প্ররোচনায় একদল প্রজা রাজার নামে রেসিডেন্সিতে নালিশ করেছে। রাজ্য শাসনের নানাবিধ উন্নতির চেষ্টায় রাজা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন কিন্তু রেসিডেন্ট কর্ণেল ফেয়ার রাজার কাজে যেন প্রতিবন্ধকতা করতে বদ্ধপরিকর। লক্ষ্মীবাইয়ের দুশ্চিন্তা যায় না, বলেন যে রেসিডেন্সির সঙ্গে বিবাদ অর্থ জলের কুমীরের সঙ্গে লড়বার ধৃষ্টতা। মহারাজ আশ্বাস দেন যে শোনা যাচ্ছে শীঘ্রই কর্ণেল ফেয়ার অন্যত্র বদলি হবেন।

প্রথম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে রেসিডেন্সিতে কর্ণেল ফেয়ার ও রাজার একজন প্রধান কর্ম্মচারী দামুদর পন্থ গোপনে পরামর্শ করে। দামুদর জানায় যে এতকাল রাজ-সরকারে কাজ করে কাগজপত্র ও লোকজন তার হাতের মুঠোয়। এখন কর্ণেল ফেয়ার তাঁর নিজের কাজ হাসিল করলেই হয়। কর্ণেল সাহেব বলেন এতো সামান্য কাজ,—"আমি মনে কল্লে এও প্রমাণ কত্তে পারি যে আমি গাইকোয়াড় বংশীয়, বরদার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।"

দামুদর স্তাবকের সুরে বলে,—"তার সন্দেহ কি? আপনি রাজার জাত, এখানকার প্রকৃত রাজাই আপনি, গাইকোয়াড় শুধু নাম মাত্র সিংহাসনে বসেন। তবে কিনা কাজটা তো নিতান্ত সহজ নয়—তাই বলছি।"

কর্ণেল ফেয়ার—"আমি মনে কল্লে সে সিংহাসন দুদিনে ঘুচাতে পারি। এত

বড় আস্পর্দ্ধা, এত অহংকার? আমার বিপক্ষে খরিতা পাঠান হয়েছে।
—কিন্তু সেটি করা হবে না।"

এরপরে ফেয়ার সাহেব বলেন যে এমন কৌশলে তিনি কাজ হাসিল করবেন যাতে আড়ম্বর ও কায়দার বহর দেখে সাধারণ লোকে ইংরেজের প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে বরং সাধুবাদ দেবে।

রেসিডেন্সির দুই ভৃত্য নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে রেসিডেন্সিতে কাজ করে সুখ নেই। আজকাল কথায় কথায় সাহেব রেগে ওঠেন, বিশেষ মেমসাহেব গেছেন বিলেতে। সুখ আছে রাজবাড়ীর কাজে, বুটের গুঁতো নেই, অঢেল খাওয়াদাওয়া। রেসিডেন্সির ছোট সাহেব কলকাতা বেড়াতে যাচ্ছেন। তাকে ধরে সঙ্গে গেলে হয় না? দ্বিতীয় ভৃত্য বলে কলকাতার মত জায়গা কি আর আছে। কলকাতার রাস্তায় গ্যাসে আলো জ্বলে, তেল নেই সলতে নেই। কল টিপলে তেতালায় জল আসে। চাকরদের জল তুলে হয়রান হতে হয় না।

প্রথম ভৃত্য বলে যে বোম্বাইও খাসা শহর, শুধু এ বরোদারই কিছু নেই। দ্বিতীয় ভৃত্য জানায় যে সরকার নাকি রাজার উপর হুকুম দিয়েছেন যে দেড় বছরের মধ্যে বরোদাকে কলকাতা বানাতে হবে।

এদের আলোচনার মধ্যে রেসিডেন্সির পরিচারিকা আমিনা প্রবেশ করতেই এরা আমিনাকে ধরে। আমিনা রেসিডেন্টের স্ত্রীর সঙ্গে বিলেত গিয়েছিল। বিলেত কি কলকাতার মতন? আমিনা জানায় কলকাতা তার কাছে আঁস্তাকুড়, বিলেত থেকে ফিরে আর এখানে থাকতে ইচ্ছে হয় না।

দ্বিতীয় ভৃত্য প্রশ্ন করে এবারে গেলে না কেন। আমিনা বলে বিলেতে কে এক সাহেব তার প্রেমে পড়ে তাকে আকছার জ্বালিয়েছে। আমিনা কেন তাকে বিয়ে করতে যাবে। সে কোন এক বড় সাহেবের বাবুর্চি। তবে এখন সেই সাহেবের নেকনজরে পড়ে সেই সাহেব বাবুর্চি এদেশে এসেছে, বাংলা মুল্লুকের কোথায় যেন 'মেজিষ্টার' হয়েছে।

প্রথম ভৃত্য—আহা হা! আমিনা বিবি! এমন দাঁও ছেড়ে দেয়, তখন যদি বাবুর্চি সাহেবকে বিয়ে কত্তে তা হলে এখন মেজেস্টারনি হয়ে সাহেবের বগলে বাদুড় ঝোলা হয়ে হাওয়া খেতে পারতে।

এদের হাসিঠাট্টার মধ্যে তৃতীয় এক ভৃত্য ব্যস্তভাবে ঢুকে জানায় ফেয়ার সাহেব আজ সকালে সরবত খেয়ে মাথা ঘুরে পড়েছেন। সাহেবের সন্দেহ সরবতে বিষ মেশানো ছিল। এখন সকলের তলব হয়েছে।

প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে অসুস্থ কর্ণেল ফেয়ারের খবর পেয়ে ডাক্তার সুয়ার্ড দেখতে এসেছেন। কর্ণেল সাহেব জানান সকালে এক গ্লাস সরবত পান তার অভ্যাস। আজ সকালে খানিক সরবত খাওয়ার পরে অসুস্থ মনে হয়। আগেও এরকম কয়েকবার হয়েছিল। কিন্তু আজ তার সন্দেহ কেউ এ সরবতে বিষ দিয়েছে। ডাক্তার সুয়ার্ড রেসিডেন্সির ভৃত্য আবদুল্লাকে জেরা করেন।

সুয়া—আজকের এ সরবত কে তৈয়ার করেছে ?

আব—খোদাবন্দ আমি।

সুয়া—এতে কি কি মস্‌লা দিয়াছ ?

আব—খোদাবন্দ লেবুর রস, ওলা আর কেওড়া।

সুয়া—লেবু, ওলা, কেওড়া।—জল কোথাকার ?

আব—খোদাবন্দ্ ফিলটারের।

সুয়া—আপনি কিরূপ বোধ কচ্চেন। সব সরবত কি খেয়েছেন ?

ফেয়া—না এক চুমুক খেয়েই তামাটে লাগাতে সব ঐ স্থানে ফেলে দিয়েছি। আমার মাতা ঘুরিতেছে বুক ধড় ধড় কচ্চে।

সুয়া—তাইতো। আচ্ছা খানসামা লেবু কোন গাছের জান ?

আব—এই রেসিডেন্সির বাগানের।

সুয়া—আচ্ছা ও গাছের তলায় কি কখন সাপ দেখা যায় ?

আব—কৈ খোদাবন্দ তা তো কখন দেখিনি।

ডাক্তার সুয়ার্ড আরও কিছুক্ষণ আবদুল্লাকে জেরার পরে সরবতের গ্লাস নিয়ে পরীক্ষা করেন। ডাক্তারী বইয়ের পাতা উল্টে পাল্টে লক্ষণ মিলিয়ে তার ধারণা হয় ফেয়ার সাহেবের সরবতে আর্সেনিক ছিল। গ্লাসের তলায় জমে থাকা গুঁড়ো আঙ্গুলে করে গ্লাসের গায়ে চাপ দিতে কাঁচে দাগ পড়ে। এবার ডাক্তারের দৃঢ় ধারণা এ হীরের গুঁড়ো না হয়ে যায় না। বোম্বাইতে এ গ্লাস পরীক্ষা হবে বলে ডাক্তার এটিকে সঙ্গে করে নিয়ে যান।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বরোদার নূতন রেসিডেন্ট পেলি সাহেব ও বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার সুটার সাহেব নিজেদের মধ্যে আলোচনায় রত। দুজনেই ভারতের মঙ্গলের জন্য জীবনপণ করে আছেন। মুশকিল, এদেশীয়রা বিশেষ করে হিন্দুরা সেকথা মানে না।

সুটা—কিন্তু হিন্দুরা বড় অকৃতজ্ঞ। মূর্খেরা বোঝে না যে, আমরা যে এ সকল কার্য কচ্চি সে কেবল তাদেরই হিতের জন্য। হিন্দু রাজগণ

তাদের রীতিমত শাসন কর্ত্তে পারে না, এইজন্য সেই সকল রাজ্য আমাদের সম্পূর্ণ শাসনাধীনে আনা,—নইলে আমাদের বৃথা ভারগ্রস্থ হওয়ার আবশ্যক কি ?

পেলি—তার সন্দেহ কি !

সুটা—কিন্তু, আপনি দেখবেন যে সকল প্রজার হিতের জন্য এত অর্থ ব্যয় করে, এত পরিশ্রম করে, এত বুদ্ধির কৌশলে মলহর রাও দোষী কিনা, প্রমাণ করবার উদ্যোগ করা যাচ্চে, সেই সকল প্রজাগণই এরপর আমাদের কুৎসা করবে এবং "অত্যাচারীই হোক, আর যাই হোক, আমাদের মহারাজকে আমাদের দাও" বলে চীৎকার করে জ্বালাতন করবে।

একটু পরে ভৃত্য এসে জানায় মহারাজ মলহর রাও আসছেন। পেলি সাহেবের নির্দ্দেশে সুটার সাহেব স্থান ত্যাগ করেন।

গাইকোয়াড় মলহর রাও পেলি সাহেবকে বলেন যে তাঁর অনুরোধে মহারাজা একবার সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, এখন বিষ প্রয়োগের ব্যাপারে তদন্তের কি হলো। মিঃ পেলি জানান যে সাক্ষীদের মধ্যে অনেকে এ ব্যাপারে মহারাজকেই দোষী করছে। অগত্যা ইংরাজ বাহাদুর চান এখন কিছুদিন মহারাজের স্বাধীনভাবে চলা ফেরা চলবে না। যতদিন এ ব্যাপারে মহারাজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ না হয় ততদিন তাঁকে ইংরাজের হাতে বন্দী থাকতে হবে। মলহর রাও বলেন যে আমি আপনাদের এলাকায়, আমাকে আপনারা ইচ্ছা করলেই বন্দী করতে পারেন। মিঃ পেলি জানান যে এতটা দৃষ্টিকটু কাজ ইংরাজ করবে না, কারণ পেলি সাহেবই মহারাজকে রেসিডেন্সিতে আহ্বান করেছেন। মহারাজকে রেসিডেন্সির বাইরে তার নিজের এলাকায় যেতে হবে। সেখানে গবর্ণর জেনারেলের আদেশপত্র মহারাজের সামনে পাঠ করে তাঁকে আইনমাফিক বন্দী করা হবে। মলহর রাও যখন বলেন যে ওভাবে সর্ব্বজন সমক্ষে বন্দী না করলেই কি নয়, উত্তরে পেলি সাহেব জানান,—"মহারাজ ! আমি আমার নিজের প্রভু নই।"

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজপথে দুই ভদ্রলোক মদন ও আয়ান গাইকোয়াড়ের ভাগ্যবিপর্য্যয় নিয়ে আলোচনা করছেন। আয়ান স্বচক্ষে ইংরেজের হাতে মহারাজকে বন্দী হতে দেখেছেন। মলহর রাওয়ের প্রজারা সকলেই উপস্থিত ছিল কিন্তু কেউ ইংরেজ সৈন্যদের বাধা দিতে সাহস করেনি। পেলি সাহেব বলেন যে মহারাজকে সামান্য লোকের মত বন্দী করা হয় নাই, মহারাজ শুধু রাজপ্রাসাদের পরিবর্ত্তে রেসিডেন্সিতে বাস করবেন। আয়ান

বল্লেন,—"একজন পেলিসাহেবকে মিনতি করে বল্লেন, 'যদি মহারাজ বন্দী নন, তবে এ সকল ইংরাজ সৈন্যের আবশ্যক কি? দেশীয় সৈন্যগণ চিরকালই মহারাজের শরীর রক্ষা করে, আপনি তাদেরই নিযুক্ত করুন'।"

মদ—তাতে পেলি সাহেব কি বল্লেন?

আয়া—তিনি তাঁর স্বাভাবিক সততার সহিত ভদ্রলোকটিকে বাঁদর বুঝিয়ে দিলেন; বল্লেন—"এ তোমাদের নিতান্ত ভ্রম। যে ইংরাজ সৈন্যগণ মহারানী ইংলণ্ডেশ্বরীর শরীর রক্ষা করে তারাই তোমাদের মহারাজের শরীর রক্ষক হবে এ বরং সৌভাগ্যের বিষয়।" ভদ্রলোকটি বুঝলেন ব্যাপার কি—বৃথা বাক্য ব্যয় বিফল বিবেচনায় আস্তে আস্তে প্রস্থান করলেন।

আয়ান ও মদন আরও কিছুক্ষণ বরোদার গোলযোগ, মহারাজের সাময়িক রাজ্যচ্যুতি, বিচার কমিশন ও গবর্ণর জেনারেলের অপক্ষপাত নিয়ে আলোচনা করেন। এমন সময় পূর্ব্ববঙ্গীয় মহাজন 'শ্বশুর' হাঁফাতে হাঁফাতে সেখানে হাজির হন। এদের বলেন যে সেপাইরা তার বাড়ীতে হানা দিয়েছিল। পুলিশের সেপাই যখন জানতে চায় তিনি কি করেন, 'শ্বশুর' বল্লেন—"আমি ঘতো আর চিনির ববোসা করি।"

"সরবতের চিনি তুই দিয়েছিলি, তোকে পুলিশে যেতে হবে"—এই বলে পুলিশ তাকে পাকড়াও করে টেনে নিয়ে যায়। একজন পুলিশ শ্বশুরের গায়ের চাদর শক্ত করে ধরেছিল। একসময় সুযোগ বুঝে এক ঝটকায় সেটিকে ফেলে ঘুরে চকিতে তিনি দৌড়ে পালালেন। মদন ও আয়ানের আশ্বাসে শ্বশুরের ভয় যায় না, তিনি দ্রুত আর এক মহাজনের আস্তানায় ছুটলেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে দেখা যায় রাজ-অন্তঃপুরে রাণী লক্ষ্মীবাই শোকাকুলা,—"কি কুক্ষণে এ হতভাগিনী এ রাজবাটীতে প্রবেশ করেছিল।—অভাগিনীর জন্যই সমস্ত সর্ব্বনাশ হলো।—যেদিন হতে আমি এ রাজপুরীতে প্রবেশ করেছি সেইদিন হতেই মহারাজের বিপদের সূত্রপাত। কেন আমি মহারাজের প্রতি অনুরক্তা হলেম! হৃদয়েশ্বরই বা কেন আমায় ভালবাসলেন!" তাঁর আকাশ পাতাল চিন্তার মধ্যে ছেদ পড়ে সপত্নী কন্যা কুমাবাইয়ের প্রবেশে।

কুমাবাই বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী। সে বলে যে রাজরাণী ও রাজকন্যার অশ্রুপাতে রাজার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হবে না। এ কাঁদবার সময় নয় বরং উদ্যোগ করতে হবে যাতে মহারাজ মুক্ত হন। দেশের সমস্ত সংবাদপত্র রাজার সপক্ষে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দয়ার শরীর, একবার সেখানেও দরবার করতে হবে।

কুমার কথায় লক্ষ্মীবাই আশা খুঁজে পান, বলেন—"তোমা ভিন্ন এ কর্ম্ম আর কাহাকেও সম্ভবে না—যদি মহারাজকে কোন উপায়ে আবার স্বাধীনতা দিতে পার, বল মা আমায় মার মতন ভাববে—সৎমা বলে ঘৃণা করবে না—বল মা একবার বল—তোমার মত মেয়ে বহুকালের পুণ্যফলে জন্মে।"

তৃতীয় অঙ্কে কমিশন সভায় মলহর রাওয়ের ব্যারিষ্টার সার্জেন্ট ব্যালেন্টাইন অ্যাডভোকেট জেনারেল স্কোবল, কর্ণেল ফেয়ার, গাইকোয়াড়, কমিশনারগণ, সাক্ষীরা ও দর্শক উপস্থিত।

প্রথম সাক্ষী আমিনা বলে যে সে সরকার বাহাদুরের নুন খেয়েছে অতএব সত্যি কথা বলবে। পিদ্রু আর রাওজির মুখে সে শুনেছে যে মহারাজা বিষ খাওয়াবেন। সার্জেন্ট ব্যালেন্টাইন তাকে দু-চার প্রশ্নের পরে ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে কবে পিদ্রু আর রাওজি তাকে বিষের কথা বলেছিল ?

আমিনা—কৈ পিদ্রু আর রাওজি ত আমাকে কিছু বলেনি, সে আর দুজন বলেছিল।

ব্যাল—তবে কেন বল্লে, পিদ্রু আর রাওজি বলেছে ?

আমি—তা-তা-আমি অত ঠাউরে বলিনি।

ব্যাল—তুমি কি সজ্ঞানে আছ ? না, এখন ডাক্তার সাহেব চিকিৎসা কচ্চেন ?

আরও কয়েকবার আমিনা পরস্পর বিরোধী সাক্ষ্য দেয়। দ্বিতীয় সাক্ষী রেসিডেন্সির ভৃত্য রাওজি বলে যে মহারাজ অনেক চেষ্টা করেছিলেন তাকে ও রেসিডেন্সির খানসামা পিদ্রুকে হাত করতে। পিদ্রুকে মহারাজ এক বিষের মোড়ক দিয়ে বলেন ফেয়ার সাহেবের খানায় মেশাতে। পিদ্রু জানায় সে তা পারবে না, সাহেবের কিছু একটা হয়ে গেলে সে ধরা পড়ে মারা যাবে। রাওজি বলে মহারাজ তাকেও এক বিষের মোড়ক দিয়ে বলেন যে কাজ হাসিল হলে মহারাজ তাকে এক লক্ষ টাকা দেবেন।

ব্যালেনন্টাইন এক সময় তাকে প্রশ্ন করেন,—"আচ্ছা তুমি নরসুর সাক্ষাতে বলেছিলে যে তুমি বোতলের বিষ দিয়েছ ?"

রাও—সে আমি মিছে করে বলেছিলেম।

ব্যালেন্টাইন মন্তব্য করেন যে সে তাহলে মিথ্যা বলে থাকে। যখন স্টার সাহেব রাওজিকে অজস্র প্রশ্ন করেন তখন সে নিশ্চয় ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলেছে।

তৃতীয় সাক্ষী পিদ্রু জানায় সে এ মোকদ্দমার বিশেষ কিছু জানেনা, সে রাজবাড়ী কখনও যায়নি, রাজবাড়ীর ভৃত্য সেলিম যদিও তাকে রাজবাড়ী যাবার জন্য প্রায়ই বলতো। ব্যালেন্টাইনের প্রশ্নের জবাবে যে জানায় সে রাওজির সঙ্গে

সে কখনও রাজবাড়ী যায়নি। রাওজি যদি অন্য কথা বলে থাকে তাহলে সে মিথ্যে কথা।

চতুর্থ সাক্ষী কর্ণেল ফেয়ার ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। একসময় ব্যালেণ্টাইন তাঁকে প্রশ্ন করেন যে তিনি ডাঃ গ্রে-কে যে চিঠি পাঠান তাতে লেখা ছিল যে তিনি বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছেন তাকে বিষ দেওয়া হবে, আর তাতে আর্সেনিক ও হীরের গুঁড়ো থাকবে, এখন এই বিশ্বাসী লোকটি কে ?

ফেয়ার সাহেব জানান, তা' স্মরণ নেই।

ব্যাল—স্মরণ নাই বল্লে চলবে না—'বিশ্বাসী লোক' 'গোপনীয় সংবাদ' দিলে আর তার নাম মনে নেই !

ব্যালেণ্টাইনের জেরার উত্তরে ফেয়ার সাহেব বলেন সে ব্যক্তি ভাও পুনিকর হতে পারে।

পঞ্চম সাক্ষী ডাক্তার সুয়াডর্কে ব্যালেণ্টাইন প্রশ্ন করেন, আর্সেনিকের আপেক্ষিক গুরুত্ব কত। ডাক্তার বলেন যে তার স্মরণ হচ্ছে না।

ব্যালেনন্টাইন আবার জানতে চান আর্সেনিক জলে ডোবে না ভাসে। ডাক্তার সুয়ার্ড এবারও সদুত্তর দিতে পারেন না, বলেন ডাক্তার গ্রে'কে জিজ্ঞাসা করুন।

পরবর্ত্তী সাক্ষী জহুরী হেমচাঁদ ফতেচাঁদ জানায় সে এ মোকদ্দমার কিছু জানেনা। মহারাজকে সে কখনও হীরা বিক্রী করেনি যদিও তার হিসাবের খাতায় মহারাজের নামে খরচ লেখা আছে পুলিশের চাপে সে ঐ মিথ্যা খরচ লিখতে বাধ্য হয়েছে।

গাইকোয়াড় মলহর রাওকে আদালতে কিছু বলবার অনুমতি দিলে তিনি সংক্ষেপে বলেন যে কর্ণেল ফেয়ারের সঙ্গে তাঁর কোনদিনই শত্রুতা ছিল না, এখনও নাই। যে সাংঘাতিক দোষে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। রেসিডেন্টের অমনোযোগেই মলহর রাও রাজ্যের সংস্কারে অক্ষম হয়েছিলেন। এজন্য মন্ত্রীদের পরামর্শে গবর্ণর জেনারেলের কাছে খরিতা পাঠান। কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল বোম্বাইতে কর্ণেল ফেয়ার একবার অখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গবর্ণর জেনারেল নিশ্চয়ই তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন। রাওজি, ও আমিনার সাক্ষ্যের প্রতি বর্ণই মিথ্যা।

এবার ব্যালেন্টাইন কমিশনারদের উদ্দেশ করে বলেন বিনা কারণে মহারাজের স্বাধীনতা হরণ ও তাঁর প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হয়েছে। এর আগে কোন আদালতে এত অসংগত ও সামঞ্জস্যহীন মিথ্যা সাক্ষ্যের সমাবেশ হয় নাই। পুলিশ অনেক কৌশল ও মেহনতে এই সমস্ত সাক্ষী সংগ্রহ করেছে। কিন্তু

দু' একজন সত্যবাদীর সত্যভাষণে অন্যান্য সাক্ষীদের সততা সম্বন্ধে সংশয় জাগে। পিদ্রু ও ফতেচাঁদ মিথ্যাসাক্ষীদের মুখোশ খুলে ধরেছে।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কর্ণেল ফেয়ার কয়েকজন ইংরাজের সংগে ভারতীয় সম্পাদক ও দেশীয় কাগজ সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। মাষ্টার ফিলিপ বলেন,—"এডিটার হওয়া সহজ কথা নয়—অনেক বিদ্যা চাই—এমন কি, ভবিষ্যৎ জানবার ক্ষমতা না থাকলে কাগজ চালান দুষ্কর।" আরও দুচার কথার পরে ডাক্তার সুয়ার্ড সেখানে আসেন। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পরে মাষ্টার ফিলিপ জানতে চান সেদিন আদালতে ডাঃ সুয়ার্ড সমস্ত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ডাঃ গ্রে'কে সালিশ মানলেন কেন। ডাক্তার সুয়ার্ড বললেন যে তিনি তো পরীক্ষার পড়া প্রস্তুত করে আসেননি যে মুখে মুখে রসায়নের পাঠ বলে যাবেন—"আর সার্জেন্ট ব্যালেন্টাইন যে ল ছেড়ে মেডিসিন্ আরম্ভ করেছেন, তা আমি কি করে জান্‌বো ?"

দামুদর পন্থ ফেয়ার সাহেবের সংগে একবার দেখা করতে আসে। কিন্তু কর্ণেল ফেয়ার তাকে কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক সম্বোধনে বিদায় করেন।

চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজপথে আয়ান ও মদন বিচার কমিশনের রায় এবং গাইকোয়াড়ের ভাগ্য বিপর্যয় নিয়ে আলোচনা করে। গাইকোয়াড়ের নির্দোষিতা সম্বন্ধে বিচার কমিশন ঐক্যমতে পৌঁছতে পারলেন না। তিন ইংরেজ কমিশনার মহারাজকে দোষী ও তিন হিন্দু কমিশনার তাঁকে নিরপরাধ বলেছেন। এক্ষেত্রে লর্ড নর্থব্রুক যদি মহারাজকে তাঁর সিংহাসন প্রত্যর্পণ না করেন তবে লর্ড নর্থব্রুকের সুশাসন ও অপক্ষপাতে কলঙ্ক লিপ্ত হবে। দেশীয় সংবাদপত্র প্রায় সমস্তই এমনকি বিলাতের কয়েকটি কাগজও মহারাজার পক্ষ সমর্থন করছে।

আয়ান জানান যে দামুদর পন্থের এখন দুর্দশার অন্ত নেই, বাড়ীর বার হবার যো নেই। পথে বার হলেই চারিদিক হতে বিদ্রূপ গালি গালাজ বর্ষণ হতে থাকে।

চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে রাজপথে অশান্তচিত্তে দামুদর পন্থ উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়,—"এ পাপ হৃদয় যে যন্ত্রনায় অহর্নিশি জ্বলচে তার সঙ্গে কোন কষ্টেরই তুলনা হয় না। সকল প্রকার যাতনার সঙ্গেই আমি এ দারুণ মনোবেদনার বিনিময় কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। পূর্ব্বে পরকাল বাতুলের প্রলাপ বলে তাচ্ছিল্য করেছিলেম। অনুতাপ যে কি ভয়ংকর শাস্তি তা কখন স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই।—কিন্তু এখন যে এ জ্বালা আর সহিতে পারি না। এ-

আগুন কি নির্বাণ হওয়ার নয় !......"। অন্তর্জ্বালায় আরও কিছু সময় খেদোক্তি করে সে ক্ষিপ্তের মত চলে যায়।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রেসিডেন্সির একটি ঘরে মলহর রাও বন্দী অবস্থায় নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করছেন। মিড সাহেব এসে জানান গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের কাছ হতে নির্দ্দেশ এসেছে মলহর রাওকে বরোদা ত্যাগ করে মাদ্রাজে যেতে হবে। এখনই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। মলহর রাও একবার স্ত্রী পুত্র কন্যার সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু তাঁর সেই আবেদন মঞ্জুর হয় না।

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে মলহর রাওকে প্রহরাধীন অবস্থায় রেলষ্টেশনে উপস্থিত হতে দেখা যায়। তিনি মিড সাহেবকে জানান যে নিকটবর্ত্তী মন্দিরে তাঁর কন্যা কুমাবাই অপেক্ষা করছে। তাঁকে কন্যার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হোক। কিন্তু মিড সাহেব এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। হঠাৎ সকলকে চকিত করে বেগে কুমাবাইয়ের প্রবেশ,—"কেউ বাধা দিতে চেষ্টা করো না— আমি কারুর বারণ শুনবো না, রাজকুমারী কুমা নিশ্চয়ই তার পিতার নিকট যাবে, কেউ নিবারণ কর্ত্তে পাবে না।" পিতাপুত্রীর মিলনে এক সকরুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। কুমা বলে সে প্রজার দ্বারে দ্বারে গিয়ে আবেদন করবে আবার মলহর রাওকে বরোদার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে। মলহর রাও বলেন কুমাবাই বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী, সে অনায়াসে তা পারবে।

মলহর রাওকে নিয়ে গাড়ী ষ্টেশন ত্যাগ করলে রানী লক্ষ্মীবাই উন্মত্তভাবে প্রবেশ করেন। কুমা বলে যে রাজমহিষীর এ স্থানে আসা উচিত নয়। লক্ষ্মীবাই আর্ত্তস্বরে বলেন আর লজ্জা কি? মহারাজের অভাবে এখন কি উপায় হবে? সন্তানের কি হবে?

কুমা বলে যে কাছেই দেবমন্দিরে তার পাল্কি রয়েছে। বাড়ীতে শূন্যতার মধ্যে, শোকের মাঝে ফিরে যেতে হবে। মহারাষ্ট্রের গৌরব রবি অস্ত গেল।

গুইকওয়ার নাটক।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রণীত।

THE

UNFORTUNATE MOLHAR RAO,

কলিকাতা,

১৮৭৫

চিৎপুর রোড, বৃন্দাবন বসাকের লেন,

১৯নং জ্ঞানোল্লাস যন্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণলাল চন্দ্রের দ্বারা প্রকাশিত।

মুল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

গুইকওয়ার নাটক

(তিন অঙ্কের ছোট নাটিকা)

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নট ও নটী দর্শকদের সামনে এক নূতন নাটক পরিবেশনে মনস্থ করে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে চক্রান্ত সভায় বরোদার রেসিডেন্ট কর্ণেল ফেয়ার বরোদার রাজ কর্মচারী দামুদর পন্থ ও অন্যান্য কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তি কোন এক গুরুতর বিষয়ে আলোচনায় রত। এবিষয়ে এরা সকলেই একমত, বরোদার রাজা মলহর রাওকে কৌশলে সিংহাসনচ্যুত করা হবে। এদের মতে রাজার অযোগ্যতা অনেক, তিনি আপন জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছেন, শেষে বারাঙ্গনা বিবাহ করে প্রজাদের বিরাগভাজন হয়েছেন। এখন রেসিডেন্ট যদি এর একটা বিহিত করেন।

রেসিডেন্ট—তোমরা বুঝতে পাচ্চো এর মধ্যে এক কথা আছে। ও'র উপর আমাদের তো কোন কর্তৃত্ব খাটবেনা। আর একটা দোষ আগে দেখতে পাই, তার পর যা হয় তা কোরবো।

কূটবুদ্ধি কর্ণেল পরামর্শ দেন যে দামুদর প্রমুখ সভায় উপস্থিত গণ্যব্যক্তিরা বরোদার ইংরেজ প্রতিনিধি অর্থাৎ রেসিডেন্টের উদ্দেশ্যে লেখা এক এজাহারে সাক্ষর দেবেন। এজাহারের বক্তব্য যে মহারাজ মলহর রাওয়ের স্বেচ্ছাচার ও অযোগ্য শাসনে বিরক্ত হয়ে রাজকর্মচারীরা রেসিডেন্টকে আবেদন জানাচ্ছেন যেন এর প্রতিবিধান কিছু করা হয়, বৃটিশ গভর্ণমেন্ট এ আবেদনে কর্ণপাত করেন ভালই, নচেৎ স্বাক্ষরকারীরা অন্য ব্যবস্থা নেবে।

স্বাক্ষরিত এজাহার হাতে নিয়ে রেসিডেন্ট এবার জানান যে মলহর রাওকে সিংহাসনচ্যুত করতে হলে গুরুতর কিছু দোষ দেখাতে হবে। মহারাজের বিরুদ্ধে রেসিডেন্টকে বিষপ্রয়োগের অপবাদ দেওয়া যেতে পারে। চক্রান্তকারীরা সকলেই এ প্রস্তাবে সায় দেয়।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে রাজঅন্তঃপুরে রাজা মলহর রাও রানী

লক্ষ্মীবাই ও রানীর সহচরী এমিনা আলাপ আলোচনায় রত। রাজার সান্নিধ্যে লক্ষ্মীবাই পুলকিত, বলেন—"আজ আমার কি শুভদিন। একত্রে নির্ভয়ে কথোপকথনে রত মহারাজ। আজ আমার সুখের দিন নয়?" উত্তরে মলহর রাও বলেন যে মহারাজেরও ঐ একই কথা, তিনি মহিষীর চিরদাস।

রানীর সহচরী এমিনা বলে যে, অনুগত দাস্যভাব মহারাজকে মানায় না। —"মহারাজ! সহকার তরু ভিন্ন মাধবীলতা যেমন লুণ্ঠিত থাকে, আমার প্রিয় সখি এতদিন তাই ছিলেন। এক্ষণে আপনার স্পর্শনে তাঁহার দৃঢ় অবলম্বন হইল, ইহাপেক্ষা আর সুখের দিন কি হইবে।"

এমিনার আরও দু'চারটি মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট হয়ে মলহর রাও তাকে হীরার আংটি উপহার দেন।

এমন সময়ে প্রতিহারি এসে মহারাজের হাতে এক চিঠি দেয়। এটি রেসিডেন্ট সাহেবের লেখা। চিঠির বক্তব্য এই যে কোম্পানি বাহাদুরের কাছ হতে এক জটিল দুর্বোধ্য এজাহার রেসিডেন্সিতে এসেছে যার মর্ম একবর্ণও বোধগম্য হচ্ছে না। মহারাজের সঙ্গে মিঃ ফেয়ারের বন্ধুত্ব সত্ত্বেও তিনি মহারাজকে কোন বিষয়ে অনুরোধ করতে পারেন না। কিন্তু রেসিডেন্ট অসুস্থ হওয়ায় এবং তিনি স্বয়ং রাজসভায় আসতে না পারায় যদি মহারাজ আজ সন্ধ্যায় অনুগ্রহ করে রেসিডেন্সিতে পদধূলি দিয়ে বাধিত করেন ইত্যাদি।

রেসিডেন্টের চিঠি পেয়ে মলহর রাও যাত্রার আয়োজন করেন। এমিনার অনুরোধ আজ যাত্রার আগে মহারাজের বেশবিন্যাসে রাজমহিষী ও সে তাঁর সেবা করবে।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে রেসিডেন্সির চক্রান্তসভায় ডাক্তার, কর্ণেল ফেয়ার, দামুদর পন্থ ও অন্যান্য দেশীয় মান্য লোকজন গোপন পরামর্শে রত। কর্ণেল সাহেবের সরবতে বিষ ছিল, এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে ডাক্তার এই প্রমাণপত্র লিখে দিতে রাজী। সলাপরামর্শকারীরা ঘুষের সঙ্গে এই আশ্বাসও দেয় যে প্রাণ গেলেও একথা প্রকাশ করবে না। এবার ডাক্তারের আগ্রহে ফেয়ার সাহেব বরোদা রাজ্য সম্পর্কে কোম্পানির গুপ্ত নির্দেশ পড়ে শোনান। এতে ছিল কোন সূত্রে মহারাজকে রেসিডেন্সিতে আনা হবে, তারপরে তাঁর সম্বন্ধে কোম্পানির নিম্নধারণা পড়ে শুনিয়ে তাকে ঘেরাও, গ্রেপ্তার ও পরবর্ত্তী নির্দ্দেশ না আসা পর্য্যন্ত রেসিডেন্সিতে বন্দী রাখা হবে।

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রেসিডেন্সির সদর কামরায় রক্ষীবেষ্টিত মলহর রাও, রেসিডেন্ট সাহেব, দামুদর পন্থ, ডাক্তার ও অন্যানা লোকজন

উপস্থিত। মহারাজকে উদ্দেশ করে রেসিডেন্ট জানান যে কোম্পানির এস্তাহারে যে নির্দেশ আছে তা' নিম্নরূপ,—

"প্রথমতঃ। কোন প্রকারে মহারাজকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া তোমার বাটিতে আনিবে"।

"দ্বিতীয়তঃ। কোন প্রকারে তাঁহাকে ঘেরোয়া করিয়া আমাদের পশ্চাৎ লিখিত রায় পাঠ পূর্ব্বক শ্রবণ করাইবে যে, তুমি বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে দণ্ডনীয় হইলে, সিংহাসনচ্যুত হইলে, বরদার রাজসিংহাসন আর তোমায় সাজে না। পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত আমরা যাইয়া করিব ; অদ্যাবধি তুমি বন্দি"।

"তৃতীয়তঃ। তোমার অপরাধ কতিপয় স্বাধিন রাজাদিগের দ্বারা বিচারিত হইয়া পরে বিবেচিত হইবে"।

"চতুর্থতঃ। তুমি রাজনীতিজ্ঞ নহ ; তোমার প্রজাবর্গেরা তোমার শাসনে অসন্তুষ্ট, কতিপয় কারণে ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রযুক্ত তোমাকে সিংহাসনচ্যুত করিলাম"।

এরপর সরকারী কেতায় রেসিডেন্ট জানান যে এ ব্যাপারে তিনি কোনোভাবে দায়ী নন ; তিনি সরকারী হুকুম তামিল করছেন মাত্র। স্তম্ভিত মলহর রাও—"একি! শিকারির কৌশল নিপাতিত জালে সিংহ নিপতিত? পরিত্রাণের কোন উপায় নাই ; একি ফুলদাম দিয়া শাল্মলী বৃক্ষ ছেদন, না নলবনে হস্তি বন্ধন। আমার ভ্রম উপস্থিত, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

রেসিডেন্সির রক্ষীরা মহারাজের দিকে অগ্রসর হ'তেই মলহর রাও রুখে দাঁড়ান, তলোয়ার টেনে নিয়ে গর্জে ওঠেন, "কে তোরা আমার চতুষ্পার্শ্বে কেন ; কি প্রয়োজন।"

রক্ষাহীন একা মলহর রাও বিপক্ষের হাতে অল্পক্ষণের মধ্যেই বন্দী হলেন।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে বিচার সভায় ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার ভ্যালেন্টিন, সার্জন কোচ সাহেব, প্যাতওয়ালা, হোলকার ও গোয়ালিয়রের তিন রাজা নিজ নিজ আসনে অবস্থান করছেন। প্রথমেই রেসিডেন্ট কর্ণেল ফেয়ারের তলব হয়। কর্ণেল সাহেব শপথ নিলে ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন,—

—"মহারাজা গুইকওয়ার তোমাকে কেমন কোরে বিষ খাওয়ায়?"

রেসি—আমাকে মিছারির সরবতের মধ্যে বিষ দিয়াছিল।

ম্যাজ—তুমি খাইয়াছিলে?

রেসি—না আমি মুখে করিয়াছিলাম।

ম্যাজ—কেমন তার?

রেসি—ঝাল ঝাল, কসা কসা।

ম্যাজি—কি বিষ ছিল ?

রেসি—হীরার গুঁড়া আর আরসেনিক।

ম্যাজি—তুমি কেমন কোরে জানলে ?

রেসি—আমার খাওয়াতে সন্দেহ হওয়াতে ডাক্তার আনাইয়া পরীক্ষা পূর্ব্বক জানি।

ম্যাজি—কে আনিয়ে দেয় ?

রেসি—রাজ সহচরী এমিনা।

এমিনার ডাক পড়ে। সে বলে যে রাজবাড়ীতে সে মহারাণীর পরিচর্য্যা করে।

ম্যাজি—তুমি বিষপূর্ণ মিছরির পানা রেসিডেন্টের কাছে এনেছিলে কেন ?

এমিনা—আমাকে পাঠিয়েছিল, এনেছিলাম।

ম্যাজি—কে পাঠায় ?

এমিনা—মহারাজা।

এরপরে ব্যারিষ্টার ভ্যালেন্টিন প্রশ্ন করেন,—

—"হাঁগা বাছা সে গেলাসটা কিসের ?"

এমি—আপনার কেমন কথা ; রাজার বাড়ির গেলাস, রূপোর বই আর কি থাকে ?

ভ্যা— এক গেলাস মিছরির পানা ছিল ?

এমি—ছিল।

ভ্যা—কেমন রং ?

এমি—দেখ দেখি ; কেমন রং, পানার যেমন রং হয় তেমনি রং। আমি কি জানি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা কর।

ডাক্তার এসে শপথ গ্রহণ করলে ভ্যালেন্টিন প্রশ্ন করেন, সরবতের বিষ ডাক্তার কিভাবে প্রমাণ করেছেন।

ডা—আমি তীক্ষ্ন পরীক্ষার পর দেখিলাম যে ইহাতে আর্‌সেনিক নামক বিষ ও কতকগুলি হীরকচূর্ণ আছে।

ভ্যা—আচ্ছা তুমি ডাক্তার ?

ডা—আজ্ঞে হাঁ।

ভ্যা—বল দেখি, কতখানি আরসেনিক্ দিলে মানুষ মরে ?

ডা—আঁ, আজ্ঞে তা জানিনা।

ভ্যা—আচ্ছা বল দেখি তুমি পরীক্ষা কোরেছিলে হীরকচূর্ণ ছিল। ছিল কি ?"

ডা—আজ্ঞে ছিল।

ভ্যা—জল অপেক্ষা হীরক কতগুণ ভারি ?

ডা—আজ্ঞে, আজ্ঞে তা জানি না।

ভ্যা—তবে তুমি কি প্রকার পরীক্ষা করেছ।

ডা—দামুদর পন্থ যে কিনে এনেছে তাকে জিজ্ঞাসা করুন।

এবারে দামুদর পন্থের তলব হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় দামুদর ম্যাজিস্ট্রেটকে জানায় যে মহারাজা তাকে সাত রতি হীরাচূর্ণ আর দুই ভরি আরসেনিক আনতে বলেন।

ভ্যালেন্টিন—কত টাকা দেন ?

দামু—তিনি দেবেন কেন আমার কাছেইত ছিল।

ভ্যা—তোমার খাতায় খরচ লেখা আছে ?

দামু—আজ্ঞে আমার হিসাব পত্র কিছু থাকে না।

দামুদরের পরে হীরার ব্যবসায়ী ও ওষুধের দোকানদারকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। হীরার জহুরী বলে সে দামুদরকে সাত রতি হীরা বিক্রি করেছে; আর ওষুধের দোকানী ভ্যালেন্টিনের প্রশ্নে জবাব দেয় যে বিষ খেলে মানুষ মরে জেনেও সে দামুদরের কাছে আর্সেনিক বিক্রি করেছে কারণ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দেখালে ত জিনিষ না দিলেও চলেনা।

ভ্যালেন্টিন ভারতবর্ষে বিচারের নমুনা দেখে অবাক। পরস্পর বিরোধী সওয়াল আর সাক্ষ্য প্রমাণের এত দুর্বলতা সত্ত্বেও এদেশের আদালতে এতবড় ধাপ্পাবাজি চলে কী করে? উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করে বলেন,—

"কোন বিষয়েরই স্থিরতা নাই; ভারতবর্ষের পুলিশ কর্মচারিদিগের অসীম ক্ষমতা; কোন প্রকারেই দোষ প্রমাণ ঠিক হইতেছে না। হঠাৎ একজন মাননীয় লোকের শ্রীভ্রষ্ট; এমন নিয়ম কখন দেখি নাই, এমন নিয়ম কখন শুনিনা, আমার জীবন ধারণাবধি এই প্রথম ভারতবর্ষের বিচারালয়ে দণ্ডায়মান হইলাম। এখানকার ম্যাজিস্ট্রেটকে ধন্য; এখানকার রাজাদিগের বিবেচনাকে ধন্য; কোম্পানি সংক্রান্ত নিয়মের স্থায়িত্ব কিছুমাত্র নাই। রেসিডেন্ট সাহেব! তুমি একাজের উপযুক্ত লোক নও। আমার আর বাক্যব্যয়ে কি ফলোদয়; ধন্য সততা! ধন্য বদান্যতা! ধন্য কৃতজ্ঞতা! ধন্য ধৈর্য্যতা! রাজাগণ! গুইকওয়ারের পদচ্যুতিতেই নির্ণিত রহিল।"

তৃতীয় অঙ্কের, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মাদ্রাজ সহরের রাজ-কারাগারে বন্দী মলহর রাও নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করছেন। দুরাত্মা দামুদরের মনে

এত ফন্দিও ছিল। বিষপ্রয়োগের মিথ্যা অপবাদ যার বিন্দুবিসর্গও তিনি জানেন না, যার ফলে আজ মহারাজের এই ভাগ্য বিপর্য্যয়; স্বপ্নেও কি তিনি কখনও শনির এ দশা আসবে একবারও ভাবতে পেরেছিলেন !

কারাগারে মহারাণী লক্ষ্মীবাই মলহর রাওয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁর শ্রীহীন দীন মূর্ত্তি আর বন্দী দশা দেখে আকুল হয়ে লক্ষ্মীবাই বলেন,—

"বসুমতি মা ! তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। আর এ দুর্দ্দশা দেখিতে পারি না, প্রাণ যে যায়, কি করি; বুক ফেটে যায়, গেলেম, নাথ। সাহস দাও, ধৈর্য্য ধর, অস্ত্র সংগ্রহ কর নতুবা নিস্তার নাই; কতদিন বন্দি থাকিবে? কতদিন আমি এ অবস্থা দেখিব। বল বল নাথ। আমার কথা শুনবে, আমি স্বয়ং যুদ্ধের আয়োজন করি আমাকে অভয় দাও, আমি যুদ্ধে প্রবেশ করি, প্রাণ যায়, বুক ফাটে অধিকক্ষণ থাকিবার যো নাই, বল ?"

মল—মহিষী ! আমি আর ; — —

লক্ষ্মীবাই—আমি এখন চল্লেম, আমি কৃতঘ্ন নই, আমি পাপিয়সী নই, আমি দামুদর নই, পুনশ্চ আস্‌বো।

লক্ষ্মীবাইয়ের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

বাঙ্গালির মুখেছাই

প্রহসন।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা

মাণিকতলা ষ্ট্রীট ৭৯ নং

পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রে

মুদ্রিত।

১২৮২ সাল।

4 annas. মূল্য চারি আনা।

বাঙ্গালীর মুখে ছাই

আলোচ্য প্রহসনে খেতাবলোভী বাঙ্গালীর রাজা, রায় বাহাদুর ইত্যাদি নামের জন্য সর্ব্বস্ব হারাবার কাহিনী রয়েছে। গত শতকের বাবুসমাজে আভিজাত্যের প্রতি আসক্তি কম ছিল না। খেতাবের জন্য বাঙালীর মোহ সুচতুর ইংরাজ সহজেই ধরে ফেলে। জাতির এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে সরকার বদান্যহাতে গত শতকের সত্তর দশক থেকে খেতাব বিলোতে থাকেন অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখী মারবার ব্যবস্থা করেন।

প্রথমতঃ খেতাবের বিলিব্যবস্থা করে সমাজের কিছু প্রভাবশালী লোককে সরকার হাতের মুঠোয় আনেন। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা পড়ে জানা যায় যে খেতাবপ্রাপ্ত বাঙালীদের মধ্যে এক বশম্বদ ভাব দেখা যায়, কারণ সরকারের দোষ ত্রুটির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলে খেতাব হারাতে হ'তে পারে সরকার এই ইংগিতও দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ এই সমস্ত খেতাব—রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর ইত্যাদির মূল্য আসলে কানাকড়িও নয়, যেহেতু সরকারের উচ্চপদ ইংরাজের জন্য সংরক্ষিত ছিল, আর খেতাব নীচুস্তরের পদ ছিল দেশীয়দের জন্য। আগের আমলে নবাবদের সময়ে খেতাবধারীরা জায়গীরপ্রাপ্ত হতেন। সিপাহীযুদ্ধের পরে বিদ্রোহীদের বাজেয়াপ্ত জায়গা জমি সরকার রাজভক্তদের কিছু কিছু দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে জায়গীর বণ্টন দূরের কথা, কিছু কিছু খেতাব ইংরেজ আবার টাকার বিনিময়ে বিলোতে থাকেন। সাধারণ মানুষও হিসাব করতে বসে কত হাজার টাকায় কোন্ খেতাব মেলে। পয়সাওয়ালা অনেক অযোগ্য রাম শ্যাম রাজা, রায়বাহাদুর হ'বার ফলে খেতাবের মর্যাদা কমে যায়। কয়েক বছরের Report on Native Papers পড়লে জানা যায় সে সময়কার প্রায় সমস্ত বাংলা কাগজ সরকারের এই খেতাব বণ্টন নীতির তীব্র সমালোচনা করেছিল। একটি কাগজ যা প্রশ্ন করে বাংলায় পুনর্তর্জমা করলে তা দাঁড়ায়ঃ—"তা হলে প্রশ্ন আসে সরকার যদি কাউকে সম্মান প্রদর্শন করেন, তিনি কি তা' গ্রহণে অসম্মত হবেন? যদিও সরকারী খেতাব গ্রহণে গররাজী হ'লে ব্যক্তির পক্ষে তা' বেমানান দেখায়, কিন্তু সমাজের আপত্তি জানাবার এই অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা।" । (সাধারণী, ৬ই জানুয়ারী ১৮৭৮ সাল)।

দীনবন্ধু মিত্রের জীবনচরিত প্রসঙ্গে সরকারী খেতাব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে,—

"কলিকাতায় অবস্থিতি কালে, তিনি রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই উপাধি যিনি প্রাপ্ত হয়েন, তিনি আপনাকে কতদূর কৃতার্থ মনে করেন বলিতে পারি না। দীনবন্ধুর অদৃষ্টে ঐ পুরস্কার ভিন্ন আর কিছু ঘটে নাই। কেননা, দীনবন্ধু বাঙ্গালি কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর বেতন পাইতেন বটে, কিন্তু কাল-সাহায্যে প্রথম শ্রেণীর বেতন চতুষ্পদ জন্তু-দিগেরও প্রাপ্য হইয়া থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রথম শ্রেণীভুক্ত গর্দ্দভ দেখা যায়।"

যাদববাবু একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সমাজে দাতা বলে সুনাম আছে। ইংরেজ মহলেও যাদববাবুর আনাগোনা। ইদানীং যাদববাবু চেষ্টায় আছেন দু-পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে যদি ইংরেজদের থেকে রায় বাহাদুর কি রাজা বাহাদুর একটা খেতাব পাওয়া যায়।

চট্টগ্রাম নিবাসী ব্রজদুলাল গোস্বামী কিছু অর্থ সাহায্যের আশায় যাদববাবুর বৈঠকখানায় আসেন। গোস্বামী মহাশয় নিবেদন করেন যে তার গৃহে দুর্গোৎসবের আগে প্রতি বছর দু'মাস চৈতন্য চরিতামৃত ও ভাগবত পাঠ হয়, সংকীর্ত্তন চলে, সে সময় সন্ধ্যায় শ্রোতাদের কিছু জলযোগ করতে হয় এবং তার খরচ গ্রাম-চাষীদের দানে চলে যায়। এ বছর দেশে বৃষ্টি না হওয়ায় এ খরচ আসে কোত্থেকে। গোস্বামী ভবানীপুরে হরিচরণ রায় ও অন্যান্য লোকের মুখে যাদববাবুর দানের সুখ্যাতি শুনে সোজা এখানে চলে এসেছেন।

যাদববাবু—না বাবু, আমার এখন হাতে বড় কিছু নাই। তাই বলুচি আমার কাছে এখন কিছু হবে না, আমি হালে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছি।

ব্রজদুলাল—(স্বগত) ইস্ এ বাবু ব্যাটা কি কৃপণ, আর কৃপণও ত বলা যায় না। এহত স্বীয় মুখে স্বীকার করলে যে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে, বোধ হয় এ সব মিথ্যা কথা হুঃ—যে ব্রাহ্মণকে হাত তুলে একটা পয়সাও দিতে পারলে না, সে আবার পাঁচ হাজার টাকা দেবে। তবে চৌধুরী বাবু কি বুঝে আমাকে এঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। ব্যাটার যা দাতব্যশক্তি তা-ত দেখাই গেল। (প্রকাশ্যে) তবে মশাই, আপনার কি এই ইচ্ছে যে আমি আশা করে এসে নিরাশ হব ?

যাদববাবুর কাছ হতে কোনো সাহায্য না পেয়ে ব্রাহ্মণ ধুলোপায়ে বিদায় নেন। এর পরই যাদববাবু এক রেজেষ্ট্রি চিঠি পান। চিঠিটি আসে লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের কাছ হতে। বেলভেডিয়ারে এক মিটিং হবে, তারই নোটিশ। যাদব-বাবুকে সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে। কথাপ্রসঙ্গে বৈঠকখানার দুই আড্ডাসঙ্গী

পরাণ ও বিপিনকে যাদববাবু জানান যে গতবারের মিটিংয়ে বিষয়বস্তু ছিল, সহরে যত কানা, কুঁজো, খোঁড়া আছে, তাদের থাকবার একটা স্থানের বিষয়।

পরাণ—তবে আবার এতেও তো সাবস্‌ক্রিপসন দিতে হবে।

যাদববাবু—পাঁচজন বড় লোকের জন্যই ইংরাজরা বাঙ্গালিদেরকে মানুষ জ্ঞান করে। তুমি সাবস্‌ক্রিপসন লিষ্টিতে দেখ দিকি ইংরাজের নাম কটা?

বিপিন—আজ্ঞে হাঁ তা বৈকি, কটা বাহাদুর অপেক্ষা কাল-বাহাদুরেরাই বাহাদুর।

যাদব—আরও কি জাননা যদি একটা রায় বাহাদুর কিম্বা রাজা বাহাদুর টাইটেল সামান্য দু' হাজার কি পাঁচ হাজার টাকায় পাওয়া যায়, এর বাড়া আর সুখের বিষয় কি?

বাড়ীর অন্তপুরে যাদবগিন্নী কাত্যায়নি ও প্রতিবেশিনী বাদমির মধ্যে সুখ দুঃখ নিয়ে আলোচনা হয়। একথা সেকথার পর কাত্যায়নি জানান যে কর্ত্তার মনে কী এক খেয়াল চেপেছে, রোজই নাকে মুখে দুটো গুঁজে কী এক মিটিং করতে যান। তারপরে কী এক রহস্যজনক কাজে দু হাতে জলের মতো টাকা খরচ করছেন, তার জন্য বাড়ী বন্ধক দিতে হয়েছে। স্ত্রীর যে আটপৌরে গহনা কটা বাকী রয়েছে, সেকটাও নেবার জন্য যাদববাবুর চেষ্টার অন্ত নেই, দুবেলা মিষ্টি কথা, সাধাসাধির পালা চলে। স্ত্রী যদি কটু কাটব্য করেন, তাহলে যাদববাবু বলেন, তোমরা মেয়েমানুষ কিছু বোঝনা, এই দেখ না শিগগিরই আমি তোমায় রানীবাহাদুর করে দিচ্চি।

লোক জানাজানি হতে বাকী থাকে না যে রায় বাহাদুর হবার লোভে যাদববাবু তার বিষয় সম্পত্তি ফুঁকে দিয়েছেন। পাঁচজনের সামনে সবচেয়ে বেশি অপদস্থ হতে হয় যাদববাবুর ছেলে ক্ষেত্রবাবুকে। পরিচিত বন্ধুমহলে, রাজাবাবুর সন্তান এই উপহাস জোটে। পথে ঘাটে চেনাজানা বন্ধুদের এড়িয়ে চলতে হয়। দৈবাৎ সামনে পড়ে গেলে বিদ্রূপ করার সুযোগ কেউই ছাড়ে না। সেদিন হঠাৎ তিন চার জনের এক দলের সামনে ক্ষেত্রবাবু পড়ে যান। শুরু হয় ধারালো বিদ্রূপ।

১ম—এই দেখ দিকি আজ বাগানের বাহার হয়েছে, চাঁদ না উঠলে কি গোয়ালের শোভা।

ক্ষেত্র—ছি ছি তোমরা আমার স্কুলের ফ্রেন্ড, তা তোমাদের কি এ প্রকার করা উচিত?

১ম—আরে বাঃ এই যে ইংরেজের মর্য্যাদা খুব বাড়াতে শিখেছ।

৩য়—না হবে কেন, হাজার হোক বিশ্বকর্ম্মার পুত্র ত।

২য়—বিশ্বকর্ম্মাটা কিসে?

৩য়—বেয়াল্লিশ-কর্ম্মার অনুরোধে।

২য়—এঁকে বেয়াল্লিশকর্ম্মা ঠাওরালে কিসে?

৩য়—না হবে কেন, বিশ্বকর্ম্মা যেমন অনেক প্রকার কৌশল ও বিস্তর পরিশ্রম দ্বারা যেরূপ অনেকগুলি কীর্ত্তি রাখিয়াছেন, এঁর পিতাও সেই প্রকার টাকা খরচরূপ কৌশল এবং খোসামোদ জন্য পরিশ্রম দ্বারা রায়বাহাদুর ও রাজাবাহাদুর প্রভৃতি কতকগুলি রাখিতে চাহেন।

১ম—বাহোবা বেশ সিমিলি। তা আমিও এবার থেকে বেগর সিমিলিতে কথা কইবনা। এঁর পিতা পরকাল রূপ বেগুন খেতে দুর্ব্বুদ্ধিরূপ সিউনি দ্বারা অপযশ বারি সেচন করিতেছেন।

ক্ষেত্র—(স্বগত) হায় এ সকল কথাও আমাকে শুনতে হোলো।

আরও পাঁচকথার পরে ইয়ার বন্ধুরা বিদায় হন। কিন্তু আজকের অপমান যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তীব্র ক্ষোভে ক্ষেত্রবাবু জীবনকে ধিক্কার দিতে থাকেন,—

"ওদেরই বা দোষ কি, খালি যদি ওরা বলত তাহলে দোষ দিতে পারতেম, কিন্তু সমস্ত লোকেই যখন আমাকে ঐরূপ উপহাস করে তখন আর ওদের দোষ কি। বিধাতা আমাকে এমন দশায় না ফেল্লে কি কখন ওরা আমায় একথা বলতে সাহস করে। পিতাকে এত করে বোঝাই কিন্তু তিনি কিছুতেই বোঝেন না। এ বিষম রোগের ঔষধই বা কি। এসকল লোকগঞ্জনা খেয়েও কি পিতা এখনও নয়ন উন্মিলন করিলেন না। ওঁর অভিপ্রায় কি; উনি আমার খাবার পরবার মত ত কিছুই রাখলেন না।"

মনে মনে ক্ষেত্রবাবু এক বিষম সংকল্প নেন। আজ এক হেস্ত নেস্ত করতে হবে বাপকে বুঝিয়ে বলে। যদি শোনেন, সন্তানের ভালমন্দ বুঝে আত্মক্ষয় ও অহমিকার পথ ত্যাগ করেন ভালই, নচেৎ এ জীবন রাখা আর না-রাখা দুইই ক্ষেত্রবাবুর কাছে সমান মনে হয়। একবার মায়ের মুখ স্মরণ হয়,—

"আমি আপনার জন্য ততদূর ভাবিনা, যদি কাল বসাৎ পিতা পরলোক যাত্রা করেন তা হলে আমার অভাগিনী জননীর কি গতি হবে এবং আমিই বা দেশস্থ একজন এত বড় সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র হয়ে কি করে লোকের কাছে ভিক্ষা করব। না তা আমি কখনই পারব না, আমার শরীর কি রক্তাস্থি নির্ম্মিত নয়।"

এক নিদারুণ ক্ষোভে ক্ষেত্রবাবু এক কঠিন শপথ নেন, হয় বাপের চৈতন্যোদয় নয় আত্মহত্যা।

এর পরে যাদববাবুর অন্দরমহলে ক্ষেত্রবাবুকে পাওয়া যায় গলায় দড়ি, ঝুলন্ত অবস্থায়। এক প্রচন্ড শোক গোটা পরিবারে নেমে আসে। ছেলের এই শোচনীয় মৃত্যু অসহ্য মনে হওয়ায় কাত্যায়নি বঁটির আঘাতে নিজের জীবন নেন।

এভাবে স্ত্রী, পুত্র দুইই হারিয়ে যাদববাবুকে তার কান্ডজ্ঞানহীনতার সেলামি দিতে হয়। এতদিনে মনে হয় আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়। স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী মনে হয়। এ জীবনের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সুখ সম্পদ, আত্মীয় প্রিয়জন সবই গেল, আর কেন, একটা খেতাবের মোহে সংসার ঐশ্বর্য্য সমস্তই লাটে উঠল। শুধু হায় হায় ছাড়া যাদববাবুর কিছু বাকী থাকল না।

হতভাগ্য-শিক্ষক !!

(নাটকাকারে লিখিত)

"— প্রভুর্দ্ধনপরায়ণঃ সততদুর্গতঃ সজ্জনো
নৃপাঙ্গনগতঃ খলো মনসি সপ্তশল্যানি মে ॥"

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

ঢাকা গিরিশযন্ত্র ।

১২৭৮। ১৫ই ফাল্গুন।

মূল্য ।০ আনা।

শ্রীসেখ মওলাবক্স প্রিণ্টার।

হতভাগ্য-শিক্ষক

প্রবোধচন্দ্র আতাইগঞ্জ গ্রামে সাহায্যকৃত বা 'এডেড' স্কুলে পণ্ডিতী করেন। মাস মাস পনর টাকা বেতন বাবদ হাতে আসার কথা, কিন্তু কথা থাকলেই বাস্তব সবসময় সে অনুসারে চলে না। কেন চলে না সে ব্যাখ্যা প্রবোধচন্দ্র বাল্যবন্ধু দয়ালকে সবিস্তারে দেন।

দয়াল স্থানীয় জমিদারের তহশীলদার। বাস করেন অন্যগ্রামে। আতাই-গঞ্জে কী উপলক্ষ্যে এসে শোনেন বাল্যবন্ধু প্রবোধ এ গ্রামের সাহায্যকৃত স্কুলের পণ্ডিত হয়েছেন। প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এসে দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ আলাপ হয়। দু-চার কথার পরে প্রবোধচন্দ্র জানান,—

"আমার পরম সৌভাগ্য যে এমন কুস্থানে থেকে আর কুচাকরী করেও আপনার সাক্ষাৎ পেলাম।"

বিস্মিত দয়ালের প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত একে একে অনেক কথাই বলেন। মাস শেষে পনর টাকা বেতন হাতে আসে না। সাহায্যকৃত স্কুলের নিয়ম এই যে, স্থানীয় লোকেরা যত চাঁদা দেন, সরকারও তত সাহায্য দেবেন। তার ওপর ছাত্র বেতন হ'ল স্কুলের উপরি আয়। প্রবোধচন্দ্রের স্কুলে স্থানীয় চাঁদা, খাতার হিসাব অনুসারে পঁচিশ টাকা। গ্রামে অনেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি রয়েছেন। এদের সবলেরই প্রায় স্বচ্ছল অবস্থা, এবং বিদ্যোৎসাহী বলে পরিচয়ও দিয়ে থাকেন। গ্রামে স্কুল গড়তে যেয়ে, এদের তরফ থেকে সভা, সমিতি, বক্তৃতার আয়োজন হয়। ডেপুটি ইন্সপেক্টার সেই সভায় আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। চাঁদার খাতায় সভায় উপস্থিত সুধীরা যার যা ইচ্ছা স্বাক্ষর করেন।

হিসাবে দেখা গেল সভায় মাসিক চল্লিশ টাকার চাঁদা স্বাক্ষর হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে ডেপুটিবাবু চাঁদাদাতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন যে: মাসিক ঐ পরিমাণ টাকা গভর্নমেন্ট হতে মঞ্জুর করবার ব্যবস্থা করবেন।

এরপর শুরু হয় প্রতিশ্রুত চাঁদা আদায়ের উদ্যোগ।

দয়াল—স্কুল না বসতেই চান্দা আদায় ?

প্রবোধ— স্কুল ঘর আর বেঞ্চ টুল সব তৈয়ার করা'ত চাই।

দয়াল—ভাল বলে যান।

প্রবোধ—স্কুল স্থাপনার প্রধান উদ্যোগীরা চান্দা আদায়ে প্রবৃত্ত হলেন, সভায় প্রথমে অনেকে মাসিক চান্দা দিতে স্বাক্ষর করেন, কিন্তু দেবার সময় কেউ বা তা বার্ষিকে ফেললেন, কেউ ২ বা স্বাক্ষরের অধিক কিছু দিয়ে একেবারে চান্দা হতে নাম খারিজ করে নিলেন।

দয়াল—(সবিস্ময়ে) বটে তারপর ?

প্রবোধ—প্রথমবারে গড়ে ৫০ টাকা উঠ্‌লো, তাই দিয়ে স্কুলের ঘর, টুল, বেঞ্চ প্রস্তুত করান হোল, ডিপুটিবাবু ২৫ টাকা বেতনে একজন মাষ্টের আর ১৫ টাকা বেতনে আমায় পণ্ডিত নিযুক্ত করে পাঠালেন। (সজল নয়নে) মশায় এই সুখের পণ্ডিতী নিতেও আমাকে কম কষ্টভোগ কত্তে হয় নাই।

দয়াল—কেমন ? আপনি না নর্ম্মাল স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়ে সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন ?

প্রবোধ—মশায়, এখনকার দিনে সার্টিফিকেট হতে উপরোধের জোর জেয়াদা। তা যাহোক পণ্ডিত হয়ে এলেম। যতদূর সাধ্য পরিশ্রম করে ছাত্রদিগে পড়াতে লাগলেম, দু মাস পর গবর্নমেন্ট ২৫ টাকা সাহায্য মঞ্জুর কল্লেন।

দয়াল—কেন ২৫ টাকা যে ? চান্দায় না ৪০ টাকা স্বাক্ষর হয় ?

প্রবোধ—মশায়, স্বাক্ষরের বেলায় অনেকরে পাওয়া যায় 'কিন্তু ম্যাও ধরবার সময়' অনেকে পেছু হটেন, যারা এই ২৫ টাকার চান্দায় রইলেন তাঁদের মহিমা শুনুন ত।

এরপরে প্রবোধ মাষ্টার আরও জানান যে বিস্তর হাঁটাহাঁটি চেষ্টা সত্ত্বেও মাস মাস দূরে থাকুক, তিন চার মাসেও একমাসের চাঁদা আদায় হয় না। প্রবোধচন্দ্রের ওপরওয়ালা, ২৫ টাকার মাষ্টার পরামর্শ দেন যে ডেপুটিবাবুর নির্দ্দেশ মতো—চাঁদা আদায় না হলেও হয়েছে একথা বিলে লিখে পাঠাতে হবে, নইলে গবর্নমেন্টের টাকা পাওয়া যাবে না।

দয়াল—মশায়! কষ্ট হবেন না, এত একপ্রকার আপনাদের গবর্নমেন্টকে ঠকান হোল।

প্রবোধ—তার সন্দেহ কি ? মশায় যখন প্রথম এইরূপ স্বাক্ষর কোত্তে কলম ধরি, তখন যে মন কিরূপ দুঃখিত হয়েছিল, তা জগদীশ্বরই জানেন। হাতের কলম আর চলে না। আমরা পশু হতেও অধম—পাপিষ্ঠ, জেনে শুনে প্রতারণায় লিপ্ত হলেম! কি করি পেটের দায়ে সকলি স্বীকার। এখন গবর্নমেন্টের দাতব্য আর ছাত্রদের বেতনই আমাদিগের জীবনোপায়।

দয়াল—ছাত্রবেতন কত আদায় হয় ?

প্রবোধ—টাকা দশ।

দয়াল—তবে যেন আপনাদের স্কুলের ২৫ টাকা সরকারী দাতব্য আর ছাত্রদের বেতন ১০ টাকা, মোটে ৩৫ টাকা ওঠে, মাষ্টারের বেতন ২৫ টাকা গেলে বাকী থাকে দশ টাকা। আপনি মাসে ২ এই দশ টাকা পান ?

প্রবোধ—তাই কৈ, ছাত্রদের বেতনের ৪/৫ টাকা স্কুলের বাজে খরচ যায়। ৫ কি ৬ টাকা মাত্র পাই, সঙ্গে একটি চাকর, বাসা ভাড়াও আছে, এতে কি ভদ্রলোকের পোষায় ?

দয়াল—কেন, না হয় মাষ্টারবাবুকে ২০ টাকা দিন, আপনি ১৫ টাকা নিন।

প্রবোধচন্দ্র জানান যে তা হবার উপায় নেই। টাকার বিলিব্যবস্থা মাষ্টারের হাতে। সরকারী টাকা আসা মাত্র তিনি নিজের ভাগ নিয়ে নেন আর প্রবোধবাবুকে চাঁদা আদায় করে বেতন নিতে বলেন। খেদের সঙ্গে পণ্ডিত জানান,—

"মশায় আমি বেচারাই চোরের চাকর! আমাকেই স্বয়ং চান্দা সাধতে যেতে হয়, কি করি পেটের জ্বালায় তাও স্বীকার।"

চাঁদার খাতা খুলে প্রবোধচন্দ্র স্থানীয় নামী ব্যক্তিদের কার কত চাঁদা বাকী আছে তা দয়ালকে দেখান। শুধু গ্রামের কে এক দয়াল পুরুষ মাসিক চাঁদা ২ টাকা, তায় আগাম ২৫ টাকা দিয়েছিলেন, তাইতে মুদী দোকানের ২০ টাকা ধার শোধ করে বাকী পাঁচ টাকা, আর চেষ্টা চরিত্র করে অন্যত্র পাওয়া পাঁচ টাকা, মোট দশ টাকা নিয়ে সম্বৎসর পর গত পুজোয় দেশের বাড়ীতে পরিবারের কাছে প্রবোধচন্দ্র যেতে পেরেছিলেন।

কিন্তু এভাবে ঘরের খেয়ে কতদিন বনের মোষ তাড়ান যায়? ডেপুটি বাবুর সদর অফিসে গিয়ে বকেয়া চাঁদার কথা বলাতে তিনি চাঁদাদাতাদের প্রত্যেকের নামে একখানা করে চিঠি পণ্ডিতের হাতে দিলেন, আর ইষ্টিকধ্বজের মতো সেই চিঠি গলায় ঝুলিয়ে প্রবোধচন্দ্র স্কুলে এলেন। তারপর ডেপুটির চিঠি পেয়ে কেউ দু'চার টাকা দিলেন, কেউ এই দিচ্ছি বলে টালবাহানা করলেন, কেউ বা বললেন আমার ছেলে এখন ঐ স্কুলে পড়েনা, চাঁদা দেব কেন, কেউ আবার রাগ দেখালেন। কে এক চাঁদাদাতা হেসেই উড়িয়ে দিলেন,

"এ চিঠি খানিত আর নিলামের এস্তাহার নয় যে হুকুম তামিল না কোল্লে মালামাল নীলাম হবে। দান করা, ইচ্ছা হয় করলাম, না হয় না করলাম, এত সই সুপারেশ কি।"

এমন চাকরীতে কিসের আবার মায়া? প্রবোধচন্দ্র সে অন্যত্র কাজের চেষ্টা

করেননি এমন না। ডেপ্রুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসে আট টাকা বেতনের কর্মখালি দেখে তিনি দরখাস্ত করেন। ডেপ্রুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন,—"তুমি ১৫ টাকার পন্ডিতীতে আছ, তোমার ৮ টাকার মোহরেরীতে প্রয়োজন কি ?"

আবার জমিদারের খাসমহালে নায়েবের কাজ খালি হলে প্রবোধচন্দ্র প্রার্থী হন। জমিদার বল্লেন,—

"তুমি পন্ডিত, শুদ্ধ শান্ত ধার্ম্মিক মানুষ, নায়েবীতে দাঙ্গা হাঙ্গাম কত কিছু চাই, তোমা দিয়া সে কাজ চলা কঠিন, বিশেষ তুমি স্কুলে ১৫ টাকা বেতন পাচ্চো, নায়েবীর বেতন হচ্ছে ৮ টাকা, ১৫ টাকা ছেড়ে ৮ টাকায় যাবে কেন ?"

জমিদারের পাশে উপস্থিত এক মোহরের হেসে বল্লে, "কি পন্ডিত মশায় ! ঘুষের তৃষ্ণা হয়েছে নাকি ?"

প্রবোধচন্দ্রের বৃত্তান্ত শুনে দয়াল বলেন,—

"কি কষ্ট আপনার দুঃখের দেখি সীমা নাই। সকলে জানে আপনি ১৫ টাকা বেতন পান, ওদিকে ১০ টাকাও পড়ে না। এটি আবার প্রকাশ করতেও পারেন না। বোবার স্বপ্নবৎ কেবল মনোদুঃখেই মনে মরে রয়েছেন। আপনার কাছে আজ সবিশেষ শুনে আমার ভারি দুঃখ হোল।"

আরও দু-চার কথার পরে এবং জমিদারের সরকারে প্রবোধচন্দ্রের জন্য কোনো কর্ম্মসংস্থানের আশ্বাস দিয়ে দয়াল বিদায় হন।

প্রবোধচন্দ্র বসে ভাবতে থাকেন, বাল্যবন্ধুকে আজ একবেলা আপ্যায়নের সঙ্গতিও তার নেই। নিজে না'হক বেগুনসেদ্ধ দিয়ে পেট ভরানো চলে, ভদ্রলোককে তো তা দেওয়া যায় না।

খানিক পরে প্রবোধচন্দ্রের ভৃত্য কান্তে দুটো বেগুন হাতে প্রবেশ করে।

কান্তে—পন্ডিত মশ, আমি আর বাড়ী ২ তরকারী ভিক্ষা মাগ্‌তে যাইতে পার্‌মুনা। আজ্‌কা ঘোষেগো বাড়ীর ছোট্‌ঠাউরান মুখটা যে করচেন, দেখলে বমী আসে।

কান্তে জানায় যে ঠাক্‌রান বলছেন, পন্ডিত যখন গুরুগিরী করে পয়সা পান তখন তরী তরকারীর বায়না কেন ? উত্তরে কান্তেও শুনিয়ে এসেছে যে আপনাদের কর্ত্তার কাছে আমার পন্ডিতের কুড়ি টাকা পাওনা আছে, না হয় বেগুনের দাম তার থেকে কাটা যাক্‌। শেষে বোসেদের বাড়ী থেকে দুটি বেগুন চেয়ে এনেছে।

প্রবোধ—ভাল বলিস নাই, যাহোক একটু তেল আন্‌ স্নান করিগে।

কাস্তে—যে তেলটুকু আছে, গায় দিয়া হার্‌লে, বাইগন সিদ্দ খাইবেন কেম্‌নে ?

মুদিও আর বাকী দিতে চায় না, তার ৮/১০ টাকা হৈ চে। প্রবোধচন্দ্রের অভাব অনটনের কথা এই চাকরটি সব জেনে ফেলেছে,—

"কর্তা, আপনার বাইগন সিদ্দ ভাত হৈয়া গেছে, আমার ত পেটে আর ইতান্‌ হামায় না। আপনিও মাস ২ দরমা পাইবেন না, আমারও পেট বইরা খাওন মিল্‌বো না। আপনে না খাইয়া, না পাইয়া কতকাল বেগার খাটবেন ?"

দেশের বাড়ীতে প্রবোধের স্ত্রী সুশীলা শিশুসন্তান কোলে নিয়ে দারিদ্র্য অনটনের কথা, স্বামীর কথা চিন্তা করতে থাকে,—

অভাগার ঠাঁই বৈকুন্ঠেও নাই, লোকে একটি সুসন্তানের জন্যে কত কিছু করে ; কপালক্রমে যদি হয় ; তাকে কত আদর—কত সোহাগ করে, কত সোনা-রূপায় সাজায়। আমার এই সোনার চাঁদ হয়েছে, আমি আজো দুগাচী বালা দিতে পারলাম না। বালা চুলয় যাক, ক্ষিদের বেলায় দুধ ফোটাটাও দিতে পারচিনে।

সুশীলার মনে পড়ে যায় হাতের তাবিজ খোকার বাপের হাতে দিয়ে খোকার জন্য বালা গড়ে দিতে বলেছিলো। তা' কই আজ পর্য্যন্ত চিঠিত এলোনা।

হন্তদন্ত হয়ে শাশুড়ীর প্রবেশ, বৌমাকে বলেন, আতাইগঞ্জ হতে লোক এসেছে। প্রবোধ চিঠি আর পাঁচ টাকা পাঠিয়েছে। মাকে লেখা সংক্ষিপ্ত চিঠিতে প্রবোধচন্দ্র জানিয়েছে, সংসার খরচের জন্য পাঁচ টাকা পাঠালাম, যদি সামনের মাসে বাকী সমস্ত টাকা পাইত স্কুলে থাকব নচেৎ চাকরী ছেড়ে বাড়ী চলে আসব। স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে নিজের দুর্গতির কথা আর একটু বিশদ করে লেখা—চাঁদা আদায়ের ঝঞ্ঝাট, মুদির কাছে দেনা ইত্যাদি, উপরন্তু স্ত্রীর সাধের তাবিজ ভেঙ্গে ছেলের বালা গড়াতে পারেন নি, প্রতিবারেই ভাবেন চাঁদার টাকা কিছু আদায় হবে, তাই দিয়ে খোকার বালা হবে। নিজের চিঠি পড়তে পড়তে সুশীলা আনমনা হয়ে পড়ে, হঠাৎ খেয়াল হয় চিঠির উত্তর দিতে হবে, কালই পত্র বাহক আতাইগঞ্জে ফিরে যাবে।

প্রবোধচন্দ্রের কাহিনীর শেষ অঙ্কের আগে সার্কেল পাঠশালা ও তার পন্ডিত আনন্দের কথা দিয়ে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হয়। সার্কেল পাঠশালার নিয়ম এই যে এক অঞ্চলের কয়েকটি স্কুল নিয়ে এক একটি সার্কেল পাঠশালা গঠন হয়, ভ্রাম্যমান মাষ্টার ঘুরে ঘুরে পন্ডিতী করেন।

আনন্দ এমনই এক সার্কেল পাঠশালার পন্ডিত। মুশকিল হ'লো স্কুলগুলির পরস্পরের দুরত্ব এত বেশি যে মাঠ জলা বিল ভেঙ্গে প্রতিদিন বিভিন্ন স্কুলে

হাজিরা দিতে গিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। বর্ষার সময় পথঘাট আরও দুর্গম হয়ে ওঠে। গভর্ণমেন্ট হতে পারাপারের জন্য নৌকাভাড়া দেওয়া হয়, কিন্তু অল্প গভীর বিলে পানা আর কলমিদাম ঠেলে নৌকা চলে না। কাজেই ভদ্রসন্তান মাষ্টারকে জলে নামতে হয় শিক্ষকতা করতে গিয়ে। এমনই এক বর্ষার দিনে শহুরে বাবু যাদব আর গ্রাম্যবন্ধু গ্রামের পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে গ্রামের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

দেখা গেল জামা, ধুতি-চাদর বোঁচকা বেঁধে কাঁধে ফেলে গামছা পরা আনন্দ পন্ডিত একটা বিল পার হয়ে এদিকে আসছেন। গ্রাম্যজীবনে অনভ্যস্ত যাদববাবু বর্ষায় প্রকৃতির শোভা দেখে মুগ্ধ। তাঁর উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে মাধববাবু বলে উঠলেন,

"মশায়, প্রায় নগরে নগরে বাস করেন, পল্লিগ্রামে বাস্তব্য করেন না, তাই এ সকল সামান্য শোভা দেখে মুগ্ধ হচ্চেন। ফল এখানে যেমন কোন ২ বিষয়ে সুখ আছে, তেমন দুঃখও আছে। গ্রাম্য পথ ঘাট বর্ষাকালে নিতান্ত কদর্য্য হয়ে ওঠে; চলা ফেরা কঠিন হয়। দেখুন মশায়, ঐ যে ভদ্রলোকটি বিল পার হয়ে আসছেন, ওঁর দুরবস্থা একবার দেখুন।

মাধব—(সবিস্ময়ে) উনি ভদ্রলোক! আমি ভেবেছিলাম কোন ইতরলোক টোক হবে, যে চমৎকার বেশ।

যাদব—মশায়, ইনি এখানকার সারকেল পাঠশালার পন্ডিত, আজ তেওটা গ্রামের সারকেল হতে শিক্ষা দিয়ে আসছেন। সে গ্রাম এখান হতে প্রায় ২/৩ ক্রোশ দূর হবে।

মাধব—বটে, বোধ হয়, এঁকে পথে আরো এরূপ বিল খাল পার হতে হয়।

যাদব—ন্যূন কল্পে ৫/৭ টি হবে, তার জন্যইত গামছা পরিধান করে চলেছেন, ধুতি, চাদর, পীরাণ বোচকায় আছে।

মাধব—গবর্ণমেন্ট হোতে না এঁরা নৌকা ভাড়া পান? তা নৌকা করে পারাপার হলেই ত পারেন।

যাদব—বিলক্ষণ। দেখুন দেখি এই সকল বিলে কি নৌকা চলে? ঘাস, কলমি-দাম আর পানায় কেমন দুর্গম হয়ে রয়েছে। (নির্দ্দেশ করিয়া) আহা দেখুন, দেখুন, শিক্ষক বেচারাকে বুক জল ভাঙ্গতে হচ্ছে।

মাধব—প্রত্যহ এত ক্লেশ কেমন কোরে সহ্য হয়। আহা এরা কি হতভাগ্য।

বিল পার হয়ে একসময়ে জল হতে উঠে এসে আনন্দ পণ্ডিত এপারে দাঁড়ান। দেখা গেল গায়ের এখানে ওখানে জোঁক লেগেছে। যেটাকে ছাড়ান, সেখান হতে ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে থাকে। পণ্ডিত খেদোক্তি করেন,—

"প্রতিদিনই যদি জোঁকে এইরূপ রক্তপাত করে বাঁচবো কেমন কোরে? আর গ্রাম্য তরুগণ! গ্রাম্য পশুপক্ষিগণ! ডিপুটি ইনসপেক্টর যেন মাসে দুমাসে একবার এলেন, ইনিস্পেক্টর হচ্চেন শ্বেতাঙ্গ, তাঁর দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না, না উঠুক, তোরাত আমাদের এ অবস্থা দেখছিস, তোরাই না হয় একবার আমাদের হয়ে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে দুঃখের সংবাদ দে, ১৫ টাকায় ত আর ক্লেশ সহ্য হয় না।

মাধব—(মৃদুস্বরে) যাদববাবু, এঁর বিলাপ শুনে, আর কষ্ট দেখে আমার বড়ই দুঃখ হচ্ছে, ডিপুটি ইনস্পেক্টরেরা দেখে শুনে কেমন করে চুপ মেরে থাকেন?

যাদব—ও কথা বলবেন্ না, কেবল ওঁরাই দোষী নন, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে আগুন লেগেছে। বড়কর্ত্তা সিমলে ছাড়বেন না, মেজোকর্ত্তাদের মধ্যে গিরিবিহারী বিলক্ষণ আছেন। ছোটকর্ত্তাদের মধ্যেও বারিবিহারী বিরল নয়। শিক্ষক বেচারাদের খবর কে নেয়, বলুন। এই সকল দেখে শুনে অনেকদিন হোল কোন্ সংবাদপত্রে জানি লিখেছিল, "মধ্যবিভাগের বিদ্যালয় সমূহের ইনস্পেক্টর উড্রসাহেব এক মাসের বিদায় লইয়া নীলগিরিতে গমন করিয়াছেন, আর্টকিন্সন সাহেব কি ধবল গিরিতে উঠিতে পারেন না? মার্টিন সাহেব চিরাপুঞ্জী গিয়াছেন। শিক্ষকেরা যদি নিকটে পাহাড় না পান, তবে গাছে উঠুন। সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাও উন্নত হইবে।"

মাধব—(হাস্য করিয়া) মন্দ লেখে নাই। কাজে ২ এরূপ বল্‌তে হয়।

ইতিমধ্যে পুকুরের জলে স্নান সেরে জামা কাপড় পরে যাবার উদ্যোগ করতেই যাদববাবুর আহ্বানে আনন্দ পন্ডিত ফিরে দাঁড়ান, যাদববাবু উভয়কে পরিচয় করান। সার্কেল পাঠশালা ও শিক্ষার অবস্থা নিয়ে আলোচনার মধ্যে একসময় মাধববাবু বলেন যে আপনারা কেন গভর্ণমেন্টকে খুলে সব জানান না? রোগী রোগ প্রকাশ না করলে প্রতিকার হয় কিসে?

আনন্দ—মশায়, আপনাকে তো তেমন বৈদ্য দেখছি না। রোগ বল্লে আপনি তার প্রতীকার কোত্তে পারবেন? অধিক কি আমাদিগের হয়ে যে ব্যক্তি কিছু সহায়তা করেন, তার ঘাড়েও আমাদের রোগ চেপে বসে।

মাধব—কেমন?

আনন্দ—মশায় এডুকেশন, প্রভৃতি বড় বড় খবরের কাগজে আমাদের রোগের বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে, কই ঔষধত কিছু পেলেম না, রোগের প্রতীকারও কিছু দেখছি না, যেমন তেমনই আছে।

মাধব—এইক্ষণ গবর্ণমেন্টের বড় অস্বচ্ছল অবস্থা।

আনন্দ—মশায়, ও কথা বলবেন না। গবর্ণমেন্ট আমাদের কৃপণ নন, সেই সে বৎসর শিক্ষাবিষয়ে যত টাকা দেওয়া হয়েছিল, সে সমুদয় ব্যয় হয় না, কতক টাকা মজুতও থাকে। কেবল শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের অমনোযোগেই না সেই দেওয়া টাকাগুলি ব্যবহারে এলো না।

আনন্দ পন্ডিতের অভিযোগ অনেক। তাঁর জিজ্ঞাসা সার্কেল পাঠশালার মাষ্টারদের কেন মাস মাস বেতন দেওয়া হয়না? সাহায্যকৃত বা 'এডেড' স্কুলের তহবিলে যেমন কিছুটা টাকা চাঁদা থেকে আসে, সার্কেল পাঠশালায় তো সে ব্যাপার নাই। তবে, শিক্ষাদপ্তরের মেজোকর্ত্তা, ছোটোকর্ত্তা মাষ্টাররা ঠিক সময়ে মাইনে পাচ্ছেন কিনা দেখতে কি পারেন না? শুধু তাই নয়। শিক্ষাদপ্তরের নিয়ম আছে তিন মাস অন্তর সরকার থেকে স্কুলগুলিতে পুরস্কার দেওয়া হবে। নিয়ম আছে, ভাগ্যে নেই। বৎসরান্তেও পুরস্কারের টাকা হয়তো এসে পেঁছিয় না। যদি বা আসে হয়তো ওঁচা মাল নিকৃষ্ট বই ঐ টাকায় কিনে পাঠায়। শহুরে বাবু মাধব সে কথায় সায় দিয়ে বললেন যে ডেপুটি ইনস্পেক্টরের খাতিরজন ও আত্মীয়-বন্ধুদের লেখা অপকৃষ্ট বই যা বাজারে বিক্রী হয়না সেই সবও কখনও সখনও স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের মর্য্যাদা পায়।

আনন্দ—আর দেখুন আপনি বোল্লেন, গবর্ণমেন্টের বড় অস্বচ্ছল অবস্থা, আমাদের বেলায় এই কথা। এদিকে বড় ২ কর্ত্তাদিগে যে লম্বা লম্বা বেতন দিচ্ছেন, তাঁরা কাজ যত কচ্চেন, তা জগদীশ্বরই সাক্ষী, তাঁদের বেলায় ওকথা নাই। কেবল এই মজুর বেচারাদের বেলায়ই ঐ কথা, মনে করুন ডিপুটি ইনস্পেক্টরের সংখ্যা কমালে আর বড়কর্ত্তার কিছু বেতন কমালে কি শিক্ষা বিষয়ের ব্যাঘাত হয়? তবে বোলবেন, তত্ত্বাবধান করে কে? এখনও ত তাই "বামুন গেল ঘর, লাঙ্গল তুলে ধর।" ফলতঃ যদি শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি করে দিয়ে প্রমসনের রীতি করে দেওয়া হয়, আর শিক্ষকদের ঘাড়ে সম্পূর্ণ জওয়াবদিহি থাকে, এখনও ধোরতে গেলে রয়েছে, তাহলে অপেক্ষাকৃত কাজ উত্তম চলে সন্দেহ নাই।

মাধব—না মশায়, তা হলে নূতন স্কুল হওয়ার পক্ষে, আর লোককে উৎসাহ দেওয়ার পক্ষে কোন উপায় থাকে না।

আনন্দ—মশায়, ক্ষমা করুন, এখন আর ও কথা বোলবেন না। সে সময় অতীত হয়েছে। এখন আমাদের শিক্ষা দেওয়ার গুমর ফাঁক হয়ে পড়েছে, লোকের কিছু জান্তে বাকী নাই। আমরা এটি বেশ জানতেছি।

কথাপ্রসঙ্গে পন্ডিত আরও জানালেন যে সম্প্রতি সরকারের মনোভাব বাংলাভাষার প্রতি মোটেই অনুকূল নয়। যে সমস্ত বাংলা পাঠ্যপুস্তক সংস্কৃত শব্দবহুল বঙ্গ গবর্ণর সে সমস্ত বাতিল করতে চান। এভাবে বাংলাভাষাকে যদি সংস্কৃতের আশ্রয়চ্যুত করা হয়, তাহলে কি তার পদবিন্যাস ক্ষমতা থাকবে, আনন্দ পন্ডিত জানতে চায়। একে তো সরকারের এই প্রতিকূল মনোভাব, অন্যদিকে বাংলা শিক্ষার প্রতি সাধারণেরও আস্থা নেই। পন্ডিত বলেন,

"গ্রাম্য লোকদের সংস্কার এই, এরকম স্কুল কেবল খ্রীষ্টান বা ব্রহ্মজ্ঞানী কোরবার জন্য। ভূগোল, ক্ষেত্রতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ওদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। পৃথিবী গোল বলতে গেলেই গোল বাধে। অনেক মহাজন মধ্যবিত্ত লোকেরা বছর দু'বছর ছেলে পিলেকে পড়তে দেয়, শেষে বলে, না এ স্কুলে পড়ে বিদ্যা কিছুই হয় না। কেবল দরমা দেওয়া সার, তেল, লুনের হিসাবটাও ভাল কোরে কস্‌তে পারে না। মশায়, এ বিষয়ের অনুযোগ আর তিরস্কার শুনে২ কর্ণ বধির হয়ে গেল। কত স্কুল এ অবস্থায় হতশ্রী হয়ে গেছে। ছাত্র না থাকলে স্কুল চলে কি দিয়ে বলুন।"

এরপরে নিজের সার্কেলের অবস্থা বলতে গিয়ে আনন্দ বলেন,—"স্কুল তিনটির অবস্থা আর কি বল্‌বো বলুন। পুস্তক ত অল্প পড়াতে হয় না। গুরু মহাশয় প্রতিদিন পড়ান, আমি এক২ দিন এক২ সারকেলে শিক্ষা দি। তা সারকেলগুলি পরস্পর এত ব্যবধান যে যাতায়াতেই প্রাণ বাহির হয়ে যায়। অতগুলি পুস্তক, প্রতিমাসে ১০ দিন পড়ান, এতে আর প্রকৃত শিক্ষা কত হতে পারে? তবে গভর্ণমেন্টকে প্রবোধ দেওয়া, তাত দেওয়াই যাচ্ছে।"

আনন্দ আরও জানান একদিন এক ছাত্রকে বাংলা শিক্ষার সম্বন্ধে উপদেশ দিলে সে উত্তর করে,—

"মশায় আমি যদি বাঙ্গালায় ভাল পন্ডিত হই, তবে না হয় আপনার মত একজন স্কুলের শিক্ষক হবো। আপনার বেতন ১৫ টাকা, না হয় আমার ২০ টাকা হবে, তা এত পরিশ্রমে কাজ কি? আমরা ব্যবসা করে মাসে ৪০/৫০ টাকা বেশ উপার্জ্জন কোত্তে পারবো; কার অধীনতাও স্বীকার কোত্তে হবে না।"

মাধব—এ সময়ে ইংরাজী শিক্ষার যে উপাদেয় ফল ফলছে তা বাঙ্গলা শিক্ষার আর কি অনুরাগ থাকবে, বলুন। ফল এক্ষণে চাকরী দুর্ল্লভ। ১০টাকা বেতনের একটি সরকারী চাকুরী খালি হোলে দশ দশে শ'জন প্রার্থী উপস্থিত হন।

আরও দুচার কথার পরে আনন্দ পন্ডিত বিদায় হন। তার আগে মাধববাবু

জানান আগামীকাল তিনি পন্ডিতের সার্কেল পাঠশালা গিয়ে দেখে আসবেন, আর স্কুলের তহবিলে কিছু সাহায্য দিয়ে আসবেন।

সার্কেল পাঠশালার বৃত্তান্ত এখানেই শেষ।

এরপরে দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে সাহায্যকৃত স্কুলের মাষ্টার প্রবোধ-চন্দ্রের বাকী কাহিনী আবার শুরু হয়। প্রবোধচন্দ্র গ্রামের বাড়ীতে উপস্থিত। স্ত্রী সুশীলার সঙ্গে নিজ দুর্ভাগ্য নিয়ে আলোচনা হয়। অনটন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে যেভাবে প্রবোধচন্দ্র আতাইগঞ্জ হতে এবার দেশে এসেছেন তা একে একে স্ত্রীর কাছে ব্যক্ত করেন।

আতাইগঞ্জে স্থানীয় মুদীর দোকানে অনেকদিন ধরে বেশ কিছু টাকা বাকী পড়ে ছিল। একদিন চাকর কান্তেকে ধারে কিছু আনবার জন্য মুদীর দোকানে পাঠানো হল। কিছুক্ষণ পর চাকর ফিরে আসে, সঙ্গে সেই মুদীও আছে। প্রবোধচন্দ্রের কাছে তার পঞ্চাশ টাকা পাওনা। মুদী শাসিয়ে যায় পাঁচ দিনের মধ্যে যদি বকেয়া টাকা আদায় না হয়, সে ছোট আদালতে নালিশ করবে। হতবুদ্ধি মাষ্টারের রা সরে না। কিন্তু দুর্ভোগের আরও একটু বাকী ছিল। মুদী যেতেই খানিক পরে কাপড়ের দোকানের মালিক এসে হাজির। কান্তে জানায় মাষ্টার বেতন পান নাই। দোকানী বলে যে মাষ্টার মাহিনা পান নাই, ওদিকে গয়না গড়াবার বায়না দেওয়া হয় এ কেমন কথা। অপমানে দুঃখে প্রবোধমাষ্টার সেই তাবিজ বেচে দোকানীর হাত হতে নিস্তার পান। এখন সংসার খরচের টাকা আসে কোত্থেকে? এক মহাজনের কাছে এক টাকা কর্জ চাইলে সে পরিবর্ত্তে কোন বন্ধকী জিনিষ চায়। প্রবোধচন্দ্র চাকরের হাত দিয়ে সটিক রঘুবংশ পাঠিয়ে দিলেন। দেখে মহাজন হেসে বলে, এর দাম পাঁচ কড়াও হবে না। বাধ্য হয়ে ঐ বই কোন ছাত্রের কাছে দু'টাকায় বিক্রি করে দেন। তবেই কদিন সংসার খরচ চলে। ইতিমধ্যে মুদী ছোট আদালতে নালিশ করে। মুদীর কাছে দেনা আর মামলার খরচ মিলিয়ে ৬০/৬৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে। মামলার ডিক্রী জারী হয়েছে। এখন হয় টাকা শোধ, নয় হাজতবাস। থাকবার মধ্যে এই ভদ্রাসনটিই আছে। এটি বন্ধক দিয়ে টাকা পাওয়া যায় ত রক্ষা, নইলে আর ত পথ নেই।

সুশীলা বলে যে দুর্দ্দিনের জন্যই মানুষ বিষয় সম্পদ করে, তা এর বাড়া আর বিপদ কি আছে, হ্যাঁ ভদ্রাসন বাঁধা দিতে হচ্ছে, তা হরিশ্চন্দ্রও তো আত্মবিক্রয় করেছিলেন। সুশীলার প্রশ্ন, এই অসময়ে স্কুলের কর্মকর্ত্তারা কিছু দেবেন না?

প্রবোধ—আমার অসময়, তাঁদের কি ? ত'রা তো কৌশলে এড়িয়েছেন।

সুশীলা—সে কেমন ? তারা কি আপনার টাকা ধারেন না ?

প্রবোধ—আমি যখন টাকা না পেয়েও পেয়েছি বোলে রসিদ দিয়েছি আর সেই রসিদ ইনিস্পেক্টরের আফিসে দাখিল হোয়ে গিয়েছে, তখন যাদের কাছে পাওনা, তারা স্বীকার না কোল্লে আমার আর দাবি করার যো কি ?

সুশীলা—আচ্ছা, পরমেশ্বর আছেন তিনিই এ প্রবঞ্চনায় বিচার কোরবেন।—যাও তুমি ভদ্রাসন বন্ধকের চেষ্টা দেখগে। [প্রস্থান]

অন্যদিক দিয়ে নিজেকে, শিক্ষাব্যবস্থাকে ও শিক্ষকদের ধিক্কার দিতে দিতে প্রবোধচন্দ্র বার হয়ে যান।

আগের অধ্যায়ে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকের শোচনীয় অবস্থা দেখানো হয়েছে। এর কারণ কি ? অলপকথায় এর কারণ হ'লো দেশীয় শিক্ষার প্রতি সরকারের সৎমা সুলভ মনোভাব। এদেশে জনশিক্ষার ভার ইংরাজ কোনদিনই গ্রহণ করেন নাই। সরকারী কাজকর্মের জন্য কিছুসংখ্যক লোক শিক্ষিত হ'লেই হ'লো—এ মনোভাব নিয়ে কোম্পানীর আমলে শিক্ষাদপ্তর 'Infiltrated' শিক্ষার প্রতি দেশকে ঠেলে নিয়ে গেছেন। বাংলা প্রেসিডেন্সির শিক্ষাদপ্তর জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ১৮৩৮-৩৯ সালের রিপোর্টে লিখছেন—"Our efforts should be at first concentrated to the Chief Towns or Sudder Stations of districts, and to the improvement of education among the higher and middling classes of the population ; in the expectation that through the agency of these scholars an educational reform will descend to the rural Vernacular Schools, and its benefits be rapidly transfused among all those excluded in the first instance by object want from a participation in its advantages."

সরকারের ইচ্ছা যাই হোক না, মনীষী ডেভিড হেয়ার, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ শিক্ষাবিদরা চুপ করে থাকতে পারলেন না। এঁদের ঐকান্তিক যত্নে ইংরাজী স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় স্কুলও দু'চারটি করে গড়ে উঠতে থাকে। ১৮১৭ সালে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলা পাঠ্য পুস্তকের অভাব অনেকটা মেটে। ১৮১৮ সালে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। এই সোসাইটির চেষ্টায় সারা বাংলায় দেশীয় শিক্ষা

প্রসারের শুভ সূচনা হয়। স্কুল সোসাইটি দেশ জুড়ে একের পর এক দেশীয় স্কুল গড়ে তুলতে তৎপর হয়। সোসাইটির সাফল্যে সরকার প্রথম দিকে কিছুটা আর্থিক সাহায্যও দেয়। দেশীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনে মিশনারীরাও পেছিয়ে থাকেন না। জনশিক্ষার জন্য বেসরকারী তৎপরতার পেছনে সরকারী আনুকূল্য ও সমর্থন কখনই পর্য্যাপ্ত ছিল না। যদিও গবর্ণমেন্ট ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শিক্ষা ব্যাপারে নানা তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন, আর সীমিত খরচের মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষাও কিছু কিছু চালিয়েছেন। সারা বাংলা প্রেসিডেন্সী তদারক করে উইলিয়ম অ্যাডাম ১৮৩৫-৩৮ সালে যে রিপোর্ট দেন তা'তে এই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গ্রাম্য শিক্ষায়তন ও পাঠশালার উন্নতির জন্যও কিছু কিছু সুপারিশ ছিল, যদিও জেনারেল কমিটি অফ্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন তা' অগ্রাহ্য করে।

গত শতাব্দীর চার দশকে লর্ড হার্ডিঞ্জের চেষ্টায় ১০১টি দেশীয় স্কুল পাটনা, ভাগলপুর, উড়িষ্যা ও বাংলার কয়েক জায়গায় গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী আয়োজন খুবই কম। গবর্নমেন্টের তহবিল থেকে ১০১ জন প্রধান শিক্ষকের মাইনে গুণে দিয়ে তো প্রাথমিক শিক্ষার মতো জটিল প্রশ্ন সমাধান হতে পারে না। স্কুলবাড়ী, পাঠ্যবই, অন্যান্য শিক্ষকদের দক্ষিণা অভিভাবক আর স্থানীয় লোকেরা বহন করুক—সরকারের এই সংকীর্ণ নীতির জন্যই হার্ডিঞ্জ স্কুলগুলি বেশিদিন দাঁড়াতে পারল না।

উনিশ শতাব্দীর পাঁচ দশকে বাংলা প্রেসিডেন্সীতে নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়। ডাঃ মোয়াট উঃ পঃ প্রদেশের 'হল্কাবন্দি' প্রথার অনুসরণে বাংলায় সার্কেল পাঠশালার প্রস্তাব তোলেন। মিঃ উড্রোর তত্ত্বাবধানে বাংলার পূর্ব্বাঞ্চলে ২/৩টি করে প্রাথমিক স্কুল নিয়ে এক একটি সার্কেল গঠন হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সুপারিশের (Notes on Vernacular Education, dated 7th February, 1854) ভিত্তিতে কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সদস্য মিঃ হ্যালিডে যে শিক্ষানীতি গ্রহণ করেন তাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবিত ৪টি ডিষ্ট্রিক্টে মোট ২০টি নতুন মডেল স্কুলের সুপারিশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হ্যালিডে বাংলা সার্কেল পাঠশালার অনুকূলে মত দেন।

১৮৫৪ সালে উডের নির্দেশপত্রে জনশিক্ষার সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ছিল। ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থার মত এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে অর্থসমস্যা প্রধান অন্তরায়। সরকারের পক্ষে এই বিরাট ব্যয়বহন শক্ত হলেও, উডের ডেসপ্যাচে দেশীয় স্কুলের জন্য সর্ব্বপ্রথম গ্রান্ট-ইন-এড ব্যবস্থার সুপারিশ ছিল। অন্যান্য

উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হ'ল—মডেল স্কুলের প্রবর্ত্তন, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য বিশেষ শিক্ষাবিধি, স্কুল ইন্সপেক্টর নিয়োগ, শিক্ষালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি।

১৮৫৯ সালের নির্দেশনামায় (এডুকেশন ডেসপ্যাচ) সেক্রেটারী অফ স্টেট বাংলাদেশে প্রবর্ত্তিত গ্রাণ্ট-ইন-এড ও সার্কেল পাঠশালার কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মিঃ প্রাট ও মিঃ উড্রোর মতামত উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেখা গেছে, যে শিক্ষা সরকারী চাকরী জোটাতে অক্ষম, বাংলার সাধারণ মানুষের তাতে আগ্রহ নেই।

পাঁচ বছর পরে ১৮৬৪ সালে সেক্রেটারী অফ স্টেট তাঁর নির্দেশনামায় (এডুকেশন ডেসপ্যাচ ১৭নং, ২৩শে জুলাই) বাংলার দেশীয় শিক্ষা সম্বন্ধে একই নৈরাশ্য ব্যক্ত করেছেন—"The least effective part of the Educational Department in Bengal has always been that which relates to the elementary Education of the people." তবে এই হতাশার মধ্যেও নর্মাল স্কুলে পাঠশালার গুরুমহাশয়দের শিক্ষাদানব্যবস্থা ও তার জন্য বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উদ্যমের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮৬২ সালে অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর হয়ে যশোহর, বর্দ্ধমান, নদীয়া অঞ্চলের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ সালের বিবরণীতে তিনি লিখছেন—"No provision has been made under the original scheme for the education of the Gurus; and the mere offer of money rewards from time to time was incapable of acting upon these men as an inducement to adopt an improved course of studies at their schools. This, it was conceded, was the weak point of the scheme and here great improvements have been gradually introduced.

এখন কথা হচ্ছে, বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জনশিক্ষার মতো ব্যয়বহুল খাতে টাকা আসবে কোথা থেকে? ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে যথা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে শিক্ষাকর আগেই প্রবর্ত্তিত হয়েছে। কিন্তু এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দেশ বাংলায় তা আদৌ সম্ভব কিনা এবং যদি তা হয় তাহলে চিরস্থায়ী আইন ও ভূস্বামীদের পক্ষ থেকে কতটা প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ১৮৫৯ ও ১৮৭০ সালের এডুকেশন ডেসপ্যাচে রয়েছে।

বাংলায় শিক্ষাকর নিয়ে তিন শরিকের মত পার্থক্য দীর্ঘদিন ধরে চলে। সেক্রেটারী অফ স্টেট ও ভারতের গবর্নর জেনারেল বলেন যে স্থানীয় কর

(local cess) বসালে জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিপক্ষে বা জমিদারদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গবর্নমেন্ট আইন জারী করছেন এমন যুক্তি খাটে না। লর্ড ক্যানিংয়ের আমন্ত্রণে ১৮৫৯ সালে জেমস উইলসন (Secretary to the Board of Control and Vice-President of the Board of Trade) অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। সিপাহী যুদ্ধের শেষে গবর্নমেন্টের সামনে যে বিরাট আর্থিক ঘাটতি দেখা দেয় সে সম্বন্ধে উপদেশদানই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য। মিঃ উইলসন বাংলার স্থানীয় কর ও জমিদারী ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করে স্থানীয় করের স্বপক্ষে রায় দিয়ে গেছেন। তিনি দেখিয়ে গেছেন যে কর্ণওয়ালিশের প্রস্তাবের কোথাও কর অব্যাহতির উল্লেখ নেই। কিন্তু বাংলার সরকার প্রথম থেকেই শিক্ষাকরের বিরোধিতা করে আসছেন। তাঁদের যুক্তি বাংলায় জমির বন্দোবস্ত পাকাপাকি যখন হয়েই গিয়েছে তখন ঐ স্থানীয় কর বসাবার যুক্তি কোনোমতেই খাটে না।

১৮৭০ সালের নির্দেশনামায় সেক্রেটারী অফ স্টেট লিখছেন, "Her Majesty's Government can have no doubt that elsewhere, so in Bengal, the expenditure required for the education of people ought to be mainly defrayed out of local resources. This, however, is precisely the application of rates which the present condition of people may render them least able to appreciate. I approve, therefore, of your Excellency proceeding with great caution."

কিন্তু জর্জ ক্যাম্পবেলের অনমনীয়তা ও বাংলায় রাজস্ব উন্নতি—এ দুইয়ের সমাবেশের ফলে বাংলায় ১৮৭১-৭২ সালে নূতন নিয়ম হল যে এবার থেকে সরকার সাহায্যপুষ্ট (এডেড) স্কুলে আর্থিক বরাদ্দের সীমা নির্দ্ধারণ করবেন ঐ স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার মান ও ফলাফল দেখে। নিঃসন্দেহে এখন থেকে পাঠশালা ও প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা সচেষ্ট হলেন স্কুলের মান ও নাম বাড়াতে।

হাণ্টার কমিশন (১৮৮২ সাল) প্রাথমিক শিক্ষার মত গুরু দায়িত্বভার স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনবিভাগ অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি ও গ্রামাঞ্চলে জেলাবোর্ড ও লোকাল বোর্ডের উপর ছেড়ে দেবার সুপারিশ করেন। মিউনিসিপ্যালিটি ও লোকাল বোর্ডের নিজস্ব তহবিলের একাংশ ছাড়াও প্রদেশ সরকারের রাজস্ব থেকে কিছু অংশ, কমিশনের মতে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে। কিন্তু এত সুপারিশ

সত্ত্বেও স্কুলের পরীক্ষাভিত্তিক সরকারী আনুকূল্যের সর্ত্ত কমিশনের অনুদার মতের পরিচয়। উচ্চমানের ফলাফল দেখাতে না পেরে অনেক শিক্ষাকেন্দ্র সরকারী সাহায্যের অভাবে একে একে বন্ধ হয়ে যেতে লাগল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন প্রাথমিক স্কুলে পরীক্ষাভিত্তিক সরকারী সাহায্যনীতি তুলে নেন।

আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে দু'কথা না বললে গত শতাব্দীর শিক্ষাপ্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দেশীয় শিক্ষার প্রতি আমাদের দেশের লোকেরা যথেষ্ট অবহেলা দেখিয়েছেন। কিছুটা বাস্তববোধ থেকে বাঙগালী বুঝতে পারলে যে ভারতের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা ও ফোর্ট উইলিয়মকে ঘিরে যে সুদৃঢ় প্রশাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত হলো সেখানে ইংরেজী শিক্ষিত ছাড়া অন্যেরা হালে পানি পাননা। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, মিশনারী ও জননায়করা মাতৃভাষায় জনশিক্ষার জন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তক লিখে, বিভিন্ন এলাকায় স্কুল গড়ে পথ দেখালেও সাধারণ ভাবে বাঙগালী ইংরাজী শিক্ষার দিকে ঝোঁকে। কাউন্সিল অফ এডুকেশন ১৮৫২-৫৫ সালের রিপোর্টে লিখছেন—"A demand for English education has arisen in every District, and its strength may be tested by the fact that schooling fees are willingly paid, and increasing numbers of teachers are supported in private schools. It must, however, be confessed that the hope of lucrative employment, rather than any real desire for education itself, mainly induces parents to pay for their children's instruction."

দ্বিতীয়তঃ কোন কোন সামাজিক ব্যাপারে বাঙ্গালী দেদার হাতে অর্থ ব্যয় বা অপব্যয় করে থাকেন কিন্তু দেশের প্রকৃত হিত কি সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কর্ত্তব্য বুঝে উঠতে অনেকেই পারেন না।

শিক্ষার প্রসারে বাঙ্গালী সুধীসমাজ যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তার আলোচনা করে মাসিক পত্র 'শিক্ষা-পরিচর' (মাঘ ১২৯৬ বঙ্গীয়) লেখেন, —"সকলের চেষ্টাকে সমবেত করিতে না পারিলে তাঁহারা সাধারণের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করেন, এমন সাধ্য তাঁহাদের কোথায়? গ্রামে একটি স্কুল বা পাঠশালা স্থাপনের জন্য যাঁহারা একবার চাঁদার খাতা হাতে লইয়া বাহির হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন ব্যাপারটা কত কঠিন। আমোদপ্রমোদ, নাচ, তামাসাতে যাহারা অনায়াসে সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকে, গ্রামে বালকদিগের শিক্ষার জন্য মাসিক দুইটি টাকা তাহারা অপব্যয় মনে করে।"

কলকাতার সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' (১০ই মার্চ, ১৮৬২ সাল) সরকারের শিক্ষাগ্রান্ট প্রসঙ্গে লিখছেন,—"কি প্রকার ব্যয় করিলে স্বদেশের মহৎ ও স্থিরতর শ্রেয়ঃ সাধন করা হয়, এদেশের অধিকাংশ লোকে আজিও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। অধিকাংশের এই স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায় পুত্রের বিবাহকৃত্য উপস্থিত হউক, তাঁহারা ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া ও ভূমি বিক্রয় করিয়াও ধুমধাম করিবেন, কিন্তু বিদ্যালয়ের চাঁদার পুস্তক সম্মুখে উপস্থিত হইলেই অমনি নতানন হইবেন। ফলতঃ এ দেশের লোকের এই স্বভাবটি না জানিয়া সাহায্যদান প্রথা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে।"

দুটি বাংলা পত্রিকা হতে অংশবিশেষ এবং Report on Native Papers হতে কিছু নিবন্ধ পরিশিষ্টে যুক্ত হ'ল।

আড়কাটী

নাটক।

শ্রীহরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা ৩৫।১ নং শঙ্কর হালদারের লেন।

প্রথম সংস্করণ।

শীল-প্রেস।

কলিকাতা,—৩৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৪ সাল

মূল্য ।।০ আট আনা।

আড়কাটী

মেলোড্রামা হলেও এই নাটকে সারা বাংলায় চা-কুলির যোগানদার ও আড়কাটিরা কিভাবে মানুষ ধরার জাল বিস্তার করেছিল, দূর গ্রামাঞ্চলের দুঃস্থ অজ্ঞ চাষীদের কাজ দেবার নাম করে আসামে চা-কুলি হিসাবে চালান দিত, তার পরিচয় আছে। সাহেব আড়কাটিরাও এই লাভজনক ব্যবসায়ে নেমে পড়ে। নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সালে। তার অনেক আগে থেকেই চা-কুলির দুর্দশা বিভিন্ন বাংলা পত্রিকায় প্রকাশ হতে থাকে। 'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রিকার সংবাদদাতা কাছাড় থেকে চা-বাগানের ধারাবাহিক সংবাদ পরিবেশন করে বিষম বিপদে পড়েন। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও চা-করদের রক্তচক্ষু সংবাদদাতার উপরে পড়ে, এমনকি তাঁর প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। ১৮৬২ সালের ৫ই মে কলকাতার 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ঢাকাপ্রকাশ'-এর সংবাদদাতার এক চিঠি ও সম্পাদকীয় মন্তব্য নাটকের শেষে দেওয়া হ'ল। চা-কুলিদের অবস্থা এমন পর্যায়ে ওঠে যে তার ঢেউ বিলাত পর্য্যন্ত পেঁছয়। আসামের দুরাং জেলার চেরাজুলি চা-বাগানে কুলিদের মারপিটের নিন্দা করে সেক্রেটারী অফ স্টেট গভর্ণর জেনারেলকে এক নির্দ্দেশনামায় [১] লেখেন,—

"It is with feelings of no small astonishment and pain that I hear of the commission of such inhuman practices by persons of British birth within the territories subject to Your Excellencys' control."

১৮৭৪ সালে 'চা-কর দর্পণ' (বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত শেষ নাটক) প্রকাশিত হলে সরকার প্রথমে এক অর্ডিনান্স জারী করে এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করেন এবং তারপরে সারা ভারতে নাটক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নে সচেষ্ট হন। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশের দৃষ্টি চা-বাগানের কুলিদের উপরে পড়ে। অজস্র বাংলা পত্র-পত্রিকায় চা-বাগানের কেচ্ছা প্রকাশ হতে থাকে।

১৮৯৩ সালের মাঝামাঝি মিঃ চার্লস ডডিং 'ইণ্ডিয়ান চার্চম্যান' পত্রিকায়

(১) Public Despatch to India, No, 103, dated 3rd December, 1866

আসামে চা-কুলিদের দুর্দশা জানিয়ে এক চিঠি দেন। ডাডিং তিরিশ বছর আগের কাছাড়ের বাঙ্গালী সংবাদদাতার মত চা-করদের হাতে নিগৃহীত না হলেও, ব্যূহের একলা সেনানীর মতো তাঁকে একটানা পযেুদ্ধ চালাতে হয়। চা-করদের পক্ষ থেকে ঐ পত্রিকায় তীব্র প্রতিবাদ আসতে থাকে। বিশিষ্ট চা-কর এবং গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিল সদস্য মিঃ জে. বাকিংহ্যাম, চা বাগানের ডাক্তার মেডিকাস, আসামের মিশনারী রেভাঃ এস. এন্ডেল ও আরও অনেকে ডাডিংয়ের বিরুদ্ধে লেখেন। ডাডিংয়ের প্রথম চিঠিতে একটি বিষয় পরিষ্কার হয় যে কাগজ ও আইনে কুলির স্বার্থরক্ষার জন্য যত বিজ্ঞপ্তিই দেওয়া হোক না কেন সেই আইনের অধিকার ও তার ব্যাখ্যা তার কাছে হতো না। বিভিন্ন চা-করদের মধ্যে যোগসাজসও ছিল। থানা পুলিশ ও আইনের হাত চা-বাগান পর্যন্ত পেঁছিত না সেকথা স্বয়ং সেক্রেটারী অফ স্টেট তাঁর নির্দেশ-নামায়[১] স্বীকার করেছেন—"I quite concur in the remark of your Government, that 'it is no doubt a great evil that the English agents of a large interest, such as that of tea planting in Assam, should find themselves isolated in positions from which the Courts are not easily accessible to them, or, it may even be, for the particular objects which arise in connection with their business, practically inoperative,' and in this view I approve the reference made by you to the Lieutenant Governor of Bengal as to whether the strength of the Civil Administration in Assam is sufficient for all present calls upon it."

মিঃ ডাডিংয়ের চিঠির প্রতিবাদে মিঃ জে. বাকিংহ্যাম বিভিন্ন পরিসংখ্যান উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে স্বগ্রামে এইসব ক্ষেতমজুররা অর্ধ অনশনে দিন কাটাত, সেক্ষেত্রে এখানে খেতে পরতে পারছে, সঞ্চয়ও কিছু না করছে এমন নয়, আর চা-বাগানের দুর্নামে যদি কিছুমাত্র সত্যতা থাকত তাহলে এত কুলিকামিনের আসামে আগমন হয় কি করে ইত্যাদি।

কিন্তু ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের অজগ্রামে দুঃস্থ অজ্ঞ চাষীর পক্ষে শিল্পপতির কুটিল গতি ধরতে পারা অসাধ্য। চা-বাগানে কয়েক বছর কাজের চুক্তি শেষ হবার পরেও তাকে পাকে প্রকারে বাধ্য করা হয়েছে চা-বাগানে থেকে যেতে, নতুন চুক্তিপত্রে স্বীকৃতি দিতে।

(১) Public Despatch to India, No. 103, dated 3rd December, 1866

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ চার্লস ডডিং নির্ভীকচিত্তে লেখেন,—

"It has been said that the garden labour system is a 'thinly disguised slavery'. This is a question of terms. Read the advertisements in the Indian Planter's Gazette. 'Coolies, any quantity, warranted junglies'! 'For sale' is not added but it is implied, and the man who can pay the price takes the coolies : who meanwhile have been kept walled enclosures under lock and key, to hinder them from escaping. The above paper had an article recently openly discussing what constituted ownership or proprietorship in a coolie." ১৮৯৪ সালে প্রকাশক থ্যাকার স্পিঙ্ক ডডিংয়ের লেখা মুখবন্ধসহ সমস্ত চিঠি বইয়ের আকারে প্রকাশ করে।

১৮৬৬ সালে Mr. W. Nassau Lees বাংলার পূর্ব্ব অঞ্চলের চা-বাগান ঘুরে এসে লিখছেন,[১]—"There can be little doubt that though ample checks are imposed by the law, some misrepresentation is still used to induce men to engage for the Tea Districts and that a few people are enticed away by highly coloured statements, if not by false promises. Indeed as far as I am aware, licensed recruiters and contractors are the prime abuse of the system."

হাউস অফ্ কমন্সে আসামের চা-কুলিদের দুর্দ্দশা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পার্লামেন্টের আইরিশ সদস্য মিঃ ও' ডনেলের প্রশ্নের জবাবে সেক্রেটারি অফ স্টেট জানান[২] যে চা বাগানে গড়পড়তা কুলির মৃত্যুর হার শতকরা ৫·৬৮, শতকরা ১০ নয় এবং গত কয়েক বছরে কুলিদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা হলেও তিনি ভারত সরকারকে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ দিয়েছেন যেন নতুন কুলিদের জন্য সুব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

ইংরেজ আড়কাটী টি. আর্লপিন সাহেব অজ্ঞ গ্রামবাসীদের আসামে কুলি হিসাবে চালানের উদ্দেশ্যে এক সুচতুর ফাঁদ পাতেন। একদিন হঠাৎ সাহেব

(১) Memorandum written after a tour through the Tea District of Eastern Bengal, p. 50

(২) Parliamentary Debates in the H. of Commons, Aug 18, 1881

গ্রামের পাঠশালে এসে উদয় হন। বাক্যবিন্যাসে আলপিন সাহেবের জুড়ি নেই। মিষ্ট কথায় ও জলপানির টাকা পণ্ডিত মশায় গয়ারামের হাতে তুলে দিয়ে তাকে ও তার সর্দার পোড়ো বৈদ্যনাথকে হাত করেন। মনে মনে টি. আলপিন বলেন,—"My business is angling and none should perceive how I give line."

গ্রামের লোকের অন্নাভাব ও দুঃখ দুর্দশা দেখে নাকি সাহেবের শান্তি নেই। সাহেবের মুখে এমন পরিষ্কার বাংলা গ্রামবাসী কখনও শোনে নাই। আর সব ইংরেজদের চেয়ে মনে হয় টি. আলপিন স্বতন্ত্র, শরীরে অনেক দয়ামায়া। স্বভাবতই গ্রামের দুঃস্থ, অল্পবিত্তের মানুষ, চৌকিদার, নাপিত, গোয়ালিনী, পণ্ডিত সকলেই সাহেবের কথায় আকৃষ্ট হয়। টি. আলপিন নাকি এদের কর্ম্মসংস্থান করে দিতে পারেন। পাঠশালার পড়ুয়া বৈদ্যনাথ সাহেবের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। পবন চৌকিদারকে বলে,—

দাদা, এ সে সাহেব নয়। এমন মিঠে সাহেব বাঙলায় কখনও দেখিনি। কেমন হাসি, কেমন মিষ্টি কথা, এমন বাঙলা জানে, পরিষ্কার।

পবন— এক একটা বাঙলা কয় কি কিচ কিচ করে মোটে বোঝা যায় না।

বৈদ্যনাথ—এ সেরকম নয়। দেশের উপকার করতে এসেচে।

পবন—আমাদের মতো আধ পেট ভরা লোকের একটা হিল্লে করতে পারে, তবে বুঝি।

বৈদ্যনাথ— তাই করবে।

সাহেবের সেলামির টাকাতে গ্রামের জমিদার পূর্ণচন্দ্রও বশীভূত হন। আলপিন সাহেবের কুকর্মের সহকারী আত্মারামকে জমিদার জানান যে একখণ্ড জমির মালিকানা নিয়ে অন্য শরিক অংশীদার আত্মীয়া বিধবা জগদম্বার সঙ্গে তার মনোমালিন্য চলছে, আত্মারাম আশ্বাস দেয় যে জমিদারের পথ নিষ্কণ্টক করবার চেষ্টা সে করে দেখতে পারে, সুকৌশলে ঐ বিধবাকে সে অন্যত্র সরাবে।

গ্রামের গোয়ালিনী ভারতী পাঠশালার পণ্ডিত গয়ারামের অনুরক্তা। আলপিন সাহেব মুক্তহস্তে গ্রামের যদু মধু রামা শ্যামাকে টাকা দিচ্ছেন। ভারতীও বাদ যায় না।

আলপিন—ভারতী তোমার টাকা পাইয়াছ ?

ভারতী—হাঁ সাহেব।

কথায় কথায় সাহেব ভারতীকে প্রশ্ন করেন তার সম্বন্ধে গ্রামবাসীর ধারণা কি।

ভারতী—তোমাকে, সাহেব আমাদের মত গরিব গুরবো লোক বড় ভালবাসে।

টি. আলপিনকে আত্মারাম এসে জানায় অতীতে নিজেকে মিথ্যা কুলীন পরিচয়ে যে ব্রাহ্মণ কন্যাকে সে বিবাহ করে এবং চা-বাগানে তাকে মেয়ে কুলী হিসেবে পাঠায়, এতদিনে সেই মেয়ের মা-বাপ মেয়ের খোঁজে এ গ্রামে এসেছেন আর আত্মারামের উপস্থিতি টের পেয়ে সর্ব্বত্র তলাশ করে বেড়াচ্ছেন। এখন একমাত্র উপায় চুরির সাজানো মামলায় ফৌজদারী ঠুকে সেই ব্রাহ্মণ ভবকিংকরকে এ গ্রাম হ'তে দূরে সরাতে হবে। এ প্রসঙ্গে আলপিন ও আত্মারামের মধ্যে গোপনে পরামর্শ চলে।

এরপর সন্ন্যাসী সেজে আত্মারাম কিছুদিন সেই গ্রামে আস্তানা পাতে। জমিদারীর শরিক জগদম্বা মোক্ষলাভের আশায় সন্ন্যাসীর উপদেশে তীর্থে গিয়ে বাস করবেন স্থির করেন ও এ বিষয়ে সন্ন্যাসীর সাহায্য চান। ঠিক হয় নির্দিষ্ট দিনে জগদম্বা সন্ন্যাসীঠাকুরের সঙ্গে তীর্থের পথে বেরিয়ে পড়বেন।

এদিকে আলপিনের যোগসাজসে চুরির অপরাধে নির্দোষ ভবকিংকর থানায় চালান হন। তিনি নাকি একটা কোট, তামাকের পাইপ ও অন্য দু'একটি জিনিষ চুরি করেছিলেন, আর থানার জবানীতে চুরির কথা স্বীকারও নাকি করেছেন। হাকিমের সামনে জেরার উত্তরে ভবকিংকর বলেন যে যদিও তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ, পুলিশ জমাদার থানায় এজাহার নেবার সময় আশ্বাস দেয় যে চুরির দায় স্বীকার করলে তিনি তাড়াতাড়ি মুক্ত হবেন। ভবকিংকরের মোক্তার প্রতিবাদীর হয়ে সওয়াল করেন কিন্তু হাকিমের বিচারে ভবকিংকরের দু'মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

তীর্থের নাম করে কৌশলে জগদম্বাকে আত্মারামের সঙ্গে গ্রাম থেকে সরিয়ে টি. আলপিন জমিদারের সঙ্গে দেখা করেন ও পারিশ্রমিক দাবী করেন।

পূর্ণচন্দ্র—খুব বাহাদুরি।

আলপিন—বাহাদুরির এই আরম্ভ, beginning only—যখন বাগানে গিয়া কুলিনীর বেশে টুকরি লইয়া চার পাতা তুলিবে, তখন বাহাদুরির consummation! আবার যখন কুলির প্রেমে পড়িয়া উদরে কুলি বাচ্চা ধারণ করিবে তখন বাহাদুরির range ছাড়িয়া উঠিবে!

পূর্ণচন্দ্র—আইনে আছে, বিধবা দ্বিতীয় বিবাহ করিলে পূর্ব্ব স্বামীর বিষয়ে বঞ্চিত হয়। সেটা উত্তম হইবে।

আলপিন—আমাদের পুরস্কার!

পূর্ণচন্দ্র—অদ্য কতক অংশ পাইবেন, পরে স্বয়ং আস্তানাতে গিয়া বাকি দিব।

আলপিন—কোন আপত্তি নাই। আপনার অনুগ্রহ থাকিলে যথেষ্ট।

গ্রামের নাপিত পণ্ডিত ও তার স্ত্রী চিন্তা আলপিন সাহেবের বাক্যবিন্যাস ও কৌশলে তার আয়ত্তে আসে। পণ্ডিত গোবেচারা নিরীহ স্বভাবের। যথেষ্ট পয়সা আয় করতে না পেরে স্ত্রীর কাছে কেঁচো হয়ে আছে। দেখেশুনে আলপিন সাহেব বলেন—

"কোন চিন্তা নাই, আমার সঙ্গে গেলে তোমার স্বামী ভাল হইবে।"

চিন্তা—এ জন্মে নয়। তবে কিছু চাকতি হাতে হলে সারলে সারতে পারে। পেঁচোয় পাওয়া কি শিগ্গির সারে?

আলপিন—তোমার অমন যৌবন উহাকে আরাম করিতে পার নাই, বড় আশ্চর্য্য!

চিন্তা—সাহেব, গরিবের যৈবন কি বুড়ো বয়স সব সমান!

আলপিন—আমি তোমাদের জন্য চিন্তিত আছি, শীঘ্র তোমাদের ভাল করিব। আজ খেউরি হইব না।

বৈদ্যনাথ ও পবন চৌকিদার এসে সাহেবকে জানায় সে কুড়িজন চাষী আলপিনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। উৎসাহে, আনন্দে সাহেব তখনই ছোটেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে। "That's very fair—চল চল, let me operate on them with my magic wand, তোমরা খুব ভাল লোক, old lads,"

আদালতে বিচারের সময় ভবকিংকরের মুক্তির জন্য তার স্ত্রী পূর্ণিমা যে দালালের শরণাপন্ন হয়েছিল, সেই দালাল গঙ্গারাম, আপীলের জন্য চেষ্টা হচ্ছে পূর্ণিমাকে এই কথা বুঝিয়ে, তাকে কৌশলে টি. আলপিনের হাতে তুলে দেয়। আলপিন রাতারাতি ভোল পাল্টে জেল হতে ভবকিংকরের মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

গ্রামের ময়দানে রাতের বেলা পাঠশালার পন্ডিত, সর্দ্দার পোড়ো, পন্ডিতের অনুরক্তা ভারতী গোয়ালিনী, নাপিত, নাপিতের স্ত্রী, ময়রা, ময়রাণী, চৌকিদার পবন ও অন্যান্য সকলে জড়ো হয়। পন্ডিত গয়ারামের উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। হ্যারিকেনের লন্ঠন হাতে সে হাঁকডাক শুরু করে, সকলে এয়েচে কি না। নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বলে যে, পয়সার চেয়ে বড় কিছু নেই রে যাদু, তাই না বাড়ী ঘর ফেলে সকলে বেরিয়ে পড়া, আর অমন ভাল জমিদার ছিল বলেই রক্ষে, সবার বাড়ীঘর দেখাশোনা করবেন বলেছেন, ফিরে এসে সকলে তাকে 'হরিপূর্ণচন্দ্র' নামে ডাকবে। পন্ডিত উঁচুগলায় ডাকে,—

"ওরে ধোপার পো, তুই ব্যাটা আগে যাত্রা কর, তোর তো একচেটে ব্যবসা! এরপর এদেশে ধোপা পাওয়া ভার হবে। পয়সার গরম বড় গরম! দেখিস

ব্যাটা, ফিরে এসে যেন খুঁড়িয়ে বড়ো হয়ে পড়িসনি! ভারতী গালে হাত কেন? Look sharp! বুলিটা সাহেব বলে দিয়েছেন। সেখানে পরের পয়সায় গরু মহিষের রেলা রেলি, বসে বসে মজা করে তদারক করবে। আর আমি পেচনে রইলুম। এমন সাহেব কি সকলের ভাগ্যে জোটে? পুণ্যের আলাপে কত লোকের উপকার হবে। চাষা ভায়ারা, কোন ভাবনা নেই, খাজনা টাজনা কিছু নেই কেবল সামান্য গতোর নাড়া, পাথোর পুরে অন্ন ধ্বংসান, আর গেঁজেতে টাকা পোরা! Look sharp! বদে, পবনা, ভাল কোরে লণ্ঠন ধর, সকলে সার গেঁথে দাঁড়া।"

একটু পরে আলপিন সাহেব আলো হাতে প্রবেশ করেন। সকলকে রওনা হতে বলে নিজে এই দলটাকে আগলে আগলে চলেন। আলপিন স্বগতোক্তি করেন,—

"Farewell! Farewell! Thousand blessings on the village! Thousand thanks to the Zeminders! This sort of clever recruiting is unparalleled in the annals of tea gardens! But silence! There are a good many hitches between the glittering cup and the parched lips! Fie! Fie! A Briton's grasp is firm! What he catches he secures!"

কুলি-ডিপোতে গঙ্গারাম দালাল এসে আলপিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করে। সে পূর্ণিমা ও আর একটি স্ত্রীলোককে ক'দিন আগে মেয়ে-কুলি হিসাবে সাহেবের হাতে দিয়েছে। এখন বকেয়া পারিশ্রমিক চাই। আলপিন হেসে একথা উড়িয়ে দেন। খেতে না পেয়ে ওরা স্বেচ্ছায় এসেছে। এজন্য কমিশন আবার কি? গঙ্গারামের লাইসেন্স আছে? কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর সাহেব তাকে মারতে আসেন, হাতাহাতি সংঘর্ষে গঙ্গারাম আলপিনের মণিব্যাগ হাতসাফাই করে লম্বা দেয়।

আড়কাটি সাহেব আর রেলের ষ্টেশন-মাষ্টারের যোগসাজসে গ্রামের দলটির জন্য সংরক্ষিত রেলকামরার ব্যবস্থা হয়। ধারে কাছে কেউ যেন যেতে না পারে এজন্য পুলিশ মোতায়েন থাকে। একে একে বাঙালী সাবজজ, মুন্সেফ সাহেববেশী কেরাণী, ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, একজন জমিদার ও তার পারিষদ ও একদল গঙ্গাযাত্রী ষ্টেশনে আসে। প্রত্যেককেই ঐ রিজার্ভ কামরার কাছ থেকে মিষ্টি কথায় বা চোখ রাঙিয়ে হটান হয়।

অতীতে ভবাকিংকরের মেয়ে কুমারী আত্মারামের যে জঘন্য কৌশলে আসামে

চা-বাগানে আসে, সেস্থান হতে একদিন সুযোগ পেয়ে সে জংগলে পালায় ও নাগাদের আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে জগদম্বা সন্ন্যাসীবেশী আত্মারামের দ্বারা প্রতারিত হয়ে আসামে আসে ও ঘুরতে ঘুরতে জংগলে কুমারীর সাক্ষাৎ পেয়ে ঐ একই নাগাদলের আশ্রয় নেয়।

টি. আলপিনের ক্ষতিসাধনে বদ্ধপরিকর দালাল গংগারামও আসামে উপস্থিত। আর স্ত্রী পূর্ণিমার সন্ধানে ভবকিংকর আসামে এসে জংগলের পথে গংগারামের সাক্ষাৎ পান। এরাও একদল বন্ধুভাবাপন্ন নাগাদের সংস্পর্শে আসেন। অতীতে কৃত নানা দুষ্কর্মের জন্য গংগারাম অনুতপ্ত। শুদ্ধাচারী, দেবোপম ভবকিংকরের সংস্পর্শে তার নৈতিক উন্নতি ঘটে। মনে মনে সংকল্প করে ধূর্ত্ত টি. আলপিনের হাত থেকে গ্রামের দলটিকে উদ্ধার করবে।

এরপর দেখা যায় আলপিন সাহেব, গ্রামের দলবল এবং কর্ম্মচারীদের সংগে নিয়ে আসামে চা-বাগানের পথে চলেছেন। পথশ্রমে ক্ষুধায় সকলেই ক্লান্ত। পা আর চলে না, কিন্তু আড়কাটি আলপিনের এখন এসব অজুহাত শোনার সময় নেই। তাড়িঘড়ি চা-বাগানে পেঁছিতে হবে। একবার যখন রেজিষ্ট্রি হয়ে গেছে তখন সৌজন্য, ভদ্রতার খোলস ছেড়ে আসতে বাধা কি? চাবুক হাতে তিনি দলটাকে ঠেলে নিয়ে যেতে চান। প্রথমেই নজর পড়ে নিরীহ স্ত্রৈণ নাপিত পতিতের উপরে। তাকে জলদি পা চালাতে বলে বলেন,—

"আমার নিকটে আইস—স্ত্রীর সংগে আলাপ করিবার এ স্থান নহে।"

[পতিতকে ধরে আকর্ষণ]

পতিত—চিন্তে গেলুম, গেলুম।

আলপিন—চিন্তে আমার কি করিবে? রেজেষ্টারি হইবার সময় বড় গন্ডগোল বাঁধায়েছিলে—এর শাস্তি বাগানে দিব।

গয়ারাম নিবেদন করে হুজুর সকলের পায়ে ব্যথা হয়েছে একটু আস্তে চললে হয়না। কিন্তু কে শোনে কার কথা। গয়ারাম আবার কিছু বলবার চেষ্টা করতেই সাহেব গর্জে ওঠেন—"চোপরাও, চা-বাগানের কুলী তোমরা। সাবধান!"

ভারতী—সাহেব আমরা সব কুলি!

আলপিন—ভারতী, তোমাকে আমি কুলী বলিতেছি না, অপর সকলে কুলী।

ভারতী—সেকি সাহেব!

আলপিন—I will make you master and mistress of my house in the garden! আমার স্ত্রী ছিল তাহাকে ডাইভোর্স করিয়াছি।

পণ্ডিত স্ত্রীর পাশে যাবার চেষ্টা করতেই সাহেব চাবুক লাগান। গয়ারাম পন্ডিত বলেন—"সাহেব মারধোর করা বড় ভাল হচ্চে না।"

আলপিন—তুই আমাকে শিখাইতে চাস। এই প্রহার করিলাম। (গয়ারামকে প্রহার) Curse it. How hard the brute's bones are! I will settle you shortly.

পবন চৌকিদার—আমরা যাব না।

আলপিন—I would rather kick the bucket at once! খুন করিব, খুন করিব।

পবন—আইন আছে—আইন আছে। চুপ হয়ে গেলে যে।

আলপিন—কর্ম্মচারীগণ, আত্মারাম, চাবুক লাগাও—চাবুক লাগাও।

গ্রামের দলটির উপরে যখন মারপিট চাবুক চলতে থাকে তখন আশ্রয়দাতা নাগাদের সাহায্য নিয়ে দালাল গঙ্গারাম আলপিন ও তার দলবলের উপর চড়াও হয় ও আড়কাটি ও তার কর্ম্মচারীদের বন্দী এবং অন্যান্যদের মুক্ত করে। বন্দী আলপিন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা নাগাদের আস্তানায় নীত হয়। অন্যদের জাহাজে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়।

শেষ দৃশ্যে টি. আলপিন ও তার সহকারী আত্মারাম সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তার জন্য গঙ্গারামকে উদ্যোগ করতে দেখা যায়। আত্মারামকে উদ্দেশ করে সে বলে,—

"ঘরের শত্রু বিষম শত্রু! আত্মারাম কোদাল পেড়ে, মোট বহে, খেতে হয়, সেও ভাল, তবু পরের বউ ঝি বের করে টাকা ঘুরিয়ে গাড়ি জুড়ি চড়া ভাল নয়! রাজার নিন্দা হয়, দেশে অশান্তি হয়, এমন কাজ করতে নাই। যারা খেতে পায়না, সত্য কথা বলে তাদের আনলে নিন্দার কাজ হয় না।"

আত্মারাম—"এবার যদি রক্ষা পাই কখন আর এ নচ্ছার কাজে হাত দেব না।"

ভবকিঙ্করকে দেখিয়ে গঙ্গারাম বলে,—"কুলীন সেজে এ ব্রাহ্মণের কুল নষ্ট করেছ, সে কথা যাক, কিন্তু যদি তুমি ব্রাহ্মণ না হতে এ নিরীহ ব্রাহ্মণের কি সর্ব্বনাশ হত বল দেখি?" এরপর আত্মারাম ক্ষমা প্রার্থনা করে। নাগাসর্দ্দারকে ডেকে গঙ্গারাম তাকে মুক্ত করতে বলে।

দেখেশুনে আলপিন সাহেব স্বগতোক্তি করেন, I am done for.

গংগারাম বলে,—

"সাহেব, আমি কালা বলে কালাকে ছাড়লুম আর তোমাকে যন্ত্রণা দেব, সেটা তুমি ভেবোনা। দেবতার অনিষ্ট করে বাঙ্গালী এমন মহাপাতকী নহে। আমি কালা বলে কালাকে ছাড়িনি; কেন ছেড়েছি স্বচক্ষে দেখেছ। আমাদের জাতির যদি সকলের স্বজাতি প্রেম থাকতো, তাহা হলে আড়কাটির সাহায্য করতে আমাদের লজ্জাবোধ হত, এত অধঃপতন হত না। সাহেবকে ছাড়িয়া দাও।"

মুক্ত আলপিন ঘোষণা করেন—"Good Heavens! In the name of everything sacred I pledge myself hence forward to attempt at the abolition of this system of quasi slavery."

একেবারে নতুন মানুষ গংগারাম আলপিনকে বলে যে গরীবের বন্ধু হওয়াই সাহেবের উচিত কারণ তিনি রাজার জাতি। তারপরে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার উপসংহারে নাগাসর্দ্দারকে সে বলে,—

"চল সর্দ্দারজি, একটা দল বাঁধতে হবে, সাহেবকে কর্ত্তা করতে হবে। কোথায় কতলোককে ফাঁকি দিয়ে আনে খবর নিয়ে আবেদন করে উদ্ধার করতে হবে। এই বেশে ঘুরে ঘুরে যদি একটা দুঃখী লোককে ঐরকমে উদ্ধার করতে পারি, গংগারামের পাপের বোঝা কমতি হবে।"

(সকলের প্রস্থান। যবনিকা পতন।)

THE MIRROR OF A TEA PLANTER.

OR

চা-কর দর্পণ নাটক।

শ্রীদক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

"HONI. SOIT. QUI. MAL. Y. PENSE."

কলিকাতা।

৫৩ সীতারাম ঘোষের ইষ্ট্রীটস্থ
সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে

শ্রীযদুনাথ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮১। পৌষ।

THE MIRROR OF A TEA PLANTER

OR

চা-কর দর্পণ নাটক

[দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় নাটক মৌচাকে ঢিল পড়ার মতো চা-করদের স্বার্থে আঘাত করে। 'চা-কর দর্পণ' প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালের ডিসেম্বরে। ছয় মাস পরে ঢাকার সাপ্তাহিক হিন্দু হিতৈষিণীর ৫ই জুনের (১৮৭৫ ইং) মন্তব্য অনুবাদ করে Report on Native Papers [12th June, 1875] লিখছে—"...if the author be actually prosecuted, as it is feared he will be, some good will no doubt be done to the oppressed and the people led to question their honesty. It is needless to observe that the public regard indigo-planters and tea-planters in very much the same light."

এর প্রায় এক বছর পরে ঐ একই পত্রিকার সংবাদ (২২শে এপ্রিল ১৮৭৬) তর্জমা করে Report on Native Papers (২৯শে এপ্রিল) জানাচ্ছে—"The publication of a book called the Chakar Darpan : the Tea-planter's Mirror has enraged the Anglo-Indian Community against the author. Not a little effort has been made to bring him to trouble and the Dramatic Performances' Bill has perhaps originated from this source."

বাংলার নাট্যজগতে রাজরোষ এই প্রথম নয়। নীল-দর্পণ, সুরেন্দ্র বিনোদিনী, গজদানন্দ ও যুবরাজ, শরৎ-সরোজিনী, গায়কোয়াড় ইত্যাদি নাটকে দেশপ্রেমের সাক্ষর শাসকগোষ্ঠীর বরদাস্ত হয় না। বাংলার লেফটেনান্ট গবর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল এক বিবৃতিতে[১] বলেন—"Last year, 1875, a play was written called 'The trial of the Gaekwar' which travestied and distorted the judicial and political proceedings at Baroda. Still more recently a play called 'Gujadanund and the Prince' was produced on the stage; this among other things libelled an individual native gentleman, but it also endeavoured to bring contempt upon some of the highest British institutions. This was followed up immediately by a play intended to excite dislike against the police."

(১) Home Department Proceedings, Public, August 1876 (Minute by the Lieutenant-Governor of Bengal dated 13th June 1876).

দীনবন্ধুচরণের নাটকে চা-বাগানের কেলেঙ্কারী প্রকাশ হওয়ায় চা-করদের উষ্মা নাটক নিয়ন্ত্রণের আইন ত্বরান্বিত করে। ভারত সরকার সেক্রেটারী অফ স্টেটকে নির্দেশ চেয়ে চিঠি লেখেন। ওদিকে আইন সভা তৎপর হয় উপযুক্ত আইন প্রণয়নে। সমস্ত প্রদেশে নাটক নিয়ন্ত্রণ বিল সম্বন্ধে মতামত চাওয়া হয়। বলাই বাহুল্য, বিভিন্ন নাগরিক সংস্থা ও বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ আসে এবং প্রদেশ সরকার বিল সমর্থন করে। আইন সভার বিতর্ক এবং বিভিন্ন প্রদেশ সরকারের মন্তব্য পাঠে পরিষ্কার বোঝা যায় যে নিয়ন্ত্রণের নামে ভারত সরকার দমননীতির স্টীমরোলার চালিয়েছিলেন ভারতবাসীর বাকস্বাধীনতার ওপর। ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বরে নাট্যানুষ্ঠান আইন, Dramatic Performance Act পাশ হয় আর আইন লঙ্ঘনকারীদের জন্য তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড, অথবা জরিমানা, অথবা একযোগে দুই দণ্ডবিধির ব্যবস্থা হয়।]

মাধবপুর গ্রামের চাষী সারদা, বরদা দুই ভাই। স্ত্রী সংসার নিয়ে এদের কায়ক্লেশে চলে যায়। সে বছর আকালের সময় পর পর দু'বছর জল হল না। ধান হবে কি? প্রথম বছরে ঘরে যে কটা রুপোর গয়না ছিল, বেচতে হলো খোরাক জোটাতে। আর এখন এ বছর উপায়? দু ভাই ভাবে গরু, লাঙ্গল একে একে বেচে দেবার কথা। জমিদারকে গিয়ে একবার ধরলে হয় না খাজনা মকুব করে দিতে? কোথাও যদি কোনোদিকেই উপায় করতে না পারা যায়, না হয় চাষ আবাদ ছেড়ে দু'ভাই কোনো কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে।

কিন্তু কাজই বা এদের কে দেবে?

হরিদাস চক্রবর্ত্তী একজন কেষ্ট বিষ্টু না হলেও মাধবপুরে তার আসা যাওয়া আছে। আর হবেই না বা কেন, আসাম অঞ্চলে চা-বাগানে কুলি কামিন জোগাড় দিতে তাকে যত্র তত্র ঘুরতে হয়। হরিদাস চক্রবর্ত্তীর টোপ গিলতে এই দুঃখী পরিবারের বেশিক্ষণ লাগে না।

বরদা—তবু কাজটা কি?

হরি—চা গাছ শুনিছিস্, তারির পাতা তুলতে হবে।

বরদা—এই কাজ, তা আমরা পারবো না কেন?

হরি—তবে তোমরা রাজি হওতো তোমাদের পাঠিয়ে দিই।

বরদা—মাসে কত করে মাইনে দেবে?

হরি—(স্বগত) মাইনের কথাটা বেশী করে না বল্লে বেটারা যাবে না দেখ্‌চি, তবে তাই বলি, (প্রকাশ্যে) মাইনে মাসে দশ টাকা আর খোরাক পোষাক দেবে।

বরদা—তবে মন্দই বা কি, দাদা কি বল যাবে?

সারদা—আমার যাবার ইচ্ছে হয়েছে। পরিবারগুল খেতে পোরতে পারবে।

বরদা—তবে চক্রবর্ত্তী মশায় আমাদের যাবার ইচ্ছে আছে, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমাদের যোগাড় করে দিন।

চা-বাগানে কুলি যোগানদার কেশববাবু কলকাতায় অফিস খুলেছেন, হরিদাস চক্রবর্ত্তী তাঁরই সরকার। আসাম, কাছাড়ে মাসে আড়াই'শ তিন'শ মজুর না পাঠালে চলে না, তা ছাড়া আট দশ জন কর্মচারী, সরকার, পেযাদা, বেহারা আছে। এত কর্মকান্ড ছাড়াও কেশববাবুর নিজের খরচ আছে। বাংলার নানা জায়গা যশোহর, নদীয়া হতে তার সরকাররা লোক জোগাড় করে আনে। তবে সাধারণ মানুষ কি আর স্ব-ইচ্ছায় ভিটে মাটি ছেড়ে যেতে চায়? এই যেমন হরিদাস সেদিন কেশববাবুকে বলছিলেন,

"আমি এত স্থানে ঘুরে বেড়াই, কেউ আর যেতে চায়না। আমি যদি পাড়া দিয়ে যাই, তাহলে পাড়ার ছোঁড়াগুল বলে কি ঐ মানুষধরা যাচ্ছে। আমার শুনে বড় লজ্জা হয়।"

কেশব—ওহে তাই বেন দেখ না, এখানকার লোকেরা সে দেশে যাবে কেন? আর সেখানে তো সুখ বড়, দিবারাত্র চা-গাছের চাষ কত্তে হবে, চা-করেরা দিনের মধ্যে বিশবার বিশ ঘা জুতো মারবে, আর এক এক মুঠো খেতে দেবে, তাতে বাঁচ আর মর।

নাঃ এ দেশীয়দের দ্বারা চা-বাগানের কাজ হবে না। কেশববাবু পাহাড়ী কুলি যোগানের কথা ভাবেন।

হরি – বেশ বোলেচেন, এ দেশের গরিব দুঃখী কোনো লোকেই আর যেতে চায় না; পাহাড়ি বেটাদের ভুলিয়ে আনতে পারলেই ঠিক হবে। কিন্তু তাতে বেশী খরচ পোড়বে না?

কেশব—খরচ পড়ে পোড়বে, সে তো আমার বাবারও যাবে না, আর তোমারও যাবে না, যাবে সেই চা-কর বেটাদের, তা গেল গেলই, আমাদের তাতে ক্ষতি কি?

এ কথা সেকথার পর, হরি নিবেদন করে যে মাধবপুরে এক গেরস্থ চাষীকে সে বলে কয়ে এসেছে। তারা দু-ভাই, দু-স্ত্রী সপরিবারে আসাম-শ্রীহট্টে যেতে চেয়েছে।

কেশব—বটে তবে যেন তারা হাতছাড়া হয়না দেখো দেখো। ভাঙচি দেবার অনেক লোক আছে, এই যে কতকগুল খপরের কাগজওয়ালা হয়েচে সেই বেটারাই সকলের চোক কান ফুটিয়ে দিচ্চে, আমাদেরও অন্ন মাচ্চেন, অধঃপাতে যাবেন।

মাধবপুরে সারদা-বরদার পরিবারে একই সঙ্গে আশা আর অজানা ভয় নেমে আসে। বড়ভাই সারদার স্ত্রী নৃত্যকালী ও ছোট বউ সরমা কি হবে আর কি

হতে চলেছে ভেবে কূল পায়না। বিশেষ জাহাজে চড়ে যেতে হবে, সে বড় ভয়, আর মনে করলেই কি ফিরে আসা যাবে?

নিত্যকালী—একটা কথা হচ্ছে, দেশের মায়াটা একেবারে ছেড়ে যেতে পারা যাবে না।

নিত্যকালীর স্বামী—দেশ ছাড়বো কেন? দুই বছর হোক্, পাঁচ বছর হোক্, দশ বছর বাদে হোক্ কতকগুল টাকা করে দেশে চলে আস্‌বো।

কলকাতায় কেশববাবুর বৈঠকখানায় সারদা-বরদা ও তাদের স্ত্রীরা এসে পৌঁছলে, কেশববাবু সাত-তাড়াতাড়ি তাদের রেজিষ্ট্রির কাজ সেরে নেন, কারণ কেশববাবুর ভাষায়—"রেজিস্টারি হয়ে গেলে লোকে ভাঙচি দিক্, চা-করদের অত্যাচারের কথা বলুক; যা খুসি তাই করুক, তখন আর এড়াবার যো থাক্‌বে না।"

রেজিষ্ট্রি অর্থাৎ একে একে চারজন কর্মপ্রার্থীর নাম, গ্রামের নাম, বাপের নাম, রেজিষ্ট্রি নম্বর, তারিখ কেশববাবুর পাকা দলিলে লেখা হয়ে যায়। তারপরে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে চা-বাগানে যেতে রাজী এই স্বীকৃতি আইনমাফিক দিতে হয়।

রেজিষ্ট্রি হল, নিজমুখে সাহেবের সামনে কবুল হল, তবু কেন এক অজানা আশংকা থেকে যায়।

সারদা—আমার কিন্তু প্রাণটা কেমন কেমন কচ্চে, আপনার দেশটা ছেড়ে যেতে মনটা কাঁদে, এখানে খাই আর না খাই, তবু মাটি কামড়ে পড়ে থাক্‌লে ভাল থাকি। আপনার দেশের বড় গুণ, খাই না খাই লোকে তো বোল্‌বে আমাদের দেশের লোক। এ যে কোথাকার গাঁয়ে যাব, তার ঠিক নেই। এতক্ষণ আমার আহ্লাদ হয়েছিল, এখন কিন্তু বুকের ভিতর গুর গুর কচ্চে। আমি বোধ করি আর এদেশে ফিরতে হবে না।

ভোলানাথের কাজ কুলি যোগানদারদের ডিপো পরিদর্শন করা। সারদা-বরদার আসামে রওনা হবার দুদিন তখনও বাকী। ভোলানাথ ডিপো দেখতে এসে এই গেরস্থ পরিবারটির সাক্ষাৎ পায়। একে একে খুটিয়ে সব শুনে রেজিষ্ট্রি হয়ে গেছে জানতে পেরে ভোলানাথ বলে,

"তবে তো ব্যাটা, তোরা আপনার পায়ে আপনারা কুড়ুল মেরেছিস, আর তোদের বলেই বা কি হবে, আর না বলেই বা কি হবে?"

বরদা—না মশায় একবার বল।

ভোলা—আর বাপু তোমরা বল্‌তে বল্‌ছ তবে বলি। আসাম, কাছাড় এবং সিলেট এই তিনস্থানে চা-কর সাহেবদের চা-বাগান আছে, এদেশ হতে

সব কুলি ধরে নিয়ে যায় আর সেখানে পেটভাতায় রাখে, হলো সময়ে সময়েও বা কিছু কিছু করে দেয়। আর তাদের বুকে হাঁটু দিয়ে খাটায়, যারা এদেশ থেকে যায়, তাদের প্রায় আর কাহাকেও ফিরে আসতে হয় না।

এখন উপায়? রেজিষ্ট্রি হয়ে গেছে, ছাড়া পাবার উপায় নেই, একমাত্র পথ পালাতে হবে। ভোলানাথ উপদেশ দেয় জাহাজ ছাড়বার এখনও দুদিন দেরী, আজ রাতেই পালাও।

বরদা ভাবে আমরা না গেলে তো জোর করে ধরে নিয়ে যেতে পারবে না, আমরা যাব না তাহলে আর কি করবে?

হরিদাস চক্রবর্ত্তীকে সারদা-বরদা গিয়ে ধরে, কে এক বাবু এসেছিল বলে গেল সে মুল্লুকে গেলে আর ফিরতে হবে না। আমরা যাব না।

হরি—কি বল্‌চিস হারামজাদা, তুই যাবি না, তোর বাবা যে সে যাবে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে স্বীকার করিচিস এখন যাবি না বল্‌চিস? সাহেব দ্বারবান দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে। তোর জোরেই জোর?

আজব দেশ আসামের এই চা-বাগান। এখানে একবার এলে দেশে ফেরবার পথ হারিয়ে যায়। পুরনো কুলি মাধব সেই কবে কোনকালে অল্প বয়েসে বাড়িতে ঝগড়া করে কলকাতা পালিয়ে কুলিদলে নাম লেখায়। তারপরে এত দিন হয়ে গেলো, কোনোদিন তার দেশে ফেরা সম্ভব হবে তাও তো বোধ হয় না। সারদা-বরদার প্রশ্নে সে জানায়,

"পালাবার যো তো নাই। চা-কর সাহেবদের চারিদিকে লোক রয়েচে, পালাতে গেলে তারা সাহেবকে বলে দেবে, তা হলেই কয়েদ করবে। আর যদিও জাহাজে করে যাওয়া যায়, তা হলে ঢের টাকা খরচ হয়, সে টাকা কোথায় পাব?"

সারদা—তুই এত বছর আছিস টাকা জমাতে পারিস নাই?

মাধব—আর ভাই টাকা জমাব, যা পাই তা খেতেই কুলয় না।

বরদা—আচ্ছা ভাই, সাহেবরা কেমন লোক?

মাধব জানায় যে চা-কর সাহেবদের অসাধারণ গুণ, যার পরিচয় নতুন কুলিরা ক্রমে ক্রমে সবই জানতে পারবে। স্ব-মুখে সে বলতে চায় না কারণ কে কোথা থেকে শুনে বলে দেবে তাহলে তাকে মার খেতে হবে। এই মারের প্রশ্নে মাধব আরও জানায় এখানে তো তার তিনকুলে কেউ নেই, তাই পান থেকে চুণ খসলেই মার খেতে হয়। তবে সারদা-বরদার কথা স্বতন্ত্র। রহস্যের ছলেই মাধব বলে,—

"তোরা দুই ভাই রয়েচিস, আবার তোদের সঙ্গে দুই বউ রয়েচে।"

বরদা—তা এতে আর কি হবে ?

মাধব—হবে আবার কি ? তোরা অনেক টাকা রোজকার কর্ত্তে পারবি, সাহেব তোদের যথেষ্ট ভালবাস্‌বে, এর চেয়ে আর সুখ কি হবে ?

বরদা—কিসে তাই বল্‌ না ?

মাধব—তুই তো বড় বোকা লোক দেখ্‌তে পাই।

বরদা—আমরা চাষা লোক, আমরা বোকা নয় তো আর কি ?

মাধব—এই তোদের বউরা সাহেবের পা টিপে দেবে, আর তোরা সাহেবের কথা শুন্‌বি, তা হলেই অনেক টাকা রোজগার হবে।

সারদা—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, আমাদের বউরা সাহেবের কাছে যাবে, হিঁদু হয়ে সাহেব ছোঁবে ? তুই কি জাত ?

মাধব—আমি যে জাতি হই না, এরপর বাবা টের পাবে।

সারদা—আমরা টের পাব কি ? আমাদের মারধর করে, আমরা এখান থেকে চলে যাব।

মাধব—চলে আর এ জন্মের মত যেতে হবে না।

বরদা—কেন ? এর পর যদি বেঁচে থাকিস, তো দেখ্‌বি।

মাধব—আমার অনেক দেখা আছে, আমি এখানে ছেলেবেলা থেকে একরকম বুড়ো হয়ে গেলুম, কত হাজার হাজার লোক এলো, কতশত সাহেব এলো, আমার কাকেও দেখ্‌তে বাকি নেই।

সারদা—তোর পিঠে ঘা হয়েচে না কি ?

মাধব—আর বাবা ঘা হয়েচে, এ ঘা হয় নাই, মারের ঘা, ও কথা আর জিজ্ঞাসা কর না।

সারদা—কেন কেন কি হয়েচে বল ?

মাধব—যদি এক কাজ কর্ত্তে পার তা হলে বলি।

সারদা—আমাদের ক্ষমতা হয়, অবিশ্যি করবো।

মাধব—তোমরা অনায়াসেই পারবে। তোমাদের ছোট বউটিকে যদি সাহেবের সাক্ষাতে আমার স্ত্রী বলে পরিচয় দাও।

সারদা—তা হলে কি হবে ?

মাধব—তা হলে মারের হাত এড়াব।

সারদা—তা আমরা পারবোনা।

মাধব বলে যে একাজ পারলে ভাল হতো, যার স্ত্রী তারই রইলো, শুধু সে মারের হাত থেকে বেঁচে যেত।

চা-কর সাহেবের দেওয়ান নিধুরাম ঘোষ বড় জবরদস্ত লোক। বেতহাতে টহল দেবার সময় কিছুই তার নজর এড়ায় না। কোন কুলী বসে গল্প করছে পাতা তুলছে না নিধুরাম ঘোষ থাকতে সেটি হচ্ছে না। নতুন কুলিদের সঙ্গে মাধবকে আলাপ করতে দেখে বলে,

"তুই শালা যত নষ্টের কু। এই নূতন লোকগুলো এসেছে, এদের ভাঙচি দিচ্চ। শালাকে আজ মেরে খুন করবো।"

নিধুরাম মারতে যেতেই মাধব তাড়াতাড়ি সরে পরে। সারদা-বরদার কাজের তত্ত্বাবধান নিতে নিতে হঠাৎ নিধুরামের দৃষ্টি পড়ে সরমার প্রতি। চাষার ঘরে এমন সুন্দরী মেয়েও হয়? নিধুরামের অনেক গুণের মধ্যে একটি হলো, চা-বাগানে নতুন কোন সুন্দরী কামিন এলে সাহেবকে খবর দেওয়া। সরমাকে দেখে নিধুরাম স্বগতোক্তি করে,—

"আহা এদিকের এটি কি সুন্দরী, কেমন গোলাল শরীরটি মুখখানি পূর্ণচন্দ্রের মত, সদাই হাঁসি হাঁস। এরে যদি হস্তগত করে সাহেবকে দিতে পারি, তাহলে অবশ্যই সাহেব আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হবেই হবে। আর আমার মাহিনাও বেড়ে যাবে। আর সুধু যে সাহেব একলা ভোগ দখল করবেন তাও হতে পারে না। আমার বক্ষস্থল সুশীতল হবে। বাস্তবিক চাষাদের ঘরে কিন্তু এমন মেয়ে দেখতে পাওয়া যায় না; এরা কি চাষা হবে, আমার বিশ্বাস হচ্চে না, আর এরা যদি ভদ্রকুলোদ্ভবা হয়, তা হলেই বা এ চা-বাগানে চা তুলতে আসবে কেন?"

নৃত্যকালী ও সরমার সঙ্গে পুরনো কামিন শ্যামাকে দেখে নিধুরাম জ্বলে ওঠে—তুমি এই ভদ্রলোকের মেয়েদের মজাতে এসেছ।

শ্যামা—আমি বুঝি এখন পুরণ হলুম। আগে যে বোলতে "তুই আমার বুক জুড়ান শ্যামা", এখন আমি হারামজাদি হলুম, এখন আমি ভদ্রলোকের মেয়েদের মজাতে এসেছি?

নিধু—না তো কি?

শ্যামা—আমি মজাতে এসেছি, না তুমি?

আরও দু'চার কথা কাটাকাটির পরে নিধুরাম তাকে মারতে উদ্যত হলেই শ্যামা ছুটে পালায়, কিন্তু যাবার আগে নবাগতাদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলে,—

"ওলো তোরা ভাই সাবধান; তোদের যেন এ মিনসে মজায় না, আমার তো শেষকালের এই দুর্দশা দেখলি।"

নিধুরাম হঠাৎ ঘনিষ্ঠ হতে চায় নৃত্যকালী ও সরমার সঙ্গে। একথা সেকথার পরে বলে,—

"তোমাদের আজ আর কিছু কর্ত্তে হবে না, হাত টাত ব্যথা হবে।" (স্বগতঃ)-তোমার ঐ কোমল হস্ত আমার এই বক্ষস্থলেই রইলো, বেদনা হতে দিব না।

চা-বাগানের মালিক ম্যাক্‌লিন সাহেব মনে মনে গত বছর আর এ বছরের লাভ-লোকসানের হিসাব করেন আর দেওয়ান নিধুরামের মুন্ডপাত করেন। ঐ নিধু বলে কিনা কাজ হচ্ছে, লাভ হবে। কই তাহলে গত বছর এত টাকার লোকসান হয় কি করে। এ বছর কী হবে কে জানে। নিধুর ডাক পড়ে।

দু-চার কথার পর ম্যাক্‌লিন সাহেব জানতে চান সেই বিশেষ ব্যাপারের কী হলো। নিধু বলে যে সে চেষ্টায় আছে।

ম্যাক্‌—তোমার মরিলে চেষ্টা হইবে।

নিধু—আপনি কথায় কথায় গ লাগালি দেন, এমন কর্ম্ম নাই কল্লুম।

ম্যাক্‌—শালা তুমি আমার মেজাজ জান না? নীলকর সাহেবদের শামচাঁদ আছে, মোর চাবুক আছে, সেই চাবুক তোমাকে না দিলে, তুমি সিধা হবে না।

নিধু জানায় এ ব্যাপারে কিছু টাকার দরকার, আপাততঃ একশ টাকা লাগবে, পরে সে এখানে এলে আরও দু'শ লাগবে। টাকার সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়ে সাহেব বলেন,—"নিধে আমি টোরে বড় love করি, তুই তা জানিস।"

নিধু— (স্বগত) এখন জান্‌বো বৈ কি, মন যোগাতে পাল্লে, সকলেই সকলকে ভালবাসে। (প্রকাশ্যে) তা জানি।

খোসমেজাজে সাহেব এবার নিধুর সঙ্গে ব্যবসার লাভ-লোকসান নিয়ে কথা বলেন। এক সময় জিজ্ঞাসা করেন নিধুর কে কে আছে। সে বলে তার মা, ভাই, বোন, তাদের সন্তান, ভগ্নিপতিরা, পিসি, খুড়ি সবাই আছেন।

ম্যাক্‌—আমি তো তোর মাকে দেখিয়াছি, তোর ভগিনীদের কেন দেখাস্‌নি।

নিধু—(স্বগত) শালা বলে কি? আমরা প্রায় ও'দের মতন কিনা যে মা-বোনদের রাস্তায় রাস্তায় নিয়ে বেড়াব? (প্রকাশ্যে) তারা কি বাড়ির বাহির হয়?

ম্যাক্‌লিন কথায় কথায় জানান যে কিছুদিন আগে তিনি কলকাতা বেড়াতে গিয়ে দেখে এসেছেন যে সেখানে বাঙগালি বাবুরা তাদের পরিবার নিয়ে গাড়ি করে বেড়াতে যাচ্ছে। তবে নিধু কেন বলে যে বাঙগালিরা রাস্তায় পরিবার নিয়ে যান না।

নিধু—ধর্ম্মাবতার! আমি মিথ্যা বলি নাই, সকল বাঙগালি বাবুরা পরিবার নিয়ে যান না। তবে যাঁরা civilized (সভ্য) হইয়াছেন, তাঁহারাই এই করেন।

ম্যাক্—তুই কেন civilized হয় না ?

নিধু—আমরা পাড়া গেঁয়ে লোক, ও সকল করলে আমাদের দেশের লোকেরা গায়ে থুথু দিবে।

নৃত্যকালী ও সরমা মেটে ঘরের ভিতরে নিজেদের সুখ দুঃখের কথা বলছিল। সরমা জানায় কি এক অমঙ্গলের আশঙ্কায় ক'দিন থেকেই সে অস্থির। নৃত্যকালী প্রবোধ দেয়, ভগবান করেন তো কয়েক বছরের মধ্যেই দেশে ফেরা সম্ভব হবে।

টাকার সংস্থান করে নিধুরাম সারদা ও বরদার মেটে ঘরের সামনে আসে। সারদা-বরদা বাড়ীতে নেই জেনে নিধুরাম আশ্বস্ত বোধ করে। নৃত্যকালী ও সরমাকে জানায় যে সাহেব তাদের গত মাসের মাইনের টাকা পাঠিয়েছেন। দু-চার কথার পরে সে এবার বলে যে সাহেব তাদের বখশিস দিতে চেয়েছেন, বিকালে যদি তারা একবার সাহেবের কাছে যায়।

নৃত্য—বৈকালে যে মশায় আমরা কাজে যাব।

নিধু—তা আজ তোমরা নাই গেলে, তাতে ভয় কি ? আমি যেকালে তোমাদের মুরুব্বি রয়েছি, তাতে কি অন্য লোকে তোমাদের এক কথা বল্‌তে পারে ?

নৃত্যকালীর আবার সাহেবের কাছে যেতে ভয় করে, তাই কর্ত্তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়।

নিধু--না না কিছু ভয় নাই, আমাদের সাহেব বড় ভদ্রলোক, তাঁর স্বভাব বিশুদ্ধ। খপদ্দার সারদা কি বরদাকে সঙ্গে লইও না। সাহেব ওদের দেখ্‌লে চটে যাবে।

নৃত্য—তবে যে মশায় ওঁরা টের পেলে আমাদের গালাগালি দেবেন, মার ধর করবেন।

নিধু—তোমরা বল্‌বে কেন? বলবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। আমি তোমাদের বৈকাল বেলা সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তারপর সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করে টাকা নিয়ে বাড়ি চলে আসবে।

সরমা—আমরা সন্ধ্যার সময় একলা আস্‌তে পার্‌বো না।

নিধু অভয় দেয়, সে এদের সঙ্গে করে ফিরিয়ে আনবে। বিকেলে আবার আসবে জানিয়ে নিধু চলে যায়। আর সরলমনা দুই চাষী বৌ দুই ভিন্ন ধারার চিন্তা করতে থাকে,—

নৃত্য—(আহ্লাদিত চিত্তে) সরমা, সাহেব খুসি হয়েছেন।

সরমা—সাহেব খুসিই হউন, আর যাহাই হউন, আমার কিন্তু বাবু বড় ভয় করে। সাহেবের কাছে বোক্‌সিস আন্‌তে যাওয়া আবার কি ?

ম্যাক্‌লিন সাহেবের কুঠিতে নিধু নৃত্যকালী ও সরমাকে নিয়ে আসে।

সরমা—দিদি আমার ভয় লাগ চে যে।

নৃত্য—ভয় কি? জমিদার, মনিব এরা বাপের তুল্য, এদের নিকট ভয় কি?

সরমা—শুনেছি সাহেব বেটা বড় দুষ্ট।

নৃত্য—না না এ সাহেব বড় ভদ্রলোক।

নিধু জানায় যে সাহেব সরমাকে আগে ডাকছেন।

সরমা—না দিদি, আমি আগে যেতে পারবো না।

নিধু—তাতে আবার ভয় কি? আগে গেলেও যেতে হবে, আর পরে গেলেও যেতে হবে।

কী এক অমঙ্গলের কল্পনায় সরমা কাঁপতে থাকে, বলে—দিদি তুই আগে যা।

নৃত্য—যা না লো, অমন কচ্চিস কেন? এমন যদি কর্ত্তে হয় তাহলে আসতে নেই।

নিধুর পীড়াপীড়িতে 'ভগবানের মনে যা আছে, যাচ্চি' বলে সরমা উঠে দাঁড়ায় ও নিধুর সঙ্গে ভিতরে চলে যায়। একটু পরে নিধু ফিরে আসে ও নৃত্যকালীর সঙ্গে আলাপ শুরু করে, দেশের কথা, বাড়ীর কথা ওঠে, সেখানে কে কে আছে, সরমার বয়েস কত ইত্যাদি। হঠাৎ বেগে আলু থালু বেশে সরমা প্রবেশ করে ও আকুলস্বরে জানায় সাহেব তার সর্ব্বনাশ করেছে, আঁটকুড়ির বেটা নিধু বকশিস নিতে সাহেবের কাছে পাঠাল, আর সাহেব বাঙ্গালি মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছে, জাতকুলমান সর্ব্বস্ব গেল, দিদি আমাকে ছুঁয়না ছুঁয়না। গু আঁটকুড়ির ব্যাটা আমি তোকে শাস্তি দিতে পারলেম না, ভগবানের কাছে তোর অবশ্য শাস্তি হবেই হবে, আমার স্বামী একথা শুনলে অবশ্যই আমার দোষ দিবেন, কিন্তু স্বামী, আর আপনার সঙ্গে আমার দেখা হলো না, আমি শপথ করে বলতে পারি আমার তিলমাত্র দোষ নাই। দিদি, তোমার সঙ্গে যদি আমার বাপ মার দেখা হয়, তাহলে বলো তাঁদের এত আদরের সরমা জাতিভ্রষ্টা হয়ে প্রাণত্যাগ করেছে। মা, মা, মা, এ জন্মের মত তোমার সঙ্গে দেখা হলো না।

(ভূমিতলে পতন ও মৃত্যু)

কোম্পানীর মুল্লুকে দেশে আইন আছে, থানা পুলিশ আছে, প্রার্থী হয়ে আদালতে গেলে বিধিমতে বিচার হতে পারে। অন্ততঃ সারদা-বরদার তাই ধারণা।

কিন্তু চা-বাগানে কোম্পানীর আইন কার্য্যকরী হয়না, অর্থাৎ চা-কর সাহেবদের নন্দী ভৃঙ্গীরা তা হতে দেয়না। সারদা-বরদা সাহেবের নামে নালিশ করতে গিয়েছিল। ফলে সাহেবের পাইকদের হাতে তাদের কিছু উত্তম মধ্যম জোটে। নিধু এসে শাসায়,—

"আমার সাহেবের মুটোর ভিতর থানা পুলিশ, তুই জানিস, আমার সাহেব যদি একটা ছেড়ে হাজারটা খুন করে, তা হলে আমার সাহেবের কিছু হবার যো নাই।"

বরদাও সমান তেজে উত্তর দেয়—তোর সাহেব কোম্পানি আর কি ?

নিধু—এখন তো কেবল তোর স্ত্রীকে এনেছিলুম, এইবার বড় বৌটাকে এনে সাহেবের কাছে দিব।

সারদা—(রাগান্ধ হইয়া) কিঃ তোর বাবার ক্ষমতা আছে, তোরে আজ খুন করবো।

বরদা—শালা তুই জানিস না আমরা চাষা লোক, আজ তোর গোঁপ ছিঁড়ে ফেল্‌বো।

নিধু—শালারা এইবার আমায় খুন করো (দুইজনকেই প্রহার)।

সারদা একসময় বলে যে তাদের ছেড়ে দিলে দেশে চলে যাবে, তারা নালিশ কর্ত্তে চায়না, কাকেও এসব বলতে চায়না।

নিধু—তুই বল্‌বি বলে আমি সেই ভয় কচ্চি কি না. আমাদের এ সকল যখন তখন হয়ে থাকে। তা কে না জানে, কে না শুনেছে, তা আমাদের কেউ কিছু কর্ত্তে পারে ? আমরা তো আব লুকিয়ে চুরিয়ে করিনা।

খানিকক্ষণ পরে ম্যাকলিন সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। বরদা বলে যে সাহেব তুমি আমার বউয়ের জাত মেরেছ, সেই দুঃখে সে প্রাণত্যাগ করেছে।

ম্যাক—(হাসিতে হাসিতে) তোমার বউয়ের তো আমি জাতি মারি নাই, আমি তাহাকে সভ্য civilized করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সে আমার বাৎ শুনিল না, প্রাণে মরিয়া গেল।

বরদা—(ক্রন্দন করিতে করিতে) আমি তোমার নামে থানায় নালিশ করবো, তুমি জাননা এ কোম্পানির মুল্লুক ?

ম্যাক—(হাসিতে হাসিতে) হা হা হা! তুমি আদালতে নালিস করবে, সাহেব লোক তাতে ভয় করবেনা। থানা পুলিস in my hand (আমার হস্তের ভিতর) সে তো আপনি মরিয়াছে ; তোমাকে যদি আমি খুন করি, তাহা হইলে আমার কিছুই হইবে না। আমি Bible (বাইবেল) হস্তে করিয়া বলিব তোমার spleen ছিল। আমার সহিত থানার ইন্সপেক্টর

জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কমিস্যনর সকল লোকের আলাপ আছে। তারা মোর জাতি ভাই।"

এরপরের অধ্যায় সংক্ষিপ্ত। ম্যাকলিন সাহেবের বিধানে সারদা-বরদাকে সাগরের মধ্যে এক দ্বীপে রেখে আসা হয়। আর আসামে সায়দার মেটে ঘরে বিকৃত মস্তিষ্কা নৃত্যকালী কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও চীৎকার করে ওঠে,—

"সতীত্ব নেবে? নেবে? ইস প্রাণ থাকতে না। আত্মহত্যা কর্‌বো। সতীত্ব নষ্ট কর্ত্তে এসেছিস্? নে দেখি তোর সাধ্যি"—এইভাবে বকতে বকতে হত-ভাগিনী বটির আঘাতে নিজের জীবন শেষ করে।

পরিশিষ্ট—(ক)

১। বাজার লড়াই সম্বন্ধে 'সুলভ সমাচার'

সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সুলভ সমাচার' ১ম খন্ড, ১৩ সংখ্যা, ২৬শে মাঘ, ১২৭৭ সালে লিখছেন—

কাকেই বা বলি, কেই বা শুনে !

কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি কাহার আপত্তি না শুনিয়া একেবারে স্থির করিয়া বসিয়াছেন যে টাকা ধার করিয়া সাহেবদিগের বাজার প্রস্তুত করা হয়। সেই ঋণের জন্য যে বাজার হইবে সেই বাজার, তাহার জায়গা, তাহার উপস্বত্ব এবং মিউনিসিপ্যালিটির অন্যান্য আয়ও দায়ী থাকিবে। কলিকাতার উত্তর ভাগ অগ্রে পরিষ্কার না করিয়া আমাদের টাকাকে দায়ী করা অন্যায় এ কথা কাকেই বা বলি ?

২। বাজার লড়াই সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ'

কলকাতা হতে প্রকাশিত 'পাক্ষিক সংবাদ' ১ খন্ড, ১৭সংখ্যা, ১লা ফেব্রুয়ারি, ইং ১৮৭১ সনে 'সংবাদ' শিরোনামায় জানাচ্ছেন—

"সোমপ্রকাশ বলেন, কলিকাতার ইউরোপীয় জাষ্টিসদিগের জিদ বজায় রহিল। কয়েক সহস্র ইউরোপীয়র সুবিধার্থে ছয় লক্ষ টাকা দিয়া ধর্ম্মতলার বাজার ক্রয় করা হইতেছে।"

Parliamentary Debates in House of Commons, Feb. 5, 1878

India—The Native Police of Bengal—Question

Mr. O'DONNELL asked the Under Secretary of State for India, Whether his attention has been called to a Resolution moved by the present Lieutenant Governor of Bengal, the Honourable Ashley Eden, relating to the Bengal Police Report for 1877, which described the system of police and preventive imprisonment established by order of Sir Richard Temple, the then Lieutenant Governor, in November, 1875, as "an uncontrolled and fearful engine of oppression," by which "a vast amount of bitter wrong and oppression has been inflicted upon the people," and whose "result has been more demoralising to the lower classes than even the continuance of serious crime could be;" whether the present Lieutenant Governor of Bengal has not stated that, "looking at the vast number of false cases established over Bengal," and "from an examination of some cases which have come before him," he has reason to fear "that very many of the persons convicted were really innocent;" and, whether, if this be so, the Governor General, Lord Lytton, has taken any measures to supervise such an abuse of power?

Lord GEORGE HAMILTON, in reply, said, he had read a resolution moved by the present Lieutenant Governor of Bengal animadverting in strong terms, not on anything which Sir Richard Temple had done, but on the misconduct of a

large section of the Native police of Bengal. This was not the first occasion upon which their conduct had been unfavourably noticed, for last year Sir Richard Temple commented upon the lamentable amount of suffering and wrong which had been caused by them, in reference to the number of arrests made on insufficient evidence. The pith of the resolution was to the effect that a lamentable amount of suffering and wrong had been caused by the vast number of false charges instituted all over Bengal, and that Mr. Eden was determined that this fearful oppression should not be left uncontrolled in the hands of the police, but should be used only under the most effectual safeguards. The administration of the police force in Bengal was primarily in the hands of the Government there, and no doubt Mr. Eden would take measures which would prevent the repetition of the acts of oppression to which the hon. Member had directed attention.

পরিশিষ্ট—(গ)

Report of Native Papers

[Confidential] [No. 37 of 1878]

1

For the week ending the 14th September 1878

Bharat Sanskarak, September 6th 1878 : The Bharat Sanskarak wishes to know why, seeing the police are supposed to be the guardians of our lives and property, and the preservers of the public peace, respectable people keep at a distance from them and fear the red turban (lal-pagriwallah). The reason is

because a police official thinks himself a Raja, and does not know how to pay respect where it is due. He will use every endeavour to injure the man that has incurred his displeasure; he will even trump up a case against him and bring false charges. The policeman fears no fine; he can easily recoup himself by means of a bribe, nor does he care for prison or a thrashing. The public will always have a dread of the police so long as no reform reaches the department. There are few educated and well-behaved men in this branch of the public service, and the few good men that enter it, in time get corrupted. The police officers consist mainly of ignorant Musalmans or other men of low caste, who have no idea of what is right and proper. Their only ambition is to accumulate money and get promoted. Educated and well-conducted men, who avoid evil ways, should be engaged for the police, and the lower grades should have their salaries increased. Candidates should be selected after examination. Provision should also be made for some leisure to police officers, who should not be kept on duty night and day.

Bengali Translator's Office | Robert Robinson,
The 14th September 1878 | offg. Bengali Translator

2

[Confidential] [No. 49 of 1878]

For the week ending the 7th December 1878

Hindu Ranjika, November 22nd, 1878: In former days, says the Hindu Ranjika, employment in the police or the idea of becoming a Daroga was the forlorn hope of respectable people who had neglected their education. The police official

was in those times a Seraj-ud-dawla, and oppression, tyranny and injustice reigned. We are ready to admit that the police has much improved since then, and that many educated and respectable men are entering it, yet the improvement has not come up to our expectations. And why ? Because those who follow the right way are never noticed favourably in a Government Resolution, whilst those who have exercised great authority and shown dignified airs, and have been guilty of harshness and cruelty, have been speedily promoted. Government should reverse its behaviour towards the above two classes, and the police would soon improve. The police are styled preservers of the peace ; how comes it then that the sight of a policeman strikes terror into a person ? Moreover, it will always be found that wicked men do not, but good and respectable people do, fear the police. There is something rotten in this state of things. Uneducated Muhammadan policemen at first enjoyed a monopoly of the offices of Darogas and Jemadars, and no other people would for fear of losing their honor and respect, accept a place in the police. The good men who have been recently joining the force have become spoilt by evil associations. Uneducated and unintelligent policemen pay no heed to the proper treatment of honourable and respectable persons. Government ought therefore to strike at the root of the disease by admitting into the police only men of worth and talent, well up to their work and respectable withal.

Bengali Translator's Office
The 7th December 1878

Robert Robinson
Offg. Bengali Translator.

পরিশিষ্ট—(ঘ)

কলকাতা হতে প্রকাশিত 'সোম প্রকাশ' পত্রিকায় (ভাগ ৪, সংখ্যা ১৬, ২১ শে ফাল্গুন, ১২৬৮, ৩ মার্চ ১৮৬২) প্রকাশিত এক চিঠিতে জনৈক পত্রপ্রেরক বাংলার সমসাময়িক জেল ও কয়েদখানা সম্বন্ধে লিখছেন,—

"সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়েষু,

মহাশয়! অন্যায় কি অত্যাচার কি অধিক দিন সহ্য হয় না। এবারে কেমন হইয়াছে, প্রায় অনেক জেলার জেলরদিগের গুণ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। ইতিপূর্বে বর্দ্ধমানের জেলর ক্যান্টিফরের বিষয় আমরা শ্রবণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সম্বাদ কর্ণকুহর হইতে অপনীত না হইতে আবার অত্রত্য জেলর শ্রীযুক্ত ডবসন সাহেব ও নাএব দারোগা প্রেমচাঁদ দে এবং জমাদারের নামে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগবার্ত্তা শ্রুতিগোচর হয়। সম্প্রতি নাএব দারোগা ও জমাদারের উৎকোচ গ্রহণ সপ্রমাণ হইয়াছে। নাএব দারোগা দুই হাজার ও জমাদার দুইশত টাকার জামিন দিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এই যে, একদিবস অত্রত্য কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট মান্যবর শ্রীযুক্ত আর. ভি. ককরেল সাহেব হঠাৎ জেলে উপস্থিত হইলে, কতকগুলি কয়েদী একত্র হইয়া সাহেবকে বলে যে, "আর টাকা দিতেও পারি না, কষ্ট সহ্য করিতেও পারি না। হয় আপনি আমাদিগকে ফাঁশি দিন অথবা এই দুঃখের প্রতীকার করুন।" তাহাদিগের এইরূপ কাতর বচন শ্রবণে দয়ালু সাহেবের মনে কারুণ্যরসের সঞ্চার হয়। সাহেব অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন যে, কিছুই ভয় নাই, তোমাদিগকে কি কি কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে যথার্থরূপ আমূলতঃ বর্ণন কর। আমি অবশ্যই ইহার প্রতীকারে যত্নশীল হইব। অভয়চরণ বসু (ইনি অত্রত্য জজ আদালতের একজন প্রধান উকিল ছিলেন, ভূতপূর্ব্ব অডিসনল আলা শ্রীযুক্ত বাবু অভয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক কোন সামান্য অপরাধে পাঁচ বৎসর পরিশ্রমসহ কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।) বলিলেন যে, আমি প্রায় এক বৎসর হইল কারাগারে অবস্থান করিতেছি, কিন্তু আমাকে প্রায় প্রতিমাসে কিছু কিছু ব্যয় করিতে হয়। তাহা না দিলে শ্রীযুক্ত সার্জ্জন সাহেবের ও তদীয় পোষ্যপুত্র বাবু প্রেমচাঁদের ও জমাদারের বেত্রাঘাত ও জেলের অপরিষ্কৃত স্থানে বাস নিবন্ধন অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। অদ্য কয়েকদিবস বাটী হইতে টাকা আসিতে দেরি হওয়াতে দুইদিনের পরিশ্রম একদিনে ও একসন্ধ্যা খাইতেছি।

আর এই যে রামনারায়ণ ভূয়া, শ্রীরামপলমন, শ্রীমস্তলাল পাণ্ডা প্রভৃতিকে কিছু কিছু ভাল দেখিতেছেন, এ কেবল টাকার জোর। আমিও আজি টাকা দিলে কল্য এইরূপ সুখে থাকিব। যাহা হউক এযাত্রা আপনি রক্ষা না করিলে আর নিগ্রহের পরিসীমা থাকিবেক না। এইরূপ বিবিধ অত্যাচারের বিষয় বলিলে সাহেব তৎক্ষণাৎ আপন কুঠিতে আইলেন। পরদিবস অভয়চরণ বসুকে বাটীতে ডাকাইয়া সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। পরে ২১ এ জানুয়ারি ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া অভয়চরণ বসু বাদী, নাএব দারোগা ও জমাদার আসামীদ্বয়কে ও সাক্ষী কয়েদীগণকে তলব হয়। তাহাতে অভয়চরণ বসুর এজাহারে ও সাক্ষীদিগের জবানবন্দীতে আপাতত উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে। শেষ নিষ্পত্তি এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

ইহাতে বোধকরি ডবসন ভায়াও ছাড়ান যাইবেন না। মহাশয় বলিতে কি, ডবসন সাহেব বছর ৫/৬ এর মধ্যে বিলক্ষণ বিষয়াদি করিয়া লইয়াছেন। গোরু, গাই, ছাগল, কুক্কুট, কুকুর, গাড়ি, ঘোড়া ও অন্যান্য আসবাবে একেবারে আপনকুঠি পুরিয়া ফেলিয়াছেন। এখানে কোন গমনোন্মুখ সাহেবের জিনিস নিলাম হইলে, আগে ডবসন সাহেবের বিট হয়, এবং বিক্রিত দ্রব্যের অর্দ্ধেক কি তৃতীয়াংশ উঁহার। বাহিরে বিষয় যাহা দেখিতেছি, তাহাতে কিঞ্চিত নিবেদিলাম, তদ্ভিন্ন ভিতরের বিষয় অবগত নহি। এস্থলে ইহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে ইঁহার মাসিক বেতন ৭৫ টাকা মাত্র। ঐ বিষয়ের প্রধান কারণ প্রেমচাঁদ দে ও জমাদার, তাহারাও কম বিষয় করে নাই। এই দুইজন যে কিরূপ অত্যাচারী ও পাপী তাহা বলিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়; অথবা এককালে ঘৃণারসের আবির্ভাব হয়। অত্রত্য জেলে কয়েদীদিগের ভারি অত্যাচার ও সর্ব্বপ্রকার অন্যায় বোধকরি এমন দেখিতে কি শুনিতেও পাই নাই। জেলের নিয়ম এই যে, যে জাতির যে কর্ম্ম, অথবা যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম জানে সে সেই কর্ম্ম করিবেক। এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সার্জ্জন সাহেব ইচ্ছা করিলে তাঁতির কর্ম্ম কামারকে ও কামারের কর্ম্মে কুমারকে নিয়োজিত করিয়া থাকেন। আবার যদি সেই ব্যক্তি উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহে অপারগ অথবা কার্য্যের কোন অঙ্গহীন করে, তবে বেত্রাঘাতে, যৎসামান্য ভোজনে ও অপরিষ্কৃত স্থান মার্জ্জনে তাহার ক্লেশের সীমা থাকে না। যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল কি ক্ষীণকায় তাহাকে একজন বলবান ব্যক্তির সদৃশ কার্য্য করিতে হইবেই হইবে। তা না হলে বেত আছে। টিকটিকি ত অনবরত খাটান রহিয়াছে। যেরূপ প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বীরা আপনাদের দেবীর নিকটে নিরীহ ছাগ মেষাদি জীবপুঞ্জকে নিরর্থক বলি প্রদান

করেন, (সুতরাং তাহাদের তখন পরিত্রাণের উপায় থাকে না) এখানেও সেইরূপ। যত অন্যায় হউক না কেন কেহ "অন্যায়" একথাটি মুখে আনিতে পারিবে না। ফৌজদারি বা স্যেশন কোর্টে অধিকাংশ বিচার প্রকৃতরূপ হয় না। মিথ্যাসাক্ষদান অথবা এইরূপ একটা দোষ পাইলেই অমনি ১৪ বা ৭ বৎসর কারাবাস আদেশ হয়। অনেক ভদ্রলোক যৎসামান্য দোষেও গুরুতর দণ্ড পাইতেছেন। সুতরাং তাহাতে কেবল সার্জনের ভূঁড়ি মোটা হইতেছে। তিনি অর্থলোলুপ হইয়া কয়েদীদিগকে ঐরূপ উৎপীড়ন করিয়া থাকেন। তা না হবেই বা কেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেটরা ত এ বিষয়ে কিছু তত্ত্বানুসন্ধান করিতেন না। আবার কেহ কেহ বলিতেন যে, কয়েদীদিগের আবার সুখ কি? তাহারা সর্ব্বদাই কষ্টে থাকিবে। কয়েদীরা না হয় জইন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কি ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইল, তাঁহাদের যখন বিচার এই তখন তাহাদের পরিত্রাণের উপায় নাই! যাহা হউক এই সুযোগে ডবসন ভায়াও অনেক কাজ গুছাইয়া লইলেন। কেহ যদি দোষী না হইত, তাহা হইলেও তাহার প্রতি দোষারোপ করিয়া তাহাকে স্বয়ং বেত্রাঘাত অথবা অধিক পরিমাণ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে প্রেরণ করিতেন। সাহেবও কয়েদীর কোন কথায় বিশ্বাস না করিয়া অমনি ৩০ বেত সাজা অথবা অন্য কোন গুরুতর শাস্তির হুকুম দিতেন। ফলতঃ ডবসন অধিকাংশ ধনী কয়েদীদিগের প্রতিই এইরূপ ব্যবহার করিতেন। এ জেলায় তাদৃশ লোক নাই বলিয়া এতদিন গোলেমালে যাইতেছিল; এবারে জগদীশ্বরের কোপে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা এখনও ভরসা করিতে পারি নাই যে, ইঁহার দোষ সপ্রমাণ হইলেও ইনি দন্ডিত হইবেন। ইনি ত আর কালাম্যান নন্ যে, হঠাৎ দোষী হইবেন। আমাদের একজন বাঙালির যদি এরূপ কণামাত্রও দোষের গন্ধ পাইতেন, তবে অমনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ আগে কয়েদ দিয়া পরে বিচার হইত। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে যেরূপ দয়ালু ও সদ্বিচারক দেখিতেছি ইহাতে বোধ করি ইনি অবশ্যই অপক্ষপাতী হইবেন। ইহার শেষ বৃত্তান্ত পরে নিবেদিব। মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সম্বাদ পত্রস্থ করিলে যার পর নাই উপকার হয়। আর চিরবাধিতও হই।

নিবেদন মিতি। মেদিনীপুর
১৮৬১। ১৭ই ফেব্রুয়ারি

পরিশিষ্ট—(ঙ)

Report on Native Papers

1

[Confidential.] [NO. 36 of 1876.]

For the Week ending the 2nd September 1876.

In the course of a very long editorial headed—"The Jail system in this country," the *Sambad Bhaskar* of the 21st August writes,—For a long time past the jails in Bengal have been suffered to remain in a most miserable condition; and while improvements of various kinds have been made in other departments, the state of the prisoners has remained the same. During the administration of Sir John Peter Grant, projects were laid for the improvement of their condition; but unfortunately they were nipped in the bud as soon as His Honor retired; and from that time forward neither the Government nor the public have given any serious attention to the subject. With but one or two noble exceptions, almost all the Superintendents of Jails at different times introduced very rigorous discipline; and some, as for instance, Dr. Lynch and Mr. Smith, oppressed the unfortunate prisoners so sorely as no sensible man would treat a beast. Besides, a very invidious distinction is oftentimes made between European and Native prisoners. While the former enjoy all the comforts available, the latter are forced to work hard, exposed to rain and the heat of the sun, with very unwholesome and scanty fare. It is also very wrong for the Jail Authorities to tolerate no distinction of caste among the native prisoners; nor are any efforts made to afford them practical instruction, which

may be of use to them after their release. The authorities believe that there is no way of reforming their character, but that of forcing them to undergo hard toil and labour, which end in the death of many. Such is the condition of the Presidency Jail and also of those in the mofussil, where the authorities never fail to imitate the severity which they find exercised here. Hence, if it be considered necessary to improve the condition of prisoners, the work must be commenced in the Presidency Jail; and if the new Indian Association succeed in their endeavours to promote this end, they will doubtless earn the praise and blessing of the community. We also engage to second their efforts in this most generous and noble purpose.

2

(Confidential.) (No. 2 of 1877.]

For ihe Week ending the 13th January 1877.

THE *Bishwa Suhrid,* of the 20th December last, makes the following observations in an article headed "Prisoners detained in custody":—The object of all legislation should be to benefit those for whom it is intended. In India there is no lack of promptness to enact laws and regulations; yet but little attention is indeed paid towards securing this object, or relieving the miseries of the helpless, which, though loudly calling for redress, fail to excite the pity of the authorities, who are deaf to these calls on their time and energy, and only care to attend to their daily routine of work. They cannot complain of any want of leisure; but that leisure is spent in pleasures and festivities, and not on what duty requires of them. It is

for this that we are exceedingly thankful to Mr. Justice White, for his recent generous order to provide with food prisoners awaiting their trial at the Sessions of the High Court. It would be well if the order were also enforced in the mofussil courts, through a circular, for the benefit of persons in custody on criminal charges, who, as awaiting their trial, do not by any means deserve the rigorous treatment to which they are subjected, and which, though not more, is scarcely less cruel than that of convicts. They are not, for instance, as the convicts are, allowed clothing by Government, nor timely meals. The food given is not generally that to which they are accustomed. Unlike the convicts brought up before the court, they are hand-cuffed; nor are they allowed to smoke. Their shoes are taken from them; and long detention in custody, as in the Sessions cases, subject them to considerable loss. In almost half the number of cases sent up by the police, the accused are acquitted by the Sessions court; nor is this to be wondered at, considering the intriguing character of the prosecution, and the worth of the Magistrate, as also the fact that neither the police, nor a Magistrate, is ever punished or reproved for inflicting trouble on an innocent person. So that a Magistrate, who may desire to throw a man into jail, though there be no illegal conduct to adduce against him, may easily attain his purpose by committing him to the Sessions. The police also is similarly able to oppress the innocent. The accused, while in confinement, are denied all facilities for making their defence, by causing needful enquiries to be made or engaging counsel on their behalf, and are thus placed in great difficulty. Nor is it a lesser evil that, in all cases sent up by the police, the accused are retained in their custody until their trial is over. We would earnestly urge on Government the consideration, that persons,

so detained and awaiting their trial, ought not to be treated as convicted prisoners are ; and our point is the more strengthened, seeing that most of these are subsequently acquitted. It, therefore, behoves the authorities to provide for the removal of the grievances suffered by prisoners detained in custody.

3

[Confidential] [No. 21 of 1877]

For the week ending the 26th May 1877

Soma Prakash, May 21st 1877 : In another editorial under the heading "Imprisonment for Debts", the same paper observes that when the new Civil Procedure Code was submitted to the Legislative Council, a proposal was made to abolish the system of imprisonment for debts. Had this been carried out, much good might have ensued. The law to punish debtors by imprisonment is not a result of foresight and thought on the part of the legislators. That the code, which is now in vogue, is most absurd has become evident to everybody who has observed its operation. According to it a decree-holder (if he wishes) may even subject a debtor, who is able to pay his debts, to insult and disgrace ; and also cause him to be imprisoned, by issuing a warrant against him. This is doubtless a great error in the code. What necessity is there for imprisoning a debtor when the decree-holders demand may be easily realized ? The decree-holders are thus encouraged to gratify their hostile feelings and dishonest purposes. This law for the imprisonment of debtors is not just, even with regard to those who are unable to pay their debts. Decree-holders

also derive no profit from it but rather are subjected to loss, because they have to sustain them in prison. If the law of imprisonment for debts were altogether repealed, much good might follow. At present a creditor cares little when he gives a loan because he thinks that the defaulting debtor might be imprisoned. But if the law be repealed creditors would be more careful not to give loans without discrimination; and this most injurious practice of borrowing would be discouraged.

Bengali Translator's Office John Robinson
The 26th May 1877 Goverment Bengali Translator

4

[.Confidential] [No. 7 of 1879]

For the week ending the 15th February 1879

Hindu Hitaishini February 8th, 1879 : The same paper devotes an editorial to the subject of prison discipline in Bengal and observes that the prisoners are subjected to very hard labor which ruins their health in a short time. The dietary arrangements are not satisfactory in many jails. These circumstances account for the large mortality among the prisoners. It is exceedingly to be regretted that the subject has not yet received any attention from Sir Ashley Eden.

Bengali Translator's Office Rajkrishna Mukhopadhyay
The 15th February 1879 Bengali Translator

[Confidential] [No. 18 of 1879]

For the week ending the 3rd May 1879

Ananda Bazar Patrika, April 29th, 1879 : The same paper in another article dwells on the rigorous treatment to which the prisoners in the jails are subjected. They are treated worse than beasts. In some jails the prisoners were until very recently made to drag the plough. The cruelties inflicted upon them so harden their nature that instead of coming out better men, they return to society worse characters and more abandoned to crime than when they left it. Considering that most of the juvenile offenders take to crime only through poverty, and the object of punishment is to deter them from reverting to their old ways while protecting society from the effects of their wrong doings, it behoves Government to extend a more lenient treatment to the prisoners than what they receive at present and to adopt means for reforming their character. Crime will rather increase than diminish until this is done.

Bengali Translator's Office Rajkrishna Mukhopadhyay
The 3rd May 1879 Bengali Translator

Judicial Despatch to India

No. 16, dated 25th May 1882

1. I have considered in Council the letters of your Excellency in Council, No. 4 (Judicial), and No. 12 (Public, Medical), dated 6th of February and 7th of March last, forwarding the following papers on the subject of the mortality in Indian jails during recent years :—

(1.) Memorandum by Surgeon-Major T. R. Lewis, on the dietaries of labouring prisoners in Indian jails.

(2.) Memorandum by the Sanitary Commissioner on jail diets in relation to the health of the prisoners.

(3.) Resolution of the Government of India in the Home Department (Judicial), dated 3rd of February 1882.

(4.) Resolution of the Government of India in the Home Department (Medical), dated 23rd of February 1882.

2. The subject of jail mortality has for some time engaged my special attention in Council, in connection with the Reports from the various provinces for 1879 and 1880.

3. It is not necessary for me to dwell at length here on the great mortality that has occurred in the jails in almost all parts of India during recent years. According to the figures of the Sanitary Commissioner with your Government, during the three years 1877, 1878, and 1879, the death-rates in Madras of the free population were 53, 27, and 18 per mille respectively ; those of the jail population were 176, 125, and 56. In Bombay the death-rates of the free population were 38, 32 and 23 ; those of the jail population were 54, 118, and 109.

In the Punjab the death-rates of the free population were 20, 36, and 38; those of the jail populatian were 33, 109, and 140. In the Central Provinces the death-rates of the free population were 23, 46, and 34; those of the jail population were 45, 118, and 67. The statistics of the free population in Bengal Proper are said to be too defective to be of use for comparison, but for the present purpose it is only necessary to state that during 1879 the death-rate in the jails of that province was 97, a higher rate than in any year since the famine year of 1866.

4. Your Excellency in Council is of opinion that the disastrous results of the last few years are, in the main, to be ascribed to influences affecting the general population of the country, and among these in no small degree to the privations arising from scarcity and high prices. Great weight must be given to such considerations, for although the wide discrepancies apparent between the mortality among the jail and among the free population point to the existence of some special causes seriously influencing the former and not the latter, it is important to remember that the jail of every district "fulfils to a large extent the functions of a poor-house as well as of a jail," and, in times of scarcity, is filled with a population "suffering in different degrees from the effects of privation." The conditions, moreover, affecting the mortality of Indian jails, are, no doubt, at all times mixed, uncertain, and difficult of discovery. But making every allowance for these considerations, I cannot admit that the heavy mortality represented by the figures which I have quoted lies beyond reach of remedy by an energetic and vigilant administration.

5. I observe that there is a conflict of opinion as to the effects of the Prison Conference diet scale on the recent mortality in the jails, especially in those of Bengal. I am glad to learn

that your Lordship is convinced that there is no reason to believe that the prisoners anywhere died in excess numbers in 1879 because they were insufficiently fed. I have full confidence that your Excellency in Council, utilizing the best experience and scientific skill at your command, will take measures for settling this important question of diet once for all in a satisfactory manner. There is much force in the statement of the Sanitary Commissioner that it is of little use to fix good dietaries unless measures are at the same time taken to ensure that prisoners receive their allowances of food in full. The necessity for vigilant supervision, not only in this respect, but also throughout the various branches of the Jail Department, appears to me to be of paramount importance. I have been much impressed, in particular, by the statement contained in the Bengal Jail Report for 1879, that a heavy mortality was going on, month after month, without the attention of Government being called to it. I request that measures may be taken to prevent the recurrence ot such a state of things.

6. I have noticed that in the Proceedings of your Excellency's Government (Home, Revenue, and Agricultural Department), for the 29th of July, 3rd of August, and 20th of September of last year, reviewing the Jail Reports for British Burma, the Central Provinces and the Hyderabad Assigned Districts, reference is made to overcrowding in jails, which is rightly described as a great sanitary evil which should be prevented by all possible means. The importance of this subject, especially in times of scarcity, cannot be exaggerated, and I trust it will continue to receive careful attention from your Excellency in Council. There is great reason to believe that the remarkable improvement in the health of the British soldiers in India during recent years is mainly attributable to the increased spaoe allotted to them in their barracks, and that the peremptory

orders of the Government issued in 1865 to provide additional accommodation where a certain fixed minimum standard space was not given in the old buildings led to an immediate and important improvement in the health of the men. This subject calls for special attention.

7. I observe that in Bengal during 1879 there were 10,341 punishments of "reduced diet," and that, in the following year, the number was 16,314. This form of punishment is open to much objection. As a general rule I am of opinion that there should not be any interference with the diet scale when once it has been fixed at its proper limits, *i.e.*, such as will keep the prisoners in health, and no more.

8. In conclusion, I desire to state, with reference to the submission to me of the yearly Jail Reports, that, of the Reports for 1880, the earliest received at this Office was that for British Burma, on the 20th of July 1881, the latest was that for Madras, on the 25th January 1882. There seems to me to be no good reason why the Reports should be submitted at date so far apart. I am of opinion, moreover, that it would tend greatly to the due supervision of the working of the Jail Department if a review of the statistics for the various provinces were prepared yearly by your Excellency's Government, and forwarded to me with the Reports.

[Confidential] [No. 34 of 1876]

For the week ending the 19th Angust 1876

In its opening editorial headed, "European jurors" and "European culprits", the Sahachar, of the 14th August, writes :— In a majority of cases, where natives appear as plaintiffs, and Europeans as defendants, justice fails in the hands of European jurors, who almost invariably defend their countrymen. Hence the general impression, that it is needless to institute a suit against a European. And though the English papers always insist upon it, that this impression is a wrong one, we can not feel it very true and rightly formed. As is the case with a European juror, so it is with a European doctor ; who often times, endeavours to support the cause of a man of his own race and country. As for instance, when a European kills a native, by using illegal violence against him, the doctor, in the examination of the body of the deceased, never fails to testify to his death having occurred owing to a disordered spleen, or other disease. We, however, do not believe in this most trifling excuse ; and therefore suggest to the Government to make a rule that, when such examinations are held, there should be a native surgeon present.

Bengali Translator's Office John Robinson
The 19th August 1876 Government Bengali Translator

[Confidental] [No. 31 of 1877]

For the week ending the 4th August 1877

The Soma Prakash, of the 30th July, has an article headed "Murders committed by Europeans."—The editcr complains that in all cases of murder of a native lay a European, the plea of a diseased spleen is almost invariably advanced in favour of the accused ; thus saving him from merited punishment. It is not strange that such should be the case, considering the relation in which the Europeans and natives are placed in this country. Such things are common when one party is the conqueror and the other the conquered. We have not raised this question merely for the purpose of asking Government to put an end to the evil, to point out the injurious consquences that result from it, such for instance, as the growing dissatisfaction of the people towards the British nation and the British rule, but only to inquire which of the two is the larger number—the number of murders of natives committed by Europeans, or the number of sentences of capital punishment passed by the Courts ?

Bengali Translator's Office John Robinson
The 4th August 1877 Government Bengali Translator

পরিশিষ্ট—(ছ)

Political Despatch to India

No. 53, dated 6th May 1875

Language of articles in Native press.

1. My attention has been drawn to two articles on recent events at Baroda, quoted in the "Pall Mall Gazette" of the 3rd instant, from the "Amrita Bazar Patrika," a newspaper published in Bengal. The first article, in the vernacular, is stated to have been couched in the following terms :—

"It is not a little painful for an independent Prince to be thus constantly "badgered in his own dominions by a common person. It is simply impossible for human nature to be silent in such a position. What would the English have done if, for instance, the Russian Emperor were to depute an officer like Colonel Phayre to England, to keep an eye on the doings of the English Government, to interfere with all their acts, to teach people insubordination to the law and spread calumnies relating to the Queen ? The nation would, in all likelihood, resort to either of these two courses. It would either, if it had any confidence in its power, expel the Russian Officer from the country, or would attempt to get rid of him by some secret means. The case has been precisely the same with the Gaekwar ; if he had any hand in the poisoning affair, which, however, we greatly doubt, it is evident that he had no other than this atrocious way left him to be freed from all the oppressions of the Resident ; we still believe that if the Gaekwar's case is rightly judged, facts will be brought to light of which the English will have reason to be ashamed, and, from a disclosure which, to the world at large, they will shrink ;

considering the unnatural relations that subsist between the English and the tributary Princes of India, it is rather strange that poisoning cases have been so few. The oppression of the Residents on the Native Chiefs would have long since made it impossible for Government to maintain peace in the country, if the Native had not been so signally patient, weak, and helpless."

The second article referred to was in English, and is stated to have been as follows :—

"Thwarted by one man, beset one all sides, seeing no other remedy, and loving his throne, he attempted to poison the Colonel. That was a grave crime, but a graver one was to force him to commit it ; a grave crime it was, but State exigencies cover graver ones ; Princes murder millions of their fellow-beings for a whim, or to satisfy their vanity or pride but they are not held responsible for it. We read in a French history that the English attempted to poison the French troops during their war with the first Napoleon ; but we may not believe this. It is quite true, however, that the British Indian Government finds it necessary to poison a whole nation with opium but the opium revenue is a State necessity. The Government of Lord Mayo thought it necessary to emasculate a whole nation by stopping education, and, if Lord Northbrook had not generously come to our rescue, a serious blow had been dealt by this time against our State education. To emasculate a nation that the Government may rule without trouble ! Surely, to poison an obscure Colonel is by far a lighter crime than these."

I would also draw the attention of your Excellency in Council to a letter published in the "Indian Economist," of the 30th November 1874, under the signature of Mr. F. P. Lely, of the Bombay Civil Service. This letter gives a long series of quotations

from various Native newspapers, the tone of which is perhaps even more objectionable then those cited by the "Pall Mall Gazette."

2. It is unnecessary for me to comment upon the language of such articles, which are not only calculated to bring the Government into contempt, but some of which palliate, if they do not absolutely justify as a duty, the assassination, under certain circumstances, of British officers who may be charged to represent your Excellency at Native Courts. No Government should, as a rule, attempt to suppress criticism, however ill-considered, of its administrative measures ; but while the utmost toleration in this respect is desirable, it seems to me that the unchecked dissemination amongst the Natives of articles of the character cited above cannot be allowed without danger to individuals and to the interests of Government itself.

3. It appears from the records of this Office that in the years 1869 and 1870 the attention of the Government of India was directed to the insufficiency of the powers conferred on it by law in respect of seditious publications. A number of provisions relating to such publications had been prepared by the Indian Law Commissioners, but had been omitted, seemingly by inadvertence, from the Penal Code. It was determined to restore these provisions to the Code, and they now constitute a principal part of Act 27 of 1870 of the Governor General in Council. The section of the Penal Code now numbered 124 A, declares that "whoever by words either spoken or intended to be read, or by signs, or by visible representations or otherwise, excites, or attempts to excite, feelings of disaffection to the Government established by law in British India," shall be liable to various punishments, of which the heaviest is extremely severe. An explanation is, however, added to the effect that comments on the measures of the Government

are not to be a punishable offence if they are only intended to excite such disapprobation of those measures "as is compatible with a disposition to render obedience to the lawful authority of the Government," and to support its lawful authority against unlawful attempts to subvert or resist it.

4. It appears to me *prima facie* that the articles which I have quoted from Native Indian newspapers are calculated to excite feelings of disaffection to the Government established by law, and that their writers are not entitled to the benefit of the explanation by which the provision of the Penal Code is qualified. The question, however, whether the law should be brought to bear on such writings, or whether they should be treated with disregard, is one which can best be decided on the spot, and I should be glad to have an early opinion on it from your Excellency in Council. In any event, I direct your Excellency's serious attention to the continued publication of this class of articles by a portion of the Native press.

পরিশিষ্ট—(জ)

[Confidential] [No. 39 of 1875]

For the week ending the 25th September, 1875

The Samachar Chandrika, of the 20th September, notices it as a significant fact that, by a profuse distribution of empty titles and honors, the British Government is gradually putting down all independence of thought and expression among natives, who have a peculiar weakness in this direction. All the leading men in native society have been thus won over, and there are scarcely any who will raise their voice against public wrongs. This state of obsequious dependence is to be greatly deplored.

Bengali Translator's Office — John Robinson

The 25th September 1875 — Government Bengali Translator

2

[Confidential] [No. 41 of 1875]

For the week ending the 9th October 1875

The Rajshahye Samachar, of the 24th September, facetiously remarks that titles of distinction, such as Rajah and Roy Bahadoor, are sought with avidity, only so long as the would-be recipients remain in ignorance of the numerous inconveniences and vexations, to which they are subjected by the capricious and arbitrary character of the mofussil authorities. They are practically required to give up their independence; and constantly to please the latter by doing little services and paying subscriptions to race-courses and the like. The slightest hesitation, to comply with these numerous requisitions, brings down on them the displeasure of the local authorities, not unfrequently with hints that they will forfeit the titles if they continue to show this refractoriness.

Bengali Translator's Office — John Robinson
The 9th October 1875 — Government Bengali Translator

3

[Confidential] [No. 3 of 1877]

For the week ending the 20th January 1877

Soma Prakash, January 15th, 1877 : The same paper remarks that lavish and indiscriminate distribution of titles of distinction has been productive of two great evils—one is, that many have been honored who have no claims to distinction and thus

titles have lost their former significance and importance ; and the other is, that it is demoralizing to the recipients, who are in this way made subservient to a Government whose acts, if objectionable, they might otherwise have opposed.

Bengali Translator's Office   John Robinson
The 20th January 1877   Government Bengali Translator

4

[Confidential]   [No. 6 of 1877]

For the week ending the 10th February 1877

Grambarta Prakashika, February 3rd, 1877 : The same paper writes :—The people are gradually losing all faith in the assurances of Government. In practice the Europeans enjoy a monopoly of all high and well paid appointments ; empty titles and worthless offices are reserved for the natives. Government does not really seem to desire their elevation ; for if there had been such a desire, it would have been carried out.

Bengali Translator's Office   John Robinson
The 10th February 1877   Government Bengali Translator

5

[Confidential]   [No. 3 of 1877]

The week ending the 20th January 1877

The Bharat Mihir of the 11th January, writes the following in its opening editorial paragraph :—An intelligent person would really find it difficult to comprehend the object and significance of the empty titles of distinction which Government bestows with a lavish hand. They have become worthless in the estimation of the people within the last two or three years ;

and lack the meaning and usefulness which is possessed even in children's toys. The recipient of the honor may feel gratified and delighted, but does not find himself entitled to any new position in society ; and what attends with shame the possession of such titles, is the fact that even the common people have made a classification of them, and attached a certain value to each ; their belief is that a title is procurable at a given price. Such lavish distribution of honors has not been known under any previous Government ; and the practice has grown up only within the last two or three years. Under the Mahomedan Nawabs, honors were conferred, accompanied with high appointments and grants of Jaygir. After the suppression of the mutiny in 1858, Government made indeed a few grants of land, from the forfeited property of the insurgents, to reward the loyal ; but though many titles have been conferred during the hundred years which have elapsed since the English gained possession of the country, not one Jaygir or high appointment has been given away. No one, unless he were grossly stupid, would be imposed upon by these empty titles ; and we wait to see when Government will perceive its error. The way, moreover, in which these are distributed, and the injudicious selection of persons on whom to confer them have been extremely unsatisfactory. In short the whole thing is demoralizing.

Bengali Translator's Office — John Robinson

The 20th January 1877 — Government Bengali Translator

পরিশিষ্ট—(খ)

সোমপ্রকাশ, ১ ভাগ, ৩৫ সংখ্যা, ২৮ আষাঢ়, ১২৬৬, ১১ জুলাই, ১৮৫৯.

"বাঙ্গাল গবর্ণমেন্ট সাধারনের মতজিজ্ঞাসু হইয়া সম্প্রতি এই অভিপ্রায়ে একটি বিজ্ঞাপন করিয়া দিয়াছেন যে উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে যেমন হলকাবন্দি স্কুল আছে, তেমনি স্বল্পব্যয়ে বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইতে পারে কিনা।

"আমাদিগের গবর্ণমেন্ট প্রজার হিতার্থে নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কয়েকটি বিশেষ কারণ বশতঃ তাঁহাদিগের সমুদায় চেষ্টা সম্যকরূপে সফল হইতেছে না। রাজপুরুষেরা ইতর সাধারণ যাবতীয় প্রজাকে এককালে জ্ঞানালোক সম্পন্ন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের এই উদার চেষ্টা ও উদার আশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। রাজ্যের লোকের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত না হইলে কখন রাজ্যের সবিশেষ উন্নতি ও প্রজাগনের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা নাই। কিন্তু রাজপুরুষেরা যে উপায় অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে এ অভীষ্ট সিদ্ধি হওয়া দুরূহ বোধ হইতেছে। স্বল্পব্যয়ে সাধারণের শিক্ষাদান ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। রাজপুরুষেরা সেই অসাধ্য সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। লোকে সচরাচর বলিয়া থাকে 'যেমন দান তেমনি দক্ষিণা,' গবর্ণমেন্ট যেমন ব্যয় করিবেন, শিক্ষাও তদনুরূপ হইবে। অল্পব্যয় করেন, শিক্ষাও সামান্যরূপ হইবে...... ।"

ঢাকার জৈনসার বঙ্গবিদ্যালয় হতে আনন্দকিশোর সেন কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'পল্লীবিজ্ঞান' বঙ্গীয় ১২৭৫ বৈশাখ (১৮৬৮ মে) ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যায় 'স্থানীয় সংবাদাবলী' শিরোনামায় লিখেছেন,—

"বিক্রমপুরের ডেপুটি ইনস্পেক্টর তথায় সাহায্যকৃত স্কুলের পরিবর্তে সারকেলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অনুরোধ করিয়া শ্রীযুক্ত ক্লার্ক সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিয়াছেন। তিনি বলেন বিক্রমপুরে প্রসিদ্ধ ধনী জমিদার অতি অল্প। যাঁহারা আছেন, তাঁহারা আপন ২ গ্রামে এক একটি স্কুল রক্ষা করিতেছেন। যে স্থানে কোন জমিদার বাস না করেন, তথায় সাহায্যকৃত স্কুল চলিয়া উঠে না। বিক্রমপুর চাকরি ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত লোকের বাসস্থান, তাঁহারা স্বীয় সন্তানগণকে অন্যস্থলে লইয়া যাইয়া ইংরেজী অভ্যাস করান। এইক্ষনে কলেজের ফিস বৃদ্ধি হইয়াছে, একটি বালককে বিদ্যাভ্যাস করাইতে অধিক ব্যয় পড়ে; তাহাতে সেই ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া স্বগ্রামের স্কুলে সাহায্য দিয়া উঠিতে অনেকে পারেন না।

সারকেল স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া তাহাতে ইংরেজী শিক্ষার উপায় করিয়া দিলে সমধিক মঙ্গলের হইতে পারে"।

"বিক্রমপুরের একজন ডেপুটি ইনস্পেক্টর অমৃতবাবু বলেন, সাহায্যকৃত স্কুলগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট স্কুল। স্থানীয় চান্দা কাগজপত্রে মাত্র থাকে; কার্য্যত তদ্বারা কিছুই আনুকুল্য হয় না। বস্তুত অনেক সাহায্যকৃত স্কুলের দশা এইরূপ।"

"দক্ষিণপূর্ব্ব বিভাগের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত ক্লার্ক সাহেবও সারকেলে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপোষক। তিনি উহাতে ইংরাজী শিক্ষারীতি প্রবর্ত্তিত করিবার অনুরোধ করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন। এইক্ষণ ডিরেক্টর মহোদয় সম্মতি প্রদান করিলেই হইতে পারে।"

Report on Native Papers

1

[Confidential] [No. 2 of 1875]

For the week ending the 9th January 1875

Bishwa Dut, December 30th 1874 : The same paper in an article on the Education Department, among other things, adverts to the following points in connection with vernacular education, and complains that its representations on the subject of vernacular text-books have not been heeded by the authorities :—(1) Those that have received only a vernacular education find it hard to earn the means of livelihood ; (2) Even those that are really educated are regarded as ignorant men ; (3) The Entrance Examination is very difficult ; (4) The prescribed text-books meet with the approval of only a few interested persons ; (5) The higher officers are ignorant of the real condition of vernacular education.

Bengali Translator's Office — John Robinson
The 9th January 1875 — Goverment Bengali Translator

[Confidential] [No. 41 of 1875]

For the week ending the 9th October 1875

Dacca Darshak, September 30th, 1875 : The same paper complains that the pundits of Circle and Government aided schools are extremely ill paid. They can hardly, with the low salary allowed them, manage to support themselves and their families in these times, when prices are so high. Government should consider the case of these unfortunate men.

Bengali Translator's Office John Robinson
The 9th October 1875 Government Bengali Translator.

[Confidential] [No. 51 of 1875]

For the week ending the 18th December 1875

The Burrisal Vartavaha, of the 8th December, is gratified to read the recent Resolution of the Lieutenant Governor on the normal schools. It is of opinion, that the normal schools for the training of Guru Mahashayas are of no use, and in maintaining them Government has been only incurring a waste of public funds at its disposal. A large number of competent and tolerably educated men can always be found ready to do the work of the Gurus. What, however, has been a real want is the absence of higher normal schools for training the Pandits for the model and circle schools. This is specially felt to be the case in Burrisal, where Pandits for the latter schools are very few, and have to be brought from other districts. It, therefore, behoves the Lieutenant-Governor to establish some first class normal schools in selected places in Eastern Bengal.

Bengali Translator's Office
The 18th December 1875

R. J. Ellis
Offg. Government
Bengali Translator

(4)

[Confidential] [No. 9 of 1876]

For the week ending the 26th February 1876

The Sahachar of the 21st February thus writes about what he calls "Campbell-Guru Mahashayas" :—The Guru system is working in a manner worthy of its founder. The whole country laughed at the system when it was first introduced ; no one need be told of the cleverness of the man who wanted to find an efficient teacher for a monthly sum of Rs. 2 to 2-8. Sir George Campbell did not know that any or every one is not fit to teach those that are but beginning to learn. The teacher's labour is lighter in reference to the more advanced pupils. It is an extremely difficult task to illumine with the light of learning the dark recesses of those minds, the possessors of which have been illiterate for hundreds of generations. (?) Yet Sir George Campbell made Guru Mahashayas of all the illiterate men of the country.

Bengali Translator's Office
The 26th February 1876

R. J. Ellis
Offg. Government
Bengali Translator

(5)

[Confidential] [No. 44 of 1878]

For the week ending the 2nd November 1878

Sahachara, October 28th, 1878 : A correspondent signing himself "an old Pundit", complains of the very small remuneration which teachers of vernacular schools receive. In the

last Education gazette, an advertisement appears requiring a Pundit on Rs. 5 a month, who must have high qualifications. A gardener or Khansama gets Rs. 7 now-a-days. What is the use of going through a course of geometry, geography, grammar and history, when a man with all these acquirements can only look forward to a remuneration lower than that of most menial servants? It were better to learn to handle the spade or plough, than become a Pundit.

Bengali Translator's Office	Robert Robinson
The 2nd November 1878	Offg. Bengali Translator

পরিশিষ্ট—এঃ

আসাম অঞ্চলে কুলিদের প্রতি চা-কর সাহেবদের দুর্ব্যবহার সম্পর্কে সোমপ্রকাশ লিখছেন (ভাগ ৪, সংখ্যা ৭, ১৬ই পৌষ, ১২৬৮, ৩০ শে ডিসেম্বর, ১৮৬১ সাল),—

৫ই পৌষের ঢাকা প্রকাশে দৃষ্ট হইল, ‘কিয়দ্দিবস হইল আমাদিগের কোন বিশ্বস্ত বন্ধু কাছাড় হইতে এখানে আগমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট কাছাড়ের চা-করদিগের ব্যবহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, ‘চা-করদিগের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। চা-করেরা পতিত ভূমি সকল আবাদ করিবার নিমিত্ত বিবিধ প্রলোভন বাক্যে ভুলাইয়া নানা স্থান হইতে যে সকল কুলি আনয়ন করেন, তাহাদিগের প্রতি তাঁহারা অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। দুর্ভাগা কুলিরা সমস্ত দিবস প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াও চা-কর প্রভুদিগের সমুচিত অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে না। অনুগ্রহ লাভ করা দূরে থাকুক, নিগ্রহ সহ্য করিতে করিতেই তাহাদিগের প্রাণান্ত হয়। এ প্রদেশের বলদিয়ারা গো গর্দ্দভগুলির প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকে, চা-কর প্রভুরা অধীন কুলীদিগের পতি তদ্রূপ ব্যবহার করেন। একজন কুলি প্রত্যহ যত কার্য্যভার বহন করিতে সক্ষম, চা-কর প্রভুরা তাহার প্রতি তাহার দ্বিগুণ ভার অর্পণ করেন। পরে সে তাহা সুন্দরমত বহন করিতে না পারিলে বেত্রাঘাত দ্বারা তাহার পৃষ্ঠ দিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত করেন, কুলিরা আপনাদিগের দুরবস্থা স্বদেশীয়দিগকে লিখিয়া জানাইলে তাহাদিগের মধ্যে আর কেহই প্রলোভন-বিমোহিত হইয়া কাছাড়ে আসিবে না, বিবেচনা করিয়া চা-করেরা কুলিদিগকে স্বদেশে পত্রাদি লিখিতে দৃঢ় নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, এবং তত্রত্য ডাকমুন্সি কুলিদিগের প্রেরিত পত্রাদি

গ্রহণ না করেন, তাঁহার প্রতি এরূপ অনুমতি করিয়া রাখিয়াছেন। উক্ত বন্ধু ইহাও বলিলেন, কাছাড়ে এ দেশীয় যে সকল ভদ্রলোক আছেন, চা-করদিগের ভয়ে তাঁহারা কেহই কুলিদিগের দূরবস্থা সাধারণের বিদিত করিতে সাহস পান না। এতন্নিবন্ধন চা-করদিগের গুণাবলী আজিও প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে।"

ঢাকা প্রকাশে প্রকাশিত উক্ত পত্র সম্পর্কে দীর্ঘ তিন কলম ব্যাপী আলোচনার শেষে সোমপ্রকাশ যে মন্তব্য করেছেন তা হল,—"অন্যকে পীড়ন করিয়া যে স্বার্থলাভ হয়, তাহা কি রাক্ষসধর্ম্ম নহে? এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ ঈদৃশ স্বার্থপর ব্যক্তিদিগকেই রাক্ষস নাম দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।"

সোমপ্রকাশ, ৪র্থ ভাগ, ২৫ সংখ্যায়, ২৩ বৈশাখ ১২৬৯, ৫ই মে ১৮৬২ সালে এক চিঠি ছাপা হয়। ঐ চিঠির উত্তরে সোমপ্রকাশ ঐ একই সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় কলম প্রকাশ করেন। চিঠি ও সম্পাদকীয় মতামত দুইই নীচে দেওয়া হল।

শ্রীহট্ট থেকে পত্রপ্রেরক লিখছেন,—

মান্যবরেষু, বোধকরি ঢাকা প্রকাশ পাঠে কাছাড়ের চা-করদিগের দুর্ব্ব্যবহার ও কুলিদিগের দুর্দ্দশাবৃত্তান্ত সুন্দররূপে অবগত হইয়া থাকিবেন। এই হতভাগা (আমি) ঐ সকল ঢাকাপ্রকাশে প্রকাশ করিত। ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদক আমাকে অনেক উৎসাহ দেওয়াতে আমি কাছাড় গিয়াছিলাম, এবং চা-করদিগের অন্যায়াচরণ বৃত্তান্ত লিখিতেছিলাম। তন্মূলক সম্প্রতি আমার যে অবস্থা হইয়াছে ও ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদক আমার সহিত যে প্রকার নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছেন, অতিশয় দুঃখিতান্তকরণে তাহা আপনাকে জানাইতেছি, সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিবেন।

নানাবিধ ইংরাজী সমাচার পত্রিকায় আপনাদের অত্যাচার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চা-করগণ সম্বাদদাতাকে জানিতে চেষ্টিত হইলেন। কাছাড় অতি ক্ষুদ্র জিলা, অল্প পরিশ্রমেই আমার নাম ধাম জানিতে পারিলেন। অনন্তর তাঁহারা এক সভা করিয়া আমাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং আমার নামে অভিযোগ করিবেন বলিয়া ভয় দর্শাইতে লাগিলেন, তাহাতে আমি কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলাম না, বরং উচিত উত্তর প্রদান করিলাম, যখন ইহাতেও আমি কাছাড় ছাড়িলাম না, তখন তাঁহারা আমার বিষয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের গোচর করিলেন। তিনি (মাজিষ্ট্রেট সাহেব) প্রকাশ্য কাছারিতে আপনার আমলা ও কএকজন উকীল মোক্তারের সাক্ষাতে বলিলেন, "চা-করগণ অশ্বারোহী হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, ঢাকাপ্রকাশের সম্বাদদাতাকে সুযোগে প্রাপ্ত হইলে পিস্তল

দ্বারা গুলি করিবেন, অতএব তাহার পক্ষে স্থানান্তর হওয়া কর্ত্তব্য, আর তোমরা তাহাকে কোন সেরেস্তায় বসিতে স্থান দিও না ও সে যেন আমার কাছারিতে না আইসে", তৎপরে ডাক মুন্সিকে কহিলেন, "ঢাকাপ্রকাশের সম্বাদদাতাকে ডাকঘরে আসিতে দিও না, সে অতি অসৎলোক।" ইঁহার এই প্রকার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে আমি কাছারিতে ও ডাকঘরে যাইতে না পারিলে চা-করদের নামে ফৌজদারীতে যে সকল অভিযোগ হইবে তাহা জানিতে পারিব না ও ডাকে পত্রাদি প্রেরণ করিতে পারিবনা। মহাশয়! দুর্ব্বল ব্যক্তি প্রবল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে বিচারপতির শরণাগত হয়, কিন্তু আমার পক্ষে বিচারপতি প্রবল শত্রু হইয়া উঠিলেন।

আমি এই সকল বিবরণ ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদক সমীপে লিখিয়া কর্ত্তব্যতা বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। সম্পাদক মহাশয় উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক মৎ প্রেরিত পত্রখানাও ঢাকাপ্রকাশে প্রকাশ করিলেন না!! এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন আমি কাহার বলে কাছাড়ে থাকিয়া সম্বাদ লিখি। যাহার ভরসা করিয়া এতকাল সংবাদ যোগাইলাম এমন সময় তিনি আমাকে বিপদগ্রস্ত দেখিয়া নিষ্কৃপ হইলেন!!! সম্পাদকবাবু যদি একখানা প্রাইভেট পত্র দ্বারাও আমাকে কিছু উৎসাহ দিতেন প্রাণান্তেও আমি কাছাড় ছাড়িতাম না।

সম্পাদক মহাশয়! আপনি এমন বিবেচনা করিবেন না যে আমি আমার জন্যে এত চিন্তিত হইতেছি! চা-করেরা আমার নামে অভিযোগ করিবার যে ভয় দর্শাইতেছেন তজ্জন্যে আমি চিন্তিত নহি, যদি মিথ্যা কথা লিখিয়া থাকি দন্ডনীয় হইব। আক্ষেপের বিষয় এই যে আর কেহই চা-করদের দৌরাত্মের বিষয় সমাচার পত্রিকায় লিখিবেক না। কাছাড়ে যে কএকজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা কাছারির কর্ম্ম করেন। সুতরাং এসকল বিষয় লিখিতে সাহসী হইবেন না।

মহাশয়! কুলিদের অবস্থা দেখিলে পাষাণবৎ হৃদয়েও করুণোদয় হয়!! পরিশ্রম করিয়া করিয়া কোন ২ ব্যক্তির শরীর এমন মলিন ও কৃশ হইয়াছে যে দেখিবামাত্র শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়!!!

আমি মান ও প্রাণ ভয়ে সম্প্রতি শ্রীহট্টে আসিয়াছি। শুনিতেছি চা-করগণ এখান হইতে আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, চেষ্টা করিলে কি হইবেক, এ কাছাড় নয়। এখানে দেশহিতৈষী অনেক লোক আছেন।

এখন আপনাদের নিকট আমার প্রার্থনা এই যে আপনারা যদি দেশের প্রকৃত হিতার্থে সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন, যদি পীড়িতের আর্ত্তনাদ

আপনাদের স্বাভাবিক ক্লেশপ্রদ হয় তবে আমাকে কাছাড়ে পুনঃ প্রেরণের চেষ্টা করুন, আমি যাহাতে কাছাড়ে যাইয়া নিরুপদ্রবে থাকিতে পারি তাহার চেষ্টা দেখুন! অথবা অন্য কোন ভাল সংবাদদাতাকে কাছাড়ে প্রেরণ করুন নতুবা পরমপিতাপরমেশ্বরের নিকট কত অপরাধী হইবেন তাহা বলা বাহুল্য।

আপনার অভিপ্রায় সোমপ্রকাশে লিখিবেন, আমি জানিতে পারিব। আপনকার মত জানিবার অপেক্ষায় আমি এখানে রহিলাম।

ইতি,

শ্রীহট্ট, ৫ই বৈশাখ ১২৬৯।

এই অসমসাহসী পত্র প্রেরকের চিঠির উত্তরে সোমপ্রকাশ একই সংখ্যায় সম্পাদকীয় কলমে লিখছেন,—

"যিনি কাছাড়ে থাকিয়া এতদিন তত্রত্য চা-করদিগের ব্যবহার বৃত্তান্ত ঢাকাপ্রকাশে লিখিতেছিলেন, তিনি সম্প্রতি আমাদিগের নিকটে একখানি পত্রপ্রেরণ করিয়াছেন। পাঠকগণ পত্রখানি যথাস্থানে দর্শন করিবেন। পত্র পাঠ করিলে কোনরূপেই এরূপ বোধ হয় না যে এদেশে স্বতন্ত্র গবর্ণমেন্ট, স্বতন্ত্র রাজশাসন অথবা স্বতন্ত্র রাজা আছেন। অত্রত্য ইউরোপীয়দিগকেই গবর্ণমেন্ট, রাজশাসন ও রাজা বলিয়া বোধ হয়। ঢাকাপ্রকাশের উক্ত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, চা-করেরা তাঁহার প্রাণ সংহারে উদ্যত হইয়াছিল, তাঁহাকে অগত্যা কাছাড় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায় বিশেষ স্বেচ্ছানুসারে ব্যক্তিবিশেষের প্রাণগ্রহণে সাহসী হইতে পারেন, স্বতন্ত্র গবর্ণমেন্ট থাকিলে কি কখন এরূপ সম্ভাবিত হয়? উক্ত সম্বাদদাতা যদি অপরাধী হইয়া থাকেন, আদালত আছে, সেইস্থানে তাঁহার বিচার হইবে এবং আইন আছে, তদনুসারে তাঁহার দণ্ড হইবে; স্বহস্তে রাজবিধি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং প্রভু হইয়া কাহারও দণ্ড করিবার ক্ষমতা নাই। ইউরোপীয়দিগের এবম্বিধ গর্ব্ব ও এবম্বিধ স্বেচ্ছাচারিতাই তাহাদিগের প্রতি এদেশের লোকের বিদ্বেষের কারণ হইয়াছে। যেখানে এরূপ ব্যবহার, সেখানে দুর্ব্বলের ধনপ্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা কি? ইউরোপীয়েরা এদেশে আসিয়া বাস করেন তাহা এদেশের লোকের যে অভিপ্রেত নহে, তাহারও কারণ এই। অধিকসংখ্যক ইউরোপীয় বাস করিলেই এদেশে অরাজক কাণ্ড হইবে, এই এদেশের লোকের শংকা। এই শংকা অমূলকও নহে। এদেশে এক্ষণে যে সমস্ত ইউরোপীয় বাস করিতেছেন, তাহার অধিকাংশেরই দুর্ব্ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে।

উক্ত সম্বাদদাতা ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদকের উপরে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ১২ই বৈশাখের ঢাকাপ্রকাশে দৃষ্ট হইল, তৎসম্পাদক সম্পাদকীয় বাক্যস্থলে

সম্বাদদাতার পত্রখানির তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার আর ক্ষোভ কি? তবে তিনি কাছাড়ে অবস্থিতির বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, ব্যস্ত হইলে তাহা সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। সম্বাদদাতা কিঞ্চিৎকাল প্রতীক্ষা করুন। প্রজাগণের প্রতি সমপক্ষপাতে সদ্বিচার বিতরণ বিষয়ে অত্রত্য গবর্ণমেণ্টের যে সাধুতর চেষ্টা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, অত্যাচারকর্ত্তা যিনি হউন না কেন, অত্যাচার আর অধিকদিন প্রভুত্ব করিতে পারে না। জাতি ও বর্ণ ভেদে বিচারভেদের কালও ক্রমশঃ অতীত হইতেছে। আমরা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে পারি, যতদিন সদ্বিচার সপ্রতিবন্ধক হইবে, ততদিন গবর্ণমেণ্ট লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিবেন না।"

পরিশিষ্ট – (ট)

Report on Native Papers

(Confidential) (No. 5 of 1875)

For the week ending the 30th January 1875

Som Prakash, January 25th, 1875 : Adverting to the fearful oppressions committed on the laborers in the Tea districts by the planters, and the frequent miscarriage of justice in cases in which the latter are defendants, the same paper observes that so long as the system of supplying labor by contract prevails in these districts, oppressions will be unavoidable. The contract system should therefore be abolished, and free labor in its stead employed on the plantations. The system of administration should moreover be changed in these provinces to afford sufficient protection of law to the laborers. A greater number of courts should be established there.

Bengali Translator's Office — John Robinson
The 30th January 1875 — Govt. Bengali Translator

(2)

(Confidential) (No. 20 of 1875)

For the week ending the 15th May 1875

The Amrita Bazar Patrika of the 6th May, complains that the report of the Commission, appointed by Government to inquire into the murder alleged to have been committed by Stephens, a tea-planter of Assam, has not yet been given to the public. The subject matter of inquiry is one of extreme importance. It has a close connection with the question of the almost unlimited power, enjoyed by the police in this country, and the oppressions practised with impunity by the planters in the mofussil. The seeming unwillingness of Government to publish the report of the Commission is likely to give rise to extremely unpleasant surmises. Natives have not been satisfied with the result of even one, of the many Commissions appointed, since Lord Northbrook came to this country. The Baroda Commission, the one for trying Surendra Nath, that for the Judge of Rungpore, and lastly this about Stephens, have all been unsatisfactory in their results.

Bengali Translator's Office — John Robinson
The 15th May 1875 — Government Bengali Translator

(3)

(Confidential) (No. 46 of 1875)

For the week ending the 13th November 1875

Grambarta Prakashika, November 6th, 1875 : A correspondent of the same paper notices with regret that on emigration vessels, coolies, proceeding to the tea districts, suffer great inconvenience from want of proper accommodation,

medicines when sick and supervision. In the tea-plantations they live apart from each other, and are compelled to do an excessive amount of work. It seems to be the general impression that there is none to care for them. It would be better if Government were to make enquiries into the subject.

Bengali Translator's Office — John Robinson
The 13th November 1875 — Government Bengali Translator

(4)

(Confidential) (No. 36 of 1876)

For the week ending the 2nd September 1876

The Samachar Chandrika, of the 24th August, dwells on the cruel oppressions to which the coolies in Assam are subjected at the hands of the planters. They are treated like beasts by their employers. The condition of the coolie almost leads us to think that Assam and Cachar are not under the British Government.

Adverting to the cruel treatment of the coolies on the Assam plantations, noticed by the Soma Prakash and other papers, the Howrah Hitakari of the 27th August, writes the following :—It is no wonder that everybody should be affected with pity, at the tale of the oppressions committed on the weak, poor and helpless labourers. Government is indeed anxious to ameliorate their condition ; but the intrigues and wickedness of the contractors and the planters are too powerful for this purpose. It is the duty of everyone to seek to remove their sufferings, and we are sure that in all such noble endeavours Government will lend its sympathy and co-operation.

Bengali Translator's Office — John Robinson
The 2nd September 1876 — Government Bengali Translator

পরিশিষ্ট—(ঠ)

'চা-কর দর্পণ' রাজরোষে পড়ার প্রত্যক্ষ ফল নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন। ৯ই আগষ্ট ১৮৭৫ সাল,—সিমলা থেকে ভাইসরয় পত্রযোগে সেক্রেটারী অফ স্টেটকে এই নাটকের সম্বন্ধে লেখেন যে আসামের চা-করদের বিরুদ্ধে মানহানিকর কথা এতে লেখা হয়েছে, অথচ হাতে উপযুক্ত আইন না থাকায় সরকার এ বিষয়ে কিছু করতে পারছেন না, এর আগেও গায়কোয়াড়ের বিচার সম্পর্কে এক নাটক কলকাতায় মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং যদিও বাংলার লেফটেনান্ট গবর্ণরের মতে ঐ নাটক দর্শক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, তবুও রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দিলে এ ধরনের অভিনয় সংকট সৃষ্টি করতে পারে। অতএব ভারত সরকার এ ব্যাপারে আইন প্রণয়নের কথা বিবেচনা করে দেখছেন।

প্রত্যুত্তরে সেক্রেটারী অফ স্টেট জানালেন যে ভারত গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তে তার অনুমোদন আছে।

আইনের আগেই এক অর্ডিনান্স (২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬) জারী করে সরকার আপত্তিকর নাটকের অভিনয় বন্ধ করলেন। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ শাসকের কাছে আইনের খসড়া বিল মতামতের জন্য পাঠানো হ'ল। প্রদেশ কর্ত্তারা যে আইনের পক্ষে রায় দেবেন তা বলাই বাহুল্য। তবুও বিলের দু' একটি ধারা এদের মধ্যে কয়েকজন সমালোচনা করেছেন এবং নিছক কৌতূহলে রঙ্গ তামাসা দেখতে এসে নিরীহ দর্শক আইনের হাংগামায় পড়তে পারেন বলে ঐ বিলের কয়েকটি ধারা সম্পর্কে আপত্তিও জানিয়েছেন। ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে প্রদেশ শাসকদের মতামতের সারাংশের অনুবাদ ও সেই সংগে ইংরাজী মূল বক্তব্য দেওয়া হল। বাংলার ছোটলাট্ স্যার রিচার্ড টেম্পলের সুদীর্ঘ বিবৃতি [ক্রমিক সংখ্যা ১০১] পাঠে সে সময়কার বংগমানস ও সাহিত্য সম্পর্কে সরকারী মনোভাব পরিষ্কার জানা যায়। এজন্য গুরুত্বপূর্ণ এই বিবৃতির প্রায় সবটাই অনুবাদ করে দেওয়া হল।

* * *

৯৮। নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল সম্বন্ধে মাদ্রাজে অ্যাডভোকেট জেনারেল শুধু নাটক নয়, আপত্তিকর গানও আইনের আওতায় আনবার কথা বলেছেন।

মাদ্রাজ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল বলেন যে নিষিদ্ধ নাটক সম্বন্ধে দর্শকদের পূর্ব্ব ধারণা ছিল একথা প্রমাণ করা সহজ নয়, আবার অনুষ্ঠানের

মধ্যপথে কেন আসনত্যাগ করে রঙ্গালয় হতে উঠে আসেন নি সেই অপরাধে দর্শকদের শাস্তির ব্যবস্থাকে কঠোর মনে হয়।

মাদ্রাজের পুলিশ কমিশনার জানাচ্ছেন যে বিলে দর্শকদের শাস্তির ধারাকে তিনি সমর্থন করেন না।

৯৯। বোম্বাইয়ের আন্ডার সেক্রেটারী বলেন যে পুনার ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট দর্শকদের শাস্তির ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, কিন্তু প্রেসিডেন্সী পুলিশ কমিশনার ঐ ধারা সমর্থন করছেন। অন্ততঃ আন্ডার সেক্রেটারী এবং তার কাউন্সিল দর্শকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার ধারা আদৌ সমর্থন করছেন না।

১০০। বাংলা সরকারের বিচার বিভাগীয় সেক্রেটারী দু'টি প্রতিবাদ পত্র সমালোচনা করে বিবৃতি দিয়েছেন। এ দু'টি চিঠি আসে Legal Remembrancer এবং British Indian Association-এর পক্ষ থেকে। উপস্থিত দর্শকদের বিভ্রান্তির অপবাদে নাটক বন্ধের ক্ষমতা [৩নং ধারা, 'গ' অনুচ্ছেদ] এবং দর্শকদের শাস্তির ব্যবস্থা [৬ নং ধারা, গ' অনুচ্ছেদ] বাতিল করার পক্ষে Legal Remembrancer যুক্তি দেখিয়েছেন।

British Indian Association আগাগোড়া এই বিলের বিরোধী, কারণ দেশে প্রচলিত আইনে এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন হতে পারে, উপরন্তু অ্যাসোসিয়েশন মনে করে যে প্রস্তাবিত আইনে দেশে রঙ্গালয়ের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। এমন কী এক কঠোর নিষ্পেষণ যন্ত্র দেখা দিতে পারে যার ফলে জনসাধারণের স্বাধীন সত্ত্বা ও সাহিত্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

বিচার বিভাগীয় সেক্রেটারী, ছোটলাট রিচার্ড টেম্পলের বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন যে তিনি [ছোটলাট] বিলের কোন ধারার পরিবর্ত্তন চান না এবং তিনি মনে করেন না আপত্তিকর নাটক বন্ধের জন্য উপযুক্ত আইন দেশে বলবৎ আছে। সবশেষে বিচার বিভাগীয় সেক্রেটারী বলেন, উপসংহারে আমি বলতে চাই যে স্যার রিচার্ড টেম্পলের দৃঢ় ধারণা, প্রস্তাবিত আইন সত্ত্বেও বাংলার নাটক উত্তরোত্তর শ্রীলাভ করবে।

১০১। বাংলার লেফটেনান্ট গবর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল তাঁর বিবৃতিতে বলেন,—

"ভারতসরকার নাট্যানুষ্ঠান বিল সম্পর্কে আমার অভিমত চাওয়ায় আমি বলতে চাই যে এই আইনের ব্যবস্থা আমার মতে যুক্তিযুক্ত হয়েছে এবং এর বিভিন্ন ধারা তলিয়ে দেখে আমি আর কিছু পরিবর্ত্তন করতে চাইনে। কাজেই সংশোধিত আকারে এ বিল যাতে গ্রাহ্য হয় সে সম্পর্কে আমার অনুমোদন আছে।

"দুঃখের বিষয় যে সরকারকে এই পন্থা নিতে হচ্ছে। কয়েক বছর আগে

নীলকর দর্পণ নাটক এক শ্রেণীর কৃষিজীবীর মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি করেছে। এই নাটক আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিল এবং আমি যতদূর জানি আংশিক ভাবে অভিযোগ এসেছিল নাটক অনুবাদের পর থেকে। তারপর থেকে এ নাটক মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং যদিও সময় ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে এ নাটকের সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্য অনেক কমে গিয়েছে তবুও জনসাধারণের সামনে এ নাটকের অভিনয় কিছুটা ঝঞ্ঝাটের। হালে চা-কর দর্পণ নাটক লেখা হয়েছে যার প্রথম পৃষ্ঠার ছবি অত্যন্ত আপত্তিজনক। সদ্‌বুদ্ধি চালিত যে কোন মানুষই আসামের চা-করদের সম্বন্ধে মানহানিকর এই নাটককে ধিক্কার দেবেন। কিন্তু চা-করদের পক্ষে একযোগে এই নাটকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা সম্ভব নয় এবং এককভাবে কেউ এই উদ্দেশ্যে এগিয়ে এসে নিজের কাঁধে ঈর্ষার অযোগ্য এই দুর্নামের বোঝা নিতে চাইবেন না। গতবছর, ১৮৭৫ সালে 'গায়কোয়াড়ের বিচার' নাটক বরোদার বিচার বিভাগীয় ও রাজনৈতিক প্রশাসনকে হাস্যাস্পদ ও বিকৃত করে লেখা হয়েছিল। ইদানীং 'গজদানন্দ ও রাজকুমার' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। এই নাটক কোন দেশীয় ভদ্রব্যক্তির মান সম্মান ক্ষুণ্ণ করলেও এতে উচ্চতম পর্যায়ের বৃটিশ সংস্থার উপরেও একপশলা ঘৃণা বর্ষণ হয়েছে। এর পরেই মঞ্চস্থ হয় পুলিশের বিরুদ্ধে লেখা এক নাটক।"

"হাতে আইনের ক্ষমতা না থাকায়, সরকারের অনুমোদনক্রমে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এ ধরণের নাটক বন্ধে সচেষ্ট হন এবং কিছুটা সফলও হন। 'গজদানন্দ' নাটক অভিনীত হলে এ অভিনয় বন্ধের চেষ্টা প্রথমদিকে সফল হয় কিন্তু নাট্য কর্ত্তৃপক্ষ অভিনয় চালু রাখতে ইচ্ছুক হওয়ায় এবং নাটক বন্ধ রাখার সপক্ষে আইনের জোর নেই জানতে পেরে সরকারের অনুরোধ রাখতে তারা গররাজী হন। উপরন্তু পুলিশ বিভাগের উপরে লেখা আরেকটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। ঐ সময়ে কোন একটি নাটক ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয় এবং ফৌজদারী দায়ে পড়ে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে এই মর্মে নাকচ হয়ে যায় যে, যে ভাবব্যঞ্জনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা' আইনের অর্থে অশ্লীল নয়। যদিও নাটকের দুষ্ট অভিসন্ধি এবং অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা হয়েছিল। এই অবস্থায় গবর্ণর জেনারেলের অর্ডিনান্স জারী হয় আর স্থানীয় সরকারের হাতে নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতা আসে। এ না হ'লে আমার বিশ্বাস এ ধরণের নাটক অবাধে অভিনীত হ'তো, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ আইন লংঘন না করে অভিনয় বন্ধ করতে পারতেন না, আর আইন লংঘন করলে তারা আদালতে অভিযুক্ত হতেন, এমনকি এই স্তরের নাট্য

অভিনয়ে যে ধরণের নষ্টামি সঞ্চয় হচ্ছিল, তা' অনুরূপ নাটক লেখায় আরও উৎসাহ দিত যার ফলে নাট্য সাহিত্যে এক নিম্নতর মান দেখা দিত।"

"অর্ডিনান্সের ক্ষমতা সম্বন্ধে অতিরিক্ত কিছু বলার নেই। উপদ্রবকারীরা যখন আইনের চেহারা ভাল করে দেখতে পায় তখন আইন অমান্যে নিরস্ত হয়, ফলে নষ্টামি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়।"

"এটা লক্ষ্য করার মতো যে উপরের সমস্ত উদাহরণে শুধু ব্যক্তি বা শ্রেণীর বিরুদ্ধে অপমানকর লেখা হয়নি। উপরন্তু বৃটিশের সুনাম ও জাতির বিরুদ্ধে এবং বৃটিশের সংস্কৃতি, সংস্থা এবং বৃটিশ শাসনের ফলাফলের বিরুদ্ধেও লেখা হয়েছে। বৃটিশ সাম্রাজ্য ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে কটাক্ষ করে লেখা অথবা রাজদ্রোহিতা হয়তো এসব বইতে নেই, কিন্তু আমাদের খাসদখলে এই ভারতবর্ষে যে সমস্ত প্রকাশনায় আমাদের জাতির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার থাকবে (বিশেষ অভিসন্ধি না থাকলেও) তা' নিশ্চয় আমাদের সার্ব্বভৌম কর্তৃত্বকে কিছুটা অখ্যাতির পথে টেনে নামাবে।"

"একথা বলা যেতে পারে যে কলকাতা এবং বঙ্গভূমিতে এ ধরণের বইয়ের রাজনৈতিক প্রভাব খুবই কম আর এর প্রভাবে কোন রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে সেকথা আমি বলিনা। এত লঘু কারণে ভয়ের উদ্রেক ঠিক নয়, আর এ ধরণের প্রকাশনার সঙ্গে ভয়কে যুক্ত করলে তা' বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়না।"

"অন্যদিকে রসগ্রাহী, সংবেদনশীল ও দ্রুত ভাবগ্রহণে সমর্থ বাঙালী দর্শক-সমাজকে রাতের পর রাত বৃটিশের নিন্দা অপবাদ শুনতে দেওয়া সুবুদ্ধির কাজ হবেনা। সমাজে বয়স্ক ব্যক্তিরা হয়তো কুশক্তির প্রভাবে সহজে বিচলিত হ'ননা কিন্তু উঠতি বয়সের তরুণদের মধ্যে এর বদপ্রভাব সহজেই দাগ কাটে। এজন্য দ্রুত সম্প্রসারণশীল বাঙালী তরুণের চিন্তাধারার গতি যাদের অনুধাবন করতে হয় তাদের কাছে এ এক বিরাট সমস্যা।"

"বাংলায় এধরণের বদ নজীর একবার দানা বাঁধলে থামানো মুশকিল হবে। হয়তো এ ঝঞ্ঝাট ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়ে বড় ধরণের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া শুরু হতে পারে।"

"মঞ্চস্থ কোন নাটক মানহানিকর হ'লে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া চলে, এ যুক্তি আমার মতে অসার কারণ এই ধরণের নাটকে এমন কিছু থাকেনা যার জন্য ব্যক্তিগত অথবা সাধারণের পক্ষ থেকে অভিযোগ আনা যায়, যদিও তা শ্রেণীর এবং ব্যক্তিবিশেষর বিরক্তি উদ্রেক করে এবং সরকারকেও অপবাদ দিয়ে থাকে। কেবল একটি ছাড়া আগের

সমস্ত উদাহরণে ব্যক্তিগত অভিযোগ আনা শক্ত, আর বাস্তবিক কোনদিন অভিযোগ হবেও না, এবং সমাজের পক্ষ থেকে অভিযোগ যুক্তিযুক্ত হবেনা, কৃতকার্য্যও হবেনা। এই ১৮৭৬ সালের গোড়ার দিকে যে সমস্ত নজীর পাওয়া গিয়েছে সে সমস্ত নাটকের আসল অন্তর্নিহিত অর্থ যতই কুৎসিত হোক না কেন দেখা গেল দেশের আইনে এমন ক্ষমতা নেই যা দিয়ে এসমস্ত বন্ধ করা যেতে পারে। দমননীতি যদি প্রয়োগ করতেই হয় তাহলে বিলের অনুরূপ অতিরিক্ত ক্ষমতার প্রয়োজন।"

"এদেশে লঘু রাজনৈতিক কারণে আইনের দ্বারস্থ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, সম্ভব হ'লে অভিযোগ এড়িয়ে যাওয়াই মঙ্গল, কারণ এ ধরণের অভিযোগে পরে নানা ঝঞ্ঝাট আসে। এ দায় এড়াতে হলে বিবেচনাসম্মত পন্থাগ্রহণই বাঞ্ছনীয়।"

"এই বিলে প্রস্তাবিত আইন প্রকাশিত কোন বইয়ের বিরুদ্ধে জারী হবেনা, শুধু নাটকের বেলায় প্রযোজ্য হবে। অভিনয়ে ভাবব্যঞ্জনা ভিন্ন পর্য্যায়ের এবং তা বইয়ের ভাবপ্রকাশ হতে স্বতন্ত্র, আর এর শিল্পকলাও সজীব এবং মূর্ত্ত, এ কারণ এমন বলা যায়না যে বইয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট আইন অভিনয়ের বেলাও খাটবে। অভিনয় কলার ক্ষেত্রে নিজস্ব আইন কানুন অপরিহার্য্য।"

"দুঃখের সঙ্গে কোন কোন নাটক সম্বন্ধে এ মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছি। এই সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি বাংলা নাটকের বৈশিষ্ট্য নয় বলেই আমি বিশ্বাস করি। বরং নৈতিক ও সাহিত্যিক উৎকর্ষ বাংলা নাটকের স্বাতন্ত্র্য হওয়ায় আশানুরূপ উন্নতি করেছে। এর আইনসম্মত শ্রীবৃদ্ধি কাম্য। যদিও কয়েকটি নাটকে প্রচ্ছন্ন রাজদ্রোহ ভাবধারার বিরুদ্ধে আমি সমালোচনা করেছি, আমি বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে, তা সে রাজনৈতিক বা অন্য যে পর্য্যায়ের হোক, সাধারণভাবে এ দোষ দিইনা। অন্যদিকে বৃটিশ সার্ব্বভৌম এবং জাতির প্রতি আমার একান্ত আনুগত্য সত্ত্বেও, রাজনীতি ও সামাজিক প্রশ্নে বাঙ্গালীর বক্তব্যের জন্য মূলতঃ আমিই দায়ী হ'ব। বাংলার সুনামের জন্য আমার উদ্বেগ একান্তই সঙ্গত, এছাড়াও অন্যান্য আরও কারণবশতঃ আমি প্রস্তাবিত আইনের বলে সরকারী এই বিবরণীতে আলোচিত সংকট অবস্থা দূর করতে আগ্রহী হয়েছি।"

১০২ এলাহাবাদ থেকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সরকার জানাচ্ছেন, নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল সম্পর্কে তাদের কোন মন্তব্য নেই, তবে আইন প্রণয়ন একান্তই অভিপ্রেত।

১০৩ পাঞ্জাব লেফটেনান্ট গবর্ণরের মতে এই আইনের কোন প্রতিক্রিয়া প্রদেশে দেখা দেবে বলে মনে হয়না এবং বিল সম্বন্ধে কোন বিশেষ মতামত তাঁর নেই।

১০৪ অযোধ্যার চীফ কমিশনার জানাচ্ছেন যে প্রদেশে এ ধরণের আইনের প্রয়োজনীয়তা এখনও দেখা দেয়নি তবে অবস্থাগতিকে এমন দিন আসতে পারে যখন এ ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে।

১০৫ মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনার বিলটিকে মোটামুটি সমর্থন করেছেন।

১০৬ বৃটিশ-বর্মার চীফ কমিশনার লিখছেন, ভারতের প্রায় সর্বত্র কিছু না কিছু নাটক অভিনীত হলেও, প্রধান সহরগুলিতে রঙ্গশালা স্থাপন এবং ইউরোপীয় কায়দাকৌশলের অনুকরণে নাট্যচেষ্টার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। এই উদ্যম নিয়ন্ত্রিত না হ'লে সমূহ বিপদ। 'নীলদর্পণ' এর মতো নাটক ছাপার পরে যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে, অভিনীত হলে তা বহুগুণে ছড়িয়ে পড়ত। সরকারের এ ধরণের অভিনয় বন্ধের জন্য ক্ষমতা গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু প্রধান প্রধান সহরের রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে দূরে অঞ্চলে অবস্থা অন্যরকম। ব্রহ্মের আভ্যন্তরীন অঞ্চলে জনপ্রিয় 'পুয়ে' পুতুলনাচ ও নাট্যতামাসা প্রায় সমস্ত গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ইউরোপীয় দৃষ্টিতে এই নাট্যরঙ্গ কুনীতি ও অশ্লীলতার পর্য্যায়ে পড়লেও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা সুবিবেচনা হবেনা। আইন করে মানুষকে নীতিশিক্ষা দেওয়া যায়না।

১০৭ বৃটিশ-বর্মার বিচার বিভাগীয় কমিশনার মনে করেন, পুতুলনাচে অত্যধিক উৎসাহী কর্মীদের মঙ্গলবিধানে এই আইন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। পেগুর কমিশনার এবং রেঙ্গুনের ডেপুটি কমিশনার দুই বিপরীত মত পোষণ করেন; প্রথমজন দর্শকদের শাস্তির ধারাকে কঠোর মনে করেন, অন্যজন তা মনে করেন না।

১০৮ আসামের চীফ কমিশনার সর্বদিক বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে পেঁাছেছেন যে এই বিল লক্ষ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে রচনা হয়েছে।

১০৯ ব্যাঙ্গালোর থেকে মহীশুরের চীফ কমিশনার জানাচ্ছেন যে এ বিষয়ে তাঁর কোন মন্তব্য নেই কেবল একটি ছাড়া। ৬নং ধারায় দর্শকদের শাস্তির ব্যবস্থা কঠোর বলে মনে হয় কারণ এমনও হ'তে পারে যে বে-আইনী নাটকের নোটিশ রঙ্গালয়ের দরজায় দিলেও অবিলম্বে তা' সরানো হয়েছে এবং নিরীহ দর্শক না জেনে নাট্যানুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পরে আইনের হাঙ্গামায় পড়েছেন।

১১০ হায়দ্রাবাদের প্রধান সহকারী রেসিডেন্ট বিল সমর্থন করেছেন।

নাটক নিয়ন্ত্রণ বিল সম্বন্ধে লক্ষ্মৌর নাগরিকদের তরফ থেকে যে স্মারকপত্র আসে তার সারমর্ম হলো—

১ এই বিল ত্রুটিপূর্ণ যেহেতু সার্ব্বজনীন ও ব্যক্তিগত এবং পেশাদার ও অপেশাদারী নাট্যসংস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য এই বিল স্বীকার করে না।

২ গুরুদণ্ড।

৩ ব্যবস্থাগ্রহনে সরকারের ক্ষমতা অসীম।

৪ বহুজাতি অধ্যুষিত এই দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত মামলায় জুরী ছাড়াই শুধুমাত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে এই যদৃচ্ছ বিচার ক্ষমতা জাতির নিরাপত্তা ব্যাহত করবে।

৫ শাসকের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এবং রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারীদের অভিনয়ের লাইসেন্স গ্রহণে বাধ্যবাধকতা দেশের নাট্যসাহিত্যের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ।

৬ নাটক বে-আইনী ঘোষণার কারণগুলি যথেষ্ট সুস্পষ্ট নয়।

৭ স্থানীয় সরকারের হাতে বিদেশী ভাষার নাট্য নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা দেশের নাট্যসাহিত্যের অগ্রগতি ক্ষুণ্ণ করবে।

নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল সমালোচনা করে বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন যে সুদীর্ঘ স্মারকপত্র পাঠায় তাঁর সারাংশের অনুবাদ হলো—

প্রথমতঃ মানহানিকর নাটক অভিনীত হলে, প্রয়োজনবোধে আইনের দ্বারস্থ হবেন ব্যক্তিবিশেষ, সরকার নয়। নাটকের মাধ্যমে মানসম্মান ক্ষুণ হ'লে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের বিধি ভারতীয় পিনাল কোডে রয়েছে। চা-কর দর্পণ নাটক চা-করদের মানহানি করেছে বলে ভারত সরকার যে অভিযোগপূর্ণ পত্র লেখেন—তা অ্যাসোসিয়েশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু দেশের দণ্ডবিধি অনুসারে চা-করদের আইনের সাহায্য নিতে কোনই বাধা নেই। কয়েক বছর আগে নীলকর দর্পণ নাটক প্রকাশ হলে নীলকরেরা ঐ গ্রন্থের ইংরেজ অনুবাদক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে মানহানির মামলা দায়ের করে, সরকার এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে নি।

দ্বিতীয়তঃ নাটকে সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা অপবাদ থাকলে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও প্রচলিত পিনাল কোডে [১৮৭০ সাল ৫ম ধারা ৭ম বিধি ২৭ নং] রয়েছে।

তৃতীয়তঃ উপস্থিত দর্শকদের বিকৃত ও ভ্রান্ত পথে চালনার যে অভিযোগ হয়েছে, তার প্রতিকার পিনাল কোডের ২২২ এবং ২২৫ ধারায় আছে।

চতুর্থতঃ 'জনস্বার্থের পরিপন্থী' অভিযোগের কারণগুলি এত অস্পষ্ট যে ক্ষমতায় আসীন সরকারী কর্মচারী, জনস্বার্থ বিপন্ন, এই অজুহাতে যে কোন নাট্যানুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে পারেন।

প্রস্তাবিত আইনে ব্যক্তির বদলে সরকার মানহানিকর নাটকের ফয়সালা করতে

এগিয়ে আসছেন। দেশের জাতীয় সাহিত্যের অগ্রগতি এই নিয়ন্ত্রনের ফলে ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে না। ভারত ও ইউরোপের আচার ব্যবহার, বেশভূষায় এত পার্থক্য রয়েছে যে দেশীয় রঙ্গতামাসাকে ইউরোপীয় দৃষ্টিতে বিচার করলে তা' অত্যাচার না হয়ে যায় না। ১৮৭৩ সালে যশোহরে অনুরূপ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট এক যাত্রাদর্শনে আমন্ত্রিত হয়ে অনুষ্ঠান দেখে এত বিক্ষুব্ধ হ'ন যে পিনাল কোডের অশ্লীলতা আইনে যাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের শাস্তি দেন। সৌভাগ্যক্রমে দণ্ড কার্য্যকরী হ'বার আগে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তক্ষেপের ফলে যাত্রার নটরা মুক্তি পান।

এ সমস্ত কারণে বৃটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন প্রস্তাবিত বিল সমর্থন করে না।

মঙ্গলবার, ১৪ই মার্চ্চ, ১৮৭৬ সাল, স্থান সরকারী ভবন [Govt. House]

মানহানিকর, অশ্লীল ও রাজদ্রোহ দোষে অভিযুক্ত নাটক নিয়ন্ত্রণ বিল আলোচনা কালে মিঃ হবহাউস গবর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলে বলেন যে সরকারের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা নেই যে এই জাতীয় নাটক অভিনয় ও অভিনেতা দর্শকের সমাবেশ বন্ধ করতে পারেন। চা-কর দর্পণ লিখে নাট্যকার চা-বাগানের মালিকদের বিরুদ্ধে কুৎসা চালিয়েছেন। চা-করেরা এক বৃহৎ সংখ্যক মজুর নিয়োগ করে সমাজের উপকারই করেছেন কিন্তু এই নাটক দাবী করছে যে আয়নাতে ফুটে ওঠার মতো আসল চেহারা হ'ল লোভ, বর্ব্বরতা ও পাশবিকতার কাহিনী। এ নাটক অভিনীত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। সম্প্রতি এক নাট্যানুষ্ঠানে এ ধরনের ব্যক্তিগত উষ্মা প্রকাশের নজীর পাওয়া গিয়েছে। কোন এক হিন্দু ভদ্রলোক, যিনি বাংলা সরকারের অন্যতম আইন পরামর্শদাতা, বাড়িতে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই আপ্যায়ন পর্ব্বে প্রতিবেশীদের সমর্থন ছিল না। এরা এক নাটকে স্থান কাল সামান্য অদল বদল করে দেখান যে ভদ্রলোক পদোন্নতি ও অর্থের লোভে আত্মসম্মান বর্জন করতে কুণ্ঠিত হননি। বিলেতে লর্ড চেম্বারলেন অথবা জাস্টিস অফ পীসের অনুমতি ভিন্ন বারোয়ারী জায়গায় কেউ নাটক অভিনয় করতে পারে না। লর্ড চেম্বারলেনের হাতে যে বিরাট ক্ষমতা, এদেশের আইনে ততটা সম্ভব না হলেও যেটুকু প্রয়োজন ত এ কাউন্সিলের করা উচিত।

মঙ্গলবার, ২১শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ সাল, স্থান সরকারী ভবন [Govt. House]

মিঃ হবহাউস অভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিল উত্থাপন করে বলেন যে এটিকে এখন দু'মাসের মধ্যে মতামতের নির্দ্দেশসহ সিলেক্ট কমিটিতে পেশ করা হোক। তিনি

বলেন যে গত সপ্তাহে এই বিলের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে কাউন্সিলকে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন। বিলে স্থানীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা দেবার কথা বলা হলেও, স-কাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল ও স্থানীয় সরকার দু'য়ের হাতেই ক্ষমতা অর্পণের কথা চিন্তা করা হয়েছে। মিঃ হবহাউস আরও বলেন, বিলের ৯নং ধারা অনুসারে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে বিধিনিষেধের আওতায় আনা যাবে। যদি দেখা যায় আইন বিগর্হিত কোন নাটক গোপনে নির্দ্দিষ্ট কোন জায়গায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাহলে সেই বিশেষ ক্ষমতা অনুসারে সরকার সেই অঞ্চলের অনুষ্ঠান প্রযোজকদের লাইসেন্স নিতে বাধ্য করতে পারবেন।

রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ অশ্লীল, অপকৃষ্ট নাটক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও কাউন্সিলকে যুক্তি দেখান, যে শাসনকর্ত্তাদের পক্ষে বিজাতীয় ভাষায় লেখা নাটক সেন্সরের কাজ সহজসাধ্য নয়, অতএব নাটক বে-আইনী কিনা এ সিদ্ধান্ত নেবার যোগ্য লোক নির্ব্বাচনের ভার সিলেক্ট কমিটিকে দেওয়া হোক।

বুধবার, ৬ই ডিসেম্বর, স্থান সরকারী ভবন।

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিল উত্থাপন করে মিঃ হবহাউস কাউন্সিলে বলেন, যে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট এখন বিবেচনা করা যাক। এ সম্বন্ধে নানাদিক হতে বিশেষ করে দেশীয় সুধীদের তরফ থেকে নানা প্রতিবাদ এসেছে। বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বলছেন যে এই আইনের আদৌ প্রয়োজন নেই কারণ পিনাল কোডে অপকৃষ্ট নাটক অভিনয়ের বিরুদ্ধে যথাযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্তির চেয়ে পূর্ব্বেই নিয়ন্ত্রণ অভিপ্রেত—বিলের মূলে এই গোড়াকার কথা সম্বন্ধে অ্যাসোসিয়েশন কিছু বলেনি। অশ্লীলতা সম্বন্ধে পিনাল কোডের ২৯৪ নং ধারা অনুসারে বারোয়ারী জায়গায় বা তার ধারে কাছে অশ্লীল গান, ছড়া বা কথা অন্যের বিরক্তি জন্মালে, গায়ক বা বক্তার শাস্তি হবে, কিন্তু এ আইন যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। মাদ্রাজের অ্যাডভোকেট জেনারেল জানিয়েছেন যে নাটক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে কারণ দু'এক বৎসর আগে এখানে এক অত্যন্ত ইতর অশ্লীল নাটক অভিনীত হয়েছিল যার কুপ্রভাব ছাত্রসমাজে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এ নাটক অন্যের বিরক্তির হেতু হয়েছে প্রমাণ না থাকায় সরকার ২৯৪ নং ধারায় প্রযোজকদের কোণঠাসা করতে পারেননি। আইনের বিরুদ্ধে অ্যাসোসিয়েশনের অন্য যুক্তি হ'ল যে জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ও স্বাধীনতা এতে খর্ব্ব হবে। কিন্তু সমস্ত আইনই, প্রয়োগ অনুসারে, স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিটি নাটক সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যেতে পারে, জনস্বার্থের খাতিরে এটি নিয়ন্ত্রণ করা হবে কি না, সরকার মনে করেন এই বিশেষ নাটকটি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। প্রচলিত আইন দ্বারা তা

হচ্ছে না, সরকারের হাতে আরও ক্ষমতা প্রয়োজন। যে সমস্ত সুধীব্যক্তি এই আইন প্রণয়ন জরুরী মনে করেন না, তাঁরা বলবেন 'নীলকর-দর্পণ', 'চা-কর দর্পণ'-এর মতো নাটক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই, ব্যক্তি বিশেষকে ব্যংগ করে লেখা নাটক দমনেরও প্রয়োজন নেই।

মিঃ হবহাউস আরও বলেন বিলের ৩নং ধারা অনুসারে বারোয়ারী জায়গা বলতে শুধু ময়দান বোঝাবে না। কোন বাড়ী বা নাট্যশালায় অভিনীত অনুষ্ঠানে প্রবেশমূল্য দিতে হলে সেই সেই বাড়ীও এই আইনের আওতায় আসবে। যাত্রা ও অনুরূপ ধর্মীয় নাট্যানুষ্ঠানে এই আইন হস্তক্ষেপ করবে না।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিদের উপরে কুপ্রভাব সম্বন্ধে বিলের ৩ নং ধারা উল্লেখ করে মিঃ হবহাউস বলেন যে, নীতির কোন্ মানদণ্ডে কুপ্রভাব বিচার করা চলবে এ প্রশ্নে বিভিন্ন তরফ থেকে তর্ক উঠেছে, তবুও মিঃ হবহাউস মনে করেন যে বিদেশীয় শাসক এদেশের সাহিত্য, সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত না হলেও, এই আইনের ফলে নীতির উচ্চমান নিম্নস্তরের স্থলাভিষিক্ত হবে।

বিলের ৫ নং ধারায় বেআইনী অভিনয়ে উপস্থিত দর্শকদের শাস্তির কথা উল্লেখ করে মিঃ হবহাউস জানান যে এ সম্বন্ধে অনেক প্রতিবাদপত্র এসেছে। কিন্তু নাটক বেআইনী কিনা সে সম্বন্ধে দর্শকের অজ্ঞতা বা নির্দোষিতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। পূর্বাহ্নে বেআইনী নাটক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থেকে দর্শকমণ্ডলী অজ্ঞতার দোহাইয়ে আইন অমান্যে উৎসুক হতে পারেন।

মিঃ হবহাউস জানান যে ন্যাশনাল থিয়েটার, কলকাতার দেশীয় সুধীব্যক্তি ও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এখনই এই বিল পাশ না করার অনুরোধ এসেছে। কিন্তু গত আট মাস ধরে এই বিলের ওপরে যথেষ্ট আলোচনার সময় পাওয়া গিয়েছে। এই বিল পাশের সময় আর পিছোতে সরকার নারাজ।

রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বলেন যে দেশীয় ভাষায় লেখা বে-আইনী নাটক-অভিনয়ের বিচারে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সংগে একজন যোগ্য দেশীয় কর্মচারী দেওয়া হোক।

মিঃ ককরেল বলেন, কোন দেশীয় ব্যক্তির সাহায্য বিচারককে নিতে হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত স্থানীয় সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া ভাল, আইনে এ ধারা যুক্ত হওয়া চলেনা।

বাংলার লেফটেনান্ট গভর্ণর বলেন যে, ব্যক্তিগত নাট্যানুষ্ঠান আইনের হাত

থেকে রেহাই পেয়েছে। বারোয়ারী জায়গা বলতে সেই সমস্ত অঞ্চল বা বাড়ী ধরা হয়েছে যেখানে প্রবেশপথে দর্শনী দিতে হবে। দেশীয় সুধী ও গণ্যমান্যদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকার এই আইনে প্রবৃত্ত হচ্ছেন, কিন্তু একথা তিনি নির্ভয়ে জনসমক্ষে ঘোষণা করছেন যে এ আইন একান্তই অপরিহার্য্য ছিল। এর অভাবে দৌরাত্ম্য, নষ্টামি সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতন ডেকে আনবে, ভারতের রাজধানীতে বৃটিশ শাসনের মর্য্যাদা হেয় হবে। পিনাল কোডের দোহাই দিয়ে বলা হয়েছে নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এ যুক্তি খণ্ডন করে লেফটেনান্ট গবর্ণর বলেন এতদ্‌সত্ত্বেও অশ্লীল এবং সরকার ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে আক্রোশপূর্ণ নাটক লেখা হয়েছে, অভিনীতও হয়েছে। দেশের আইন অনুসারে সরকার বিদ্বেষাত্মক অভিনয় বন্ধের চেষ্টা করেন। প্রথমে লোকে তা গ্রাহ্যও করে কিন্তু অপরাধকারীরা আইনের সাহায্য নিতে বিলম্ব করেনা, আর কৌশলে কর্তৃপক্ষকে এড়িয়ে আসে। ব্যক্তিগত নাট্যপ্রচেষ্টা ও তার স্বাধীনতা সম্পর্কে লেফটেনান্ট গবর্ণর বলেন যে তিনি আশা করেন যে স্থানীয় সরকারকে ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও ক্ষমতার প্রার্থনা করতে হবেনা।

বাংলার মনীষা ও সমৃদ্ধ সাহিত্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে সরকারের এই নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও তিনি আশা করেন বাংলার নাট্যসাহিত্য উত্তরোত্তর শ্রী লাভ করবে।

গ্রন্থপঞ্জী

বাজার লড়াই

সুলভ সমাচার, ১ম খণ্ড, ১৩ সংখ্যা, ২৬ শে মাঘ, ১২৭৭ বঙ্গীয়
পাক্ষিক সংবাদ, ১ম খণ্ড, ১৭ সংখ্যা, ১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭১ সাল
Proceedings of the Government of Bengal in the Judicial (Municipal) Dept. for the month of February, 1873
Proceedings of the Government of Bengal in the Judicial (Municipal) Dept. for the month of June, 1874
The City of dreadful night and other places, By Rudyard Kipling

দারগা মশাই

Calcutta the 26th December 1877, Resolution : Administration Report of the Police Dept. for the year 1876.
Report on Native Papers, 1875 ; ibid, 1876 ; ibid, 1878
Parliamentary Debates in the House of Commons, Feb. 5, 1878

জেলদর্পণ

Report on the Jails of Bengal, Behar and Orissa for the year 1854-55
Report on the Jails of the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1861 and 1861-62 ; ibid, 1863

Admin. Report on the Jails of Bengal for the yaer 1877
Home Dept. Legislative proceedings, April 1864, No. 13 ; ibid, No. 14.
Legislative Despatch to India, No. 18, 31 May 1864
Judicial Despatch to India, No. 16, 25 May 1882
Parliamentary Debates in the House of Commons. June 1, 1876 ; ibid June 23, 1881 ; ibid Aug 18, 1881 ; ibid June 8, 1882
Parliamentary Debates in the House of Lords, July 24, 1882
Parliamentary Debates in the House of Commons, Aug. 10, 1882 ; ibid, Aug 14, 1882
Parliamentary Debates in the House of Lords, July 6, 1883
সোমপ্রকাশ, ভাগ ৩, সংখ্যা ৬, ১১ই পৌষ ১২৬৭
সোমপ্রকাশ, ভাগ ৪, সংখ্যা ১৬, ২১শে ফাল্গুন, ১২৬৮
Report on Native Papers 1875-1879

জমীদার দর্পণ

বঙ্গদেশের কৃষক, বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৭৯
প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০
বাংলার কৃষকের কথা—হৃষীকেশ সেন, চন্দননগর, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ১৩৩১
কৃষকের সংগ্রাম ও আন্দোলন—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা, কলিকাতা, ১৯৩৯
কৃষকসভার ইতিহাস—মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, কলিকাতা, নবজাতক প্রকাশন, ১৩৭৬
সন্দ্বীপের ইতিহাস—রাজকুমার চক্রবর্তী ও অনঙ্গমোহন দাস, সন্দ্বীপ, জয়কুমার চক্রবর্ত্তী, ১৩৩০
কাঙ্গাল হরিনাথ, প্রথম খণ্ড—জলধর সেন, কলিকাতা, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ১৩২০

Linguistic Survey of India, vol. 5, part 1,
Report on Native Papers, 1875-77, 1879

গ়ুইকওয়ার নাটক

East India (Baroda No. 7): Proc. of the Commission appointed to investigate charges against the Gaekwar, 1875

Home Dept. Proc. Public No. 46, dated Simla the 9th August 1875.

Home Dept. Proc., Public, August 1876

Political Despatch to India, No. 53, dated 6th May, 1875

Proc. of the Baroda Commission appointed to enquire into the charges against H. H. Malharrow Gaekwar of Baroda of investigating an attempt to poison the British Resident : Reprinted from the Times of India Verbatim Report.

The Revolution Baroda, 1874-75—By Dinshah Ardeshir Taleyarkhan

বাঙালির মুখে ছাই

দীনবন্ধু জীবনী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ললিতচন্দ্র মিত্র, ১৩১৬

Report on Native Papers 1875 ; ibid 1877 ; ibid 1878

Educational Despatch 1859 ; ibid 1864 ; ibid 1870

Selections from Educational Records, part 2, 1840-1859, Compiled by J. A. Richey. Bureau of Education, India, 1922

Vernacular education in Bengal from 1813 to 1912—Herbert Alick Stark, Calcutta, the Calcutta Central Publishing Co., 1916.

ভারতের শিক্ষার ইতিহাস ও আধুনিক শিক্ষা-সমস্যা—নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, কলিকাতা, বাক-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড,

History of Vernacular Education in Bengal, (1800-1854)—
N. L. Basak, Calcutta, Bharati Bookstall
সোমপ্রকাশ, ভাগ ১, সংখ্যা ৩৫, ২৮ আষাঢ় ১২৬৬ ; ভাগ ৪, সংখ্যা ৭, ১৬ই পৌষ, ১২৬৮ ; ভাগ ৪, সংখ্যা ১৭, ২৮ ফাল্গুন ১২৬৮
পল্লীবিজ্ঞান, খন্ড ২, সংখ্যা ৪, বৈশাখ, ১২৭৫
শিক্ষা-পরিচয়, ভাগ ১, সংখ্যা ১০, মাঘ ১২৯৬
Report on Native Papers 1875 ; ibid 1876 ; ibid 1878

আড়কাটী

Public Despatch to India No. 103, dated 3rd Dec., 1866
Parliamentary Debates in the H. of Commons, Aug. 18, 1881
Memorandum written after a tour through the Tea Districts of Eastern Bengal, 1866. By W. Nassau Lees
Tea-garden coolies in Assam : a letter by J. Buckingham, replying to a communication on the subject which appeared int he "Indian Churchman". With an introd. and answer by Rev. Charles Dowding, Calcutta, Thacker, Spink, 1894.
সোমপ্রকাশ, ভাগ ৪, সংখ্যা ৭, ১৬ই পৌষ, ১২৬৮
" ভাগ ৪, সংখ্যা ২৫, ২৩ বৈশাখ, ১২৬৯
Report on Native Papers, 1875-77

চা-কর দর্পণ

উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক—প্রভাতকুমার গোস্বামী সম্পাদিত, কলিকাতা, শুকসারী প্রকাশক, ১৯৭৮
Suppression of drama in nineteenth century India —Edited by Pramila Pandhe, Calcutta, India Book Exchange

Report on Native Papers, 1875-76
Home Dept. Proc., Public, File 214-12, dated Fort William 13 March, 1876

Home Dept. Proc., Public, No. 46, dated Simla, 9 August, 1875

Despatch of the Secy. of State to the Legislative Dept. of India, No 48, dated 30 Sept, 1875

Home Dept Proc., Public, Nos, 97-112, August 1876

Judicial Dept. Proc. Memo No. 38, dated Fort William, 10 April 1876

Legislative Dept. Proc. No. 2829, dated 22nd June, 1876

Judicial Dept. Proc. File 214-32 dated 13 April 1876

Abstract of the Proc. of the Council of the Governor General of India assembled for the purpose of making Laws and Regulations, 1876, with index, vol. XV

Act No, XIX of 1876

নির্ঘণ্ট